নানা রকম



শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

॥ নানা রকম ॥

নানা রকম

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৫৮

দাম : ৬·০০

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-১২ হইতে
প্রকাশিত ও ৮৩বি, বিবেকানন্দ রোড কলিকাতা-৬ বাণী-শ্রী প্রেস হইতে
শ্রীসুকুমার চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত।

অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত
করকমলে

ভূমিকা

বর্তমান গ্রন্থের তিনটি বাদে সমস্ত প্রবন্ধ আনন্দবাজার পত্রিকার 'কমলাকান্তের আসরে' প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধগুলি এখানে কালানুক্রমে বিন্যস্ত হয় নাই, যতদূর সম্ভব বিষয়ানুক্রমিক সজ্জিত হইয়াছে। সংবাদপত্রের অধিকাংশ রচনাই স্বল্পায়ু। ইহার প্রধান কারণ নিত্য বিবর্তমান ঘটনাস্রোতের প্রেরণায় ইহাদের জন্ম। আজিকার 'গুরুতর' ঘটনা দুদিন পরে লঘু হইয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাজাত রচনাগুলিও গুরুত্ব হারাইয়া পরিত্যক্ত আবর্জনার স্তূপে স্থান করিয়া লয়। ইহা সাধারণ নিয়ম হইলেও সার্বজনীন নিয়ম নয়। কোন কোন রচনার আয়ু অপেক্ষাকৃত অধিক, দু'চারটা রচনা হয় তো অমরত্বের দাবীও করিয়া বসে। উৎসবের সময়ে বাড়ীর দরজায় মাঙ্গলিক কদলী বৃক্ষ রোপণ করা হয়, উৎসবান্তে সেগুলি তুলিয়া ফেলা হয়, নয় তো আপনি মরিয়া যায়। কিন্তু কখনো কখনো দু'চারটা বৃক্ষ মাটির সঙ্গে বনিবনাও করিয়া লইয়া উপলক্ষ্যকে ডিঙাইয়া বাঁচিয়া থাকে এবং ফল ফলায়। সংবাদপত্রের রচনার ক্ষেত্রেও কখনো কখনো এমনতরো ঘটিয়া থাকে। এই রচনাগুলি সম্বন্ধে তত বড় দাবী তুলিবার সাহস আমার নাই। আবার ইহাদের যে দৈনিকমাত্র পরমায়ু এমন কথা বলিলেও ইহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে। জন্ম উপলক্ষ্যকে লঙ্ঘন করিবার মতো কিছু সঞ্চয় হয়তো ইহাদের আছে। বর্তমান যুগে সাহিত্য ও সাংবাদিকতার মধ্যে ব্যবধান অনেক কমিয়া গিয়াছে—দুয়ে শুধু প্রতিবেশী নয়, অনেক সময়েই 'চাটুজ্জে-বাঁড়ুজ্জে'র মতো এক ঘরের ভাড়াটে। সেটাও একটা ভরসার কথা।

ভবভূতি পৃথ্বী বিপুল আর কাল নিরবধি বলিয়া থামিয়াছেন, একই সঙ্গে বলা উচিত ছিল রুচি বিচিত্র। সেটাই আসল ভরসা। তা ছাড়া লেখকদের এমনি অহমিকাবোধ যে নিজেদের তুচ্ছ রচনা ছাপিতেও কখনো কারণের অভাব ঘটে না। বর্তমান লেখকও সে নিয়মের অতীত এমন মনে করিবার কি হেতু আছে ?

প্রবন্ধগুলিকে প্রশ্রয়দানের জন্য আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাইভেট লিমিটেডের স্বত্বাধিকারীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আর কৃতজ্ঞ ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানীর স্বত্বাধিকারীর কাছে যিনি এগুলিকে নূতন আশ্রয় দিলেন।

প্র. না. বি.

সূচীপত্র

১

ভারতের নবজন্ম

আট বৎসর পূর্বে স্বাধীনতা লাভ করিয়া ভারতরাষ্ট্র যখন পুনর্জন্ম লাভ করে, তখন পৃথিবীর লোকে কি এই ঘটনার মর্ম বুঝিতে পারিয়াছিল? অন্য দেশের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, এ দেশের কয়জন লোকেই বা ইহার প্রকৃত মর্ম ও মহত্ব বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিল? খুব সম্ভব লোকে ভাবিয়াছিল যে, একটা দেশের রাজনৈতিক পরবশ্যতা ঘুচিল, খুব সম্ভব ভাবিয়াছিল যে, আর দশটা স্বাধীন দেশের মতোই এখন হইতে ভারত রাষ্ট্র আপন ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্ব লাভ করিল। অবশ্য ইহাও অল্প সৌভাগ্য নয়—আর একথা সর্বৈব সত্য। কিন্তু ভারতের পুনর্জন্মলাভকে ঐ ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া দেখিলে তাহার সম্যক্ মর্ম উপলব্ধি হইবে না। আজ আট বৎসর পরে দেশ-বিদেশের লোকে বুঝিতে শুরু করিয়াছে যে, ভারত কেবল পরবশ্যতা-মুক্ত হয় নাই, পৃথিবীর ঐকতানে ভারত একটি নূতন কণ্ঠ ও নূতন স্বর যোগ করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে। পৃথিবীর বৃহৎ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি এতদিনে ভারত-সচেতন হইয়া উঠিয়াছে, এতদিন যে দেশ পরমুখাপেক্ষী ছিল এখন অন্যান্য দেশ ও রাষ্ট্র তাহার মুখাপেক্ষা করিয়া যেন রহিয়াছে। যে রাষ্ট্রের ইতিহাসের সূচনা মাত্র আট বৎসর পূর্বে, তাহার পক্ষে ইহা কম গৌরবের, কম সৌভাগ্যের নয়। কমলাকান্তের ধারণা, পৃথিবীর দীর্ঘকালের পরিজ্ঞাত ইতিহাসে ইহা একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা, যাহার নজির খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, কেন এমন হইল? কেমন করিয়া এমন সম্ভব হইল? বিস্তারিত উত্তর জানি—বলিতে পারি না, তবু যথাসাধ্য একটা উত্তরদানের চেষ্টা করিব। ভারত পৃথিবীর রাষ্ট্রসভায় আজ যে গৌরবময় ও দায়িত্বপূর্ণ আসন এমন কৃতিত্বের সঙ্গে অধিকার করিয়াছে, তাহার জন্য সে দীর্ঘকাল সাধনা করিয়াছে। ভারতে বৃটিশ যুগ তাহার সেই সাধনার যুগ। পলাশী যুদ্ধের পরে

কুড়ি বছরের মধ্যেই রামমোহনের জন্ম। তিনি নব-ভারতের প্রথম মহাপুরুষ। তাঁহার সময় হইতেই, তাঁহার সাধনার মধ্যেই নবভারতের সাধনার ইতিহাস আরম্ভ হয়। তারপরে গান্ধীজীর অভ্যুদয় পর্যন্ত একে একে অবিচ্ছিন্নধারায় মহাপুরুষগণের আবির্ভাব ও সাধনা ভারতকে আজকার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করিয়াছে। এই সব মহাপুরুষের অধিকাংশই আনুষ্ঠানিক অর্থে রাজনীতিক নন। ভারতীয় সাধনার প্রধান একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এদেশ রাজনীতি ও সভ্যতাকে পৃথক্ করিয়া রাখে নাই, দুইকেই এক বৃহৎ জীবননীতির অঙ্গীভূত করিয়া দেখিয়াছে। ভারতীয় সাধনার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, এদেশ ইংরাজ রাজত্বের অন্তর্নিহিত শিক্ষাকে গ্রহণ করিয়াছে। ভারতবর্ষ সেই প্রথম যুগেই বুঝিয়াছিল যে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবন-ধর্মের প্রতীক হইয়া ইংরাজ এদেশে আসিয়াছে। সেই জীবন-ধর্মকে ভারত নিজের জীবন-ধর্মের সহিত সমন্বিত করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছে। তাহার সাধনার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, পৃথিবীর বৃহৎ ইতিহাস-প্রবাহিনী হইতে ভারত একটু দূরে থাকিলেও নিজেকে কখনো গ্রহান্তরবাসী বলিয়া মনে করে নাই, নিজেকে সর্বদাই বিশ্বের সঙ্গে অন্বিত করিয়া দেখিয়াছে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের সমন্বয় এবং বিশ্বের সঙ্গে অন্বয় ইহাই ভারতীয় সাধনার বৈশিষ্ট্য, আর ইহা যে সম্ভব হইয়াছে তাহার কারণ কেবল রাজনীতিকগণের উপরে তাহার সাধনা নির্ভর করে নাই। অন্তর্দৃষ্টি ও জীবনমনীষাসমৃদ্ধ দার্শনিক, কবি, ধর্মগুরু, সন্তসাধুগণই প্রকৃত অর্থে এদেশের নিয়ামক ছিলেন, এখনো আছেন, ভবিষ্যতেও থাকিবেন। প্রভেদ কোথায় সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। শান্তি শান্তি রবে বৃহৎ বিবদমান রাষ্ট্রগুলি তো অনেকদিন হইতেই চীৎকার করিতেছিল, কিন্তু নেহরু অঙ্গুলি উত্তোলনের পূর্বে কেহই কিন্তু অপরের শান্তি আওয়াজে বিশ্বাস করে নাই, নিজের মনকেও কি বিশ্বাস করিয়াছিল! চীন, বৃটেন, রাশিয়া, মার্কিন প্রভৃতি জানে ভারতের শান্তিবাণীতে অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই, তাহার সুদীর্ঘকালের ইতিহাস ও নবজন্মকালের আচরণ দুই-ই শান্তির সমর্থক। একথা এখন অনেকেই বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, খুব সম্ভব নেহরুর অভিনব রাজনীতিই পৃথিবীকে একটা মহাসঙ্ঘর্ষ হইতে বাঁচাইয়া দিল। যে-রাষ্ট্রের স্বাধীন সত্তার ইতিহাস মাত্র আট বৎসরের তাহার পক্ষে ইহা সম্ভব

হইত না, যদি-না এই আট বৎসরের মধ্যে পূর্ববর্তী আটাশ শতাব্দী অন্বিত ও সমন্বিত হইয়া বিরাজ করিত। ভারতবর্ষ কখনো নিজের অতীতকে অস্বীকার করে নাই বলিয়াই বর্তমান কালকে ও বৃহৎ পৃথিবীকে স্বীকার করিতে সক্ষম হইয়াছে। এমন কথা আর কোন রাষ্ট্র সম্বন্ধে বলা সম্ভব জানি না। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, ইহা তাহার গৌরবময় ভবিষ্যতের সামান্য সূচনা মাত্র। যদি ভারত আপন সত্যে অবিচলিত থাকে, তবে একদিন অচিরকাল মধ্যে ভারত পৃথিবীর আত্মিক নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে পারিবে। সেকালে গ্রীস বিজেতা রোমকে আত্মিক সম্পদে জয় করিয়া লইয়াছিল। একালে তাহার অনুরূপ ঘটিতে চলিয়াছে। জাগতিক সম্পদে অধমর্ণ ভারত কুণ্ঠিত, বিহ্বল, সন্ত্রস্ত পৃথিবীর উত্তমর্ণে পরিণত হইবে। কমলাকান্তের সৌভাগ্য এই যে, বহু জন্মের সুকৃতির ফলে ভারতেতিহাসের উজ্জ্বলতম, অভিনবতম, মহত্তম পর্বে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ভারতবর্ষের বিধাতা দয়া করিয়া এই সত্যটি দর্শনের তৃতীয় নেত্র আমাদের দান করুন, আমাদের জীবন ধন্য হইবে।

২

মহাপরিনির্বাণ তিথি

ভগবান বুদ্ধের আড়াই হাজারতম মহাপরিনির্বাণ তিথি। যাঁহার কণ্ঠে অহিংসার বাণী দিব্যমূর্তি লাভ করিয়াছিল, তাঁহার বিশিষ্ট আবির্ভাবলগ্ন এমন এক সময়ে আসিল, যখন হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী। আজকার দিনে পৃথিবীর দিকে তাকাইলে মন নৈরাশ্যে পূর্ণ হয়—কোথায় শান্তি, কোথায় অহিংসা, কোথায় মৈত্রী! পূর্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে, ইউরোপে, আমেরিকায়, এশিয়ায়, আফ্রিকায়, অশান্তি অসন্তোষ বিক্ষোভ হিংসা ধূমায়িত এবং বহ্নিমান। বেদনার অর্ধরাত্রে জাগিয়া উঠিয়া শুনিতে পাই ভবিতব্যের গর্ভে অন্তর্লীন গুর-গুর ধ্বনি, চাপা বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশের লগ্ন গণনা করিতেছে। আর এরই মধ্যে সমস্ত সভ্যজগৎ তথাগতের বন্দনার জন্য আত্মপ্রস্তুতিতে উদ্যত। এ দুয়ের মধ্যে হঠাৎ সঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এত হিংসার মধ্যে একি

মৈত্রীর আকৃতি। সমস্তই অদৃষ্টের পরিহাস, না সত্যই মানুষ মনেপ্রাণে শান্তির আকাঙ্ক্ষী! দুই-ই সত্য। মানুষ অশান্তির কোলে জন্মিয়াছে যেমন সত্য, শান্তি ও করুণার জন্য তাহার আকাঙ্ক্ষাও তেমনি সত্য; অশান্তির দোলা শান্ত বৃক্ষশাখায় লগ্ন। হিংসার ফণাশীর্ষে অহিংসার বংশীধ্বনি মন্ত্রিত। দুই-ই যদি সত্য না হইত, তবে অহিংসা, মৈত্রী ও শান্তি মানুষকে মনুষ্যত্বের পথ দেখাইত না। দেখো না কেন আজকার দিনে পৃথিবীর এক প্রান্তে পরমাণবিক বোমার মহড়া চলিতেছে আর এক প্রান্ত আয়োজন করিতেছে তথাগতের যোগ্য অর্ঘ্য সংগ্রহের। বিধাতা রাম ও রাবণকে এক রামায়ণের সপ্তকাণ্ডের মধ্যে পুরিয়া পাঠাইয়াছেন। নিসর্গের ইহাই ধর্ম, তাই এমনই হইয়া থাকে। কিন্তু, দৃষ্টি রাখিতে হইবে, রামের অর্ঘ্য যেন রাবণের পূজায় প্রযুক্ত না হয়। তাহা হইলেই সঙ্কট। রাম-রাবণের একত্র অভ্যুদয় আসল সঙ্কট নয়।

এ-যুগ যে বিশেষভাবে হিংসামত্ত বা অশান্তিপূর্ণ এমন বলা চলে না, হিংসা ও অশান্তি সর্বযুগের লক্ষণ। তবে এ যুগের বিপদ কোথায়? বিপদ এই যে, এ যুগের যাবতীয় অর্ঘ্য ঐ রাবণের পায়ে গিয়া পড়িতেছে, এমন রাবণমুখী যুগ বুঝি আগে আসে নাই। দেখো না, আমরা শান্তি চাই বটে, কিন্তু সাধনা করিতেছি অশান্তির, মৈত্রী ও প্রেমের কথা বলিতেছি বটে, কিন্তু মন পড়িয়া আছে পরমাণবিক বোমার অতিমানবিক শক্তির পিছনে, এ যুগের আমরা 'মুখে বলি হরি, অন্য মনে করি ভাবনা'। ইহা শান্তির পথ নয়, মৈত্রীর পথ নয়, অহিংসার পথ নয়,—ইহা আত্মবঞ্চনার ও পরিণামে আত্মনাশের পথ। দেখো না কেন, এ যুগের আমরা রাজনীতিককে করিয়াছি সমাজপতি, তাহার মুঠার মধ্যে তরীর কর্ণ তুলিয়া দিয়াছি। এখন সে তরী অতলে চলিবে কি অকূলে চলিবে, সে চিন্তা করিলে চলিবে কেন? রাজনীতিক খারাপ লোক না হইতে পারেন, কিন্তু রাজনীতি চরিতার্থতার পথ নয়। রাজনীতি ও বিজ্ঞান যমরাজের বাহনের দুই করাল শৃঙ্গ—অথচ উহাদেরই উপরে আমাদের অনন্ত ভরসা। যদি শান্তি চাই, মৈত্রী চাই, অহিংসা বটবৃক্ষের স্নিগ্ধ ছায়া চাই, তবে সত্যকার পথ অবলম্বন করিতে হইবে, সে পথ রাজনীতি নয়, বিজ্ঞান নয়, সে পথ আত্মজ্ঞান। রাবণের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও সে পথের পথিক তাহার পায়ে অঞ্জলি দেয় না, রামকে আপাত-দুর্বল দেখিয়াও সে পথের পথিক তাহাকে পরিত্যাগ করে না, সে পথের পথিক দেবদত্তকে অগ্রাহ্য করিয়া

সিদ্ধার্থের শরণ লইয়া সিদ্ধকাম হয়। ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ তিথি এই অতি সরল অথচ দুরূহ সত্যটি যদি আমাদের মনে কথঞ্চিৎ উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে সক্ষম হয়, তবে এই যুগ ও যুগজীবন চরিতার্থতা লাভ করিবে সন্দেহ নাই।

৩

ভারতের দীক্ষা

অন্যমনস্কভাবে রবীন্দ্রকাব্যের পাতা উল্টাইতেছিলাম, এমন সময়ে চোখে পড়িল,

'নব বৎসরে করিলাম পণ
লব স্বদেশের দীক্ষা',

আবার চোখে পড়িল,

'রাজা নহ তুমি হে মহাতাপস
তুমিই প্রাণের প্রিয়
ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব
তোমার উত্তরীয়।'

ভাবিলাম যাহা খুঁজিতেছিলাম তাহাই তো পাইলাম, বর্ষারম্ভের সঙ্কল্প পাইলাম, ইহার চেয়ে মহৎ আর কী পাইতে পারিতাম। কিন্তু আর একটু ভাবিতেই বুঝিলাম বাণী যত সহজে জুটিল, তাহা গ্রহণ করা কি সত্যই তত সহজ? মহাতপস্বীর দীক্ষা গ্রহণ তো সহজ নয়, ভিক্ষাভূষণকে মনের অবস্থা বিশেষে রাজভূষণ বলিয়া যে মনে হয়! তপস্বীর উত্তরীয় সংগ্রহ করিতে যে মন সঙ্কোচ বোধ করে। ভাবিলাম তবে যে অদৃষ্ট রহস্যময় অঙ্গুলি-সঙ্কেতে রবীন্দ্রকাব্যের এই বিশেষ পৃষ্ঠাখানি চোখের উপরে ধরিল, তাহা কি কেবল সঙ্কল্পের দুরূহতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই? তখন চিন্তার ক্ষেত্র হইতে বাস্তবের ক্ষেত্রে তাকাইলাম, দেখিলাম বিধাতার এ কী নিষ্ঠুর লীলা! মন নৈরাশ্যে পূর্ণ হইল।

দেখিলাম ভারতবাসী আজ ভিক্ষাভূষণ আঁকড়াইয়া ধরিয়া কী দীনতার অভিনয়ই না করিয়া চলিয়াছে, মহাতপস্বীর গৈরিক ধূলিতে লুণ্ঠিত, মহাতপস্বী সম্পূর্ণ অবহেলিত। তখন ভাবিলাম ইহাই কি আমার বর্ষারম্ভের সঙ্কল্পবাক্যের পরিণাম? মনে হইল ধনী যখন নিজের ধন অবজ্ঞা করিয়া দীনের ভূমিকা গ্রহণ করে তাহার চেয়ে করুণ, তাহার চেয়ে কৃপার বিষয় আর কী হইতে পারে? একশ বছর পূর্বে এক মহাকবি মাতৃভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন ভুলিয়া পরগৃহে উঞ্ছভিক্ষায় নিরত হইয়াছিলেন, আর আজ একশ বছর পরে আমরা ভাণ্ডারের অধিরাজকেই ভুলিয়া বসিয়া আছি, পরের ভিক্ষাভূষণকে পরম স্পৃহনীয় রাজবেশ মনে করিয়া অঙ্গে ধারণ করিতেছি! আমাদের চেয়ে অধিকতর কৃপার পাত্র আর কে?

হে ভারতবাসী, ভারতবর্ষই সেই মহাতপস্বী; তাহার সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসই তাহার গৈরিক উত্তরীয়। সেই মহাতপস্বী আজ উপেক্ষিত, সেই গৈরিক আজ ধূল্যবলুণ্ঠিত। আর তাহার হতভাগ্য সন্তানগণ কিনা পরান্ন, পরবস্ত্র সংগ্রহ করিয়া আনন্দে আত্মহারা! বহু শত বৎসরের পরাধীনতার দণ্ড আজ আমরা ভোগ করিতেছি, তাই আমাদের চক্ষু আজ অন্যত্র নিবদ্ধ, বাহিরে নিবদ্ধ, বিদেশে নিবদ্ধ। বহু শত বৎসর কেহ আমাদের দৃষ্টি নিজের দিকে আকর্ষণ করে নাই, তাই নিজেকে জানি না, আর জানি না যে নিজেকে না জানিলে বিশ্বকে জানা যায় না। নিজের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে আমরা উদাসীন বলিয়াই পরের উঞ্ছ সংগ্রহ করিয়া আনন্দোৎসবের আয়োজন করিতেছি। কিন্তু এ ভিক্ষুকের ভোজে কে যোগদান করিবে? ভিক্ষুককে লোকে ভিক্ষা দেয়, আপন মনে করে না। হে ভারতবাসী, এই ঘৃণ্য উঞ্ছ সংগ্রহ-বৃত্তি পরিত্যাগ করো। বর্ষারম্ভে মহাতপস্বীর, ভারতবর্ষের সঙ্কল্প গ্রহণ করো।

হে ভারতবাসী, 'ভারতবর্ষ' এই পাঁচটি অক্ষরকে তোমার বীজমন্ত্ররূপে গ্রহণ করো। এই মন্ত্রের মধ্যেই অসীম সার্থকতার সন্ধান পাইবে। এই পঞ্চাক্ষর অসীম রসের, অনন্ত ঐশ্বর্যের, অতল ভাবের আধার। এই মন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধ হইলে তুমি নিজ পথের সন্ধান পাইবে, অপরকে পথের সন্ধান দিতে পারিবে। ইহার সিদ্ধিতেই যুগপৎ তোমার ও বিশ্ববাসীর মুক্তির

উপায় নিহিত তোমার মহৎ ভাগ্য সম্বন্ধে আর তুমি উদাসীন থাকিও না, অবিলম্বে তুমি সচেতন হও।

"হে ভারত, বহু পুণ্যবান পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা,—এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না,—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতে মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত; ভুলিও না তোমার সমাজ সেই বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিনরাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমার মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

হে ভারতবাসী, স্বদেশাত্মার অবহেলায় চরিতার্থতা নাই, ভারতবর্ষকে অস্বীকার করায় বিশ্বের পথ মুক্ত হইবে না, আপনাকে না জানিলে অপরের কাছে সম্মান পাইবে না। অতএব তোমার আত্মচৈতন্য ফিরিয়া আসুক, সশ্রদ্ধ চিত্তে তুমি মহাতপস্বীর দীক্ষা গ্রহণ করো—বর্ষারম্ভে নূতন করিয়া ভারতবোধের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া জীবনকে ধন্য করো।

৪

সাধনার অন্তরায়

মহৎ সাধনায় বৃহৎ অন্তরায়। ইহাই বোধ করি নৈসর্গিক বিধি। নতুবা জগতে যেখানে যত মহৎ সাধনা হইয়াছে বৃহৎ অন্তরায় তাহার পথে আসিয়াছে কেন? বরঞ্চ আকস্মিক বাধাতেই প্রতিপন্ন হয় যে সাধক সাধনায় বসিয়াছে; সে বাধা যত কঠিন সে সাধনা তত মহৎ। পৃথিবীর রাষ্ট্রসাধনার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ শান্তির উপাসক, পঞ্চশীল তাহার মন্ত্র। যদিচ সিদ্ধি এখনো করায়ত্ত নয়, তবু আশার বিষয় এই যে শান্তির দুরূহ মার্গ তাহার অপরিচিত নয়। তাহার উত্তরসাধকগণ বুদ্ধ, চৈতন্য, গান্ধী, অশোক প্রভৃতি তাহার পথ-প্রদর্শক। আর যুদ্ধক্লান্ত, যুদ্ধভীত পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রও এই দুরূহ মার্গে তাহার সঙ্গী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে।

কিন্তু পরীক্ষার প্রয়োজন ছিল, তাই বোধ করি ইতিহাসের বিধাতা ভারতের সাধন-পন্থায় বাধা আনিয়া দিলেন, গোয়ার বিদেশী শাসক নিরস্ত্র সত্যাগ্রহিগণকে গুলিবিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করিল। এখন প্রশ্ন, ভারত এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে না ব্যর্থকাম হইবে, এখন জিজ্ঞাস্য এই ভারত শান্তির পথে সিদ্ধির দিকে চলিবে না ব্রতভঙ্গ করিবে। দেশ ও বিদেশের সহস্র নেত্র আশা-আশঙ্কায় ভারতের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে, ইহা যেন আমরা মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত না হই।

চরম বর্বরতার সম্মুখে ধৈর্য রক্ষা করা শ্রেষ্ঠ বীরের লক্ষণ, আর বড়ই আনন্দের কথা এই যে, পঞ্চশীল মন্ত্রের নবীন উদ্গাতা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরুজী বীরকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, পর্তুগাল আমাদের উত্তেজিত করিয়া যুদ্ধে লিপ্ত করিতে পারিবে না, বর্বরতার দ্বারা আমাদের শান্তিব্রত ভঙ্গ করিতে পারিবে না—যতই কেন না চেষ্টা করুক। ইহাই তো গান্ধীশিষ্যের যোগ্য, ইহাই তো অহিংসাব্রত ভারতের যোগ্য; ইহাই ভারতের মর্মবাণী।

পর্তুগাল কেন নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীকে বধ করিতে গেল জানি না, কারণ ইহা মানবস্বভাব নয়, খুব সম্ভব ইহা সাম্রাজ্যবাদের স্বভাবসিদ্ধ। এই কাণ্ডের

দায়িত্ব একা পর্তুগালের না আর কাহারো ইঙ্গিত আছে জানি না, কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মাত্র কয়েকদিন আগে ইউরোপের যেসব রাষ্ট্র পঞ্চশীল, পঞ্চশীল রবে উন্নর্তন করিয়াছিল আজ তাহাদের অধিকাংশই নিস্তব্ধ। তবে কি পঞ্চশীল তাহাদের মনের কথা নয়, মুখের উচ্ছ্বাস মাত্র? তাহাদের সকলেরই যে স্বনামে, বেনামে ছোট বড় ঔপনিবেশিক পত্তন আছে, গোয়ার অধিকার অস্বীকার করিলে নিজেদের অধিকারও যে অস্বীকৃত হইয়া যায়! তাই কি! ভারতের উত্থান ও সম্মান কি তাহাদের চক্ষুর শূল হইয়াছিল—তাহারা কি চায় ভারত নিজে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া প্রমাণ করুক যে পঞ্চশীল তাহারও মনের কথা নয়, যেমন তাহাদের নিজেরও মনের কথা নয়! জানি না তাহাদের নিস্তব্ধতার প্রকৃত কারণ কি, তবে প্রমাণ হইয়া গেল যে পঞ্চশীলের প্রকৃত সাধকের সংখ্যা খুব বেশি নয়। ইহা ভারতের পক্ষে একটি অমূল্য শিক্ষা, ইহার প্রয়োজন ছিল, কেননা, রাজনীতির পথে ভারত নবীন পথিক।

কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে, এইমাত্র ক-দিন আগে যেসব ভারতীয় নেহরুর শান্তিনীতিকে সমর্থন করিয়াছিলেন, আজ তাঁহাদের অনেকেই নেহরুকে যুদ্ধে নামিবার জন্য প্ররোচিত করিতেছেন। তাঁহারা কি ভাবিয়াছিলেন যে, পঞ্চশীলের পথ কুসুমাস্তীর্ণ? তাঁহারা কি জানিতেন না যে, সিদ্ধির পথে বাধা অবশ্যম্ভাবী? কিংবা তাঁহারা বিদেশী বিশেষ রাষ্ট্রগোষ্ঠীর কল্যাণ কামনাতেই শান্তি কামনা করেন, স্বদেশের কল্যাণের জন্য নহে। কিংবা তাঁহাদের কাছেও ভারতের সম্মান দৃষ্টিকটু লাগিতেছে! তাঁহারা ঠিক কী চান জানি না, তবে ভারতকে যুদ্ধ-সম্ভাবনার দিকে যাঁহারা প্ররোচিত করিতেছেন দেশের প্রকৃত কল্যাণ কোন পথে তাঁহারা তাহা জানেন না।

কিংবা দু-তিন দফা সত্যাগ্রহ আপাত-নিষ্ফল হইলেও সত্যাগ্রহী যে কখনো হতাশ হইতে পারে না—এই মৌলিক সত্য তাঁহারা অনবগত। গান্ধীজী বলিতেন সত্যাগ্রহী কখনো হতাশ হয় না, তাহার পরাজয় কখনো ঘটে না; পরাজয় একমাত্র তখনই ঘটিতে পারে যখন সে সত্যের পথ, শান্তির পথ পরিত্যাগ করে। যুদ্ধের প্ররোচনাদাতারা কি ভারতকে সেই পথ গ্রহণ করিতে পরামর্শ দেন? সত্যাগ্রহের নীতিতে যদি তাঁহাদের বিশ্বাস না-ই থাকে তবু বাস্তব রাজনীতিজ্ঞান নিশ্চয়ই তাঁহাদের আছে। পৃথিবী আজ

বারুদের স্তূপ। ভারত দেশে দেশে সকলকে সতর্ক করিয়া আসিয়া আজ স্বহস্তে স্বগৃহদ্বারে বারুদস্তূপে অগ্নি সঞ্চার করিবে!

ভারতবর্ষ! হিংসার পথ তোমার নয়; যুদ্ধের পথ তোমার নয়; তোমার পথ বুদ্ধ অশোক গান্ধীর পথ। ইহাই তোমার পথ, ইহাই তোমার সাধনা, ইহাই তোমার ধর্ম। ধর্মকে যে রক্ষা করিয়া চলে, ধর্ম তাহাকে রক্ষা করে—এই পুরাণী বাণী তুমি কখনো বিস্মৃত হইও না। পথে বাধা আসিয়াছে তাই বুঝিলাম ভ্রান্ত পথ ধরি নাই; বৃহৎ বাধা তাই বুঝিলাম মহৎ সাধনা; অত্যাচার গুরুতর হইয়া ওঠাতেই বুঝিলাম সিদ্ধি নিকটবর্তী; এখন লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, স্বধর্ম যেন পরিত্যক্ত না হয়, জয় অনিবার্য, সত্যাগ্রহী কখনো হতাশ হয় না, সত্যাগ্রহী কখনো পরাজয় মানে না, সত্যাগ্রহী কখনো স্বধর্ম ত্যাগ করে না। মনে রাখিতে হইবে যে আজ পঞ্চশীলের পরীক্ষা।

৫

অখ্যাত অজ্ঞাতদের কথা

আজ স্বাধীনতা উৎসবদিনে কী লিখিব? উপলক্ষ্যের উপযোগী কলম কি আছে? যতই কেন চেষ্টা করি না, কমলাকান্তের কলমের সাধ্যও নাই উৎসবের যোগ্য কিছু সৃষ্টি করে। তবে? ভাবিলাম অতিশয় সাধারণ কথাই লিখি না কেন? লেখক হইয়াছি বলিয়াই যে সর্বদা কল্পনার শরণ লইতে হইবে এমন কি কথা আছে? সাধারণ কথার চিন্তায় কয়েকটি অসাধারণ ঘটনা মনে পড়িল। বক্তাগণ অত্যন্ত সাধারণ কিন্তু ঘটনাগুলির তুলনা নাই। তৃণবনে পতিত হইলেও মুক্তার মূল্যের তারতম্য ঘটে না।

তখন ১৯৪৯ সাল। দেশে অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া এখানে ওখানে, চাপা অশান্তি ও প্রকট অসন্তোষ ইতস্ততঃ। ঘটনাচক্রে মেডিক্যাল কলেজের এক দারোয়ানের সঙ্গে আলাপ, তাহার বাড়ি ছাপরা জেলা। শুধাইলাম, তারপরে দারোয়ানজী, স্বাধীনতা কেমন লাগিতেছে? আমার দিকে বিস্মিত নেত্রে তাকাইল লোকটা, ভাবটা এমন বিষয়ে কি মতভেদ থাকিবে? তারপর বলিল, খুব ভালো বাবুজী।

বলো কি, দেশে অন্ন নাই, বস্ত্র দাম চড়া, তবু ভালো!

এমন তো চিরকাল থাকিবে না, অন্ন, বস্ত্র সবই পাওয়া যাইবে একসময়।

তবে এখন কেন ভালো লাগে?

এবারে বোধহয় তাহার আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল, সে একটু উত্তেজিত-ভাবে বলিল, আসল জিনিস যে ছিল না আংগ্রেজ আমলে।

কী সেটা?

ইমান।

কেন?

এখানে দারোয়ানি করিতেছি সাতাশ বছর। সাহেব লোক যায় আসে, আমাদের মানুষ মনে করিত না। দাঁড়াইয়া উঠিতে, সেলাম করিতে একটু বিলম্ব হইলে গালাগালি দিত, সে কী সব গালাগালি। কোনো কোনো সাহেব ছড়ি দিয়া আঘাতও করিয়াছে। কিছু বলিবার উপায় নাই, 'নোকরি' যাইবে, সব হজম করিতাম। এ সব কি ভালো ছিল বাবুজি! তারপরে যখন 'আজাদ' হইল সেই সাহেবদের চলনে-বলনে একরাত্রে তফাত হইয়া গেল। আগে ছিলাম দারোয়ান এখন হইয়াছি মানুষ—আর এসব হইয়াছে এক রাত্রের ব্যবধানে। বাবুজি এতদিন পেট ভরিয়া খাইয়াছি তবু দারোয়ান বই ছিলাম না—এখন মানুষ হইয়াছি কিছুদিন আধপেটা খাইয়া না হয় থাকিব।

ইচ্ছা করিল খপ্ করিয়া তাহার পায়ের ধুলো নিই, পারিলাম না, কাছাকাছি অন্য লোক ছিল। আর স্থানটাও কিনা মেডিক্যাল কলেজ, নানাব্যাধির চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে, হয়তো মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা-ব্যবস্থাও থাকিবে—যদি সেখানে টানিয়া লইয়া যায়!

আর একটি ঘটনার স্থল হাওড়া স্টেশন। কুলির মাথায় বিছানা বাক্স তুলিয়া দিয়া অপেক্ষা করিতেছি—গাড়ি 'ইন্' করে নাই। ক্রমে কথায় কথায় নানা প্রসঙ্গ উঠিল। এবং কথাচ্ছলে 'কুলি'র জীবনের যে বিবরণ শুনিলাম—সে এক বিস্ময়ের প্রচণ্ড ধাক্কা।

সে বলিল তাহার এক লেড়কা 'মেটিয়া' কলেজে পড়ে।

লোকটা বলে কী! 'মেটিয়া' কলেজ তো জানি মেডিক্যাল কলেজ।

'মেটিয়া' কলেজে পড়িতে হইলে যে পাশ করিতে হয়।

বারুদের স্তূপ। ভারত দেশে দেশে সকলকে সতর্ক করিয়া আসিয়া আজ স্বহস্তে স্বগৃহদ্বারে বারুদস্তূপে অগ্নি সঞ্চার করিবে!

ভারতবর্ষ! হিংসার পথ তোমার নয়; যুদ্ধের পথ তোমার নয়; তোমার পথ বুদ্ধ অশোক গান্ধীর পথ। ইহাই তোমার পথ, ইহাই তোমার সাধনা, ইহাই তোমার ধর্ম। ধর্মকে যে রক্ষা করিয়া চলে, ধর্ম তাহাকে রক্ষা করে—এই পুরাণী বাণী তুমি কখনো বিস্মৃত হইও না। পথে বাধা আসিয়াছে তাই বুঝিলাম ভ্রান্ত পথ ধরি নাই; বৃহৎ বাধা তাই বুঝিলাম মহৎ সাধনা; অত্যাচার গুরুতর হইয়া ওঠাতেই বুঝিলাম সিদ্ধি নিকটবর্তী; এখন লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, স্বধর্ম যেন পরিত্যক্ত না হয়, জয় অনিবার্য, সত্যাগ্রহী কখনো হতাশ হয় না, সত্যাগ্রহী কখনো পরাজয় মানে না, সত্যাগ্রহী কখনো স্বধর্ম ত্যাগ করে না। মনে রাখিতে হইবে যে আজ পঞ্চশীলের পরীক্ষা।

৫

অখ্যাত অজ্ঞাতদের কথা

আজ স্বাধীনতা উৎসবদিনে কী লিখিব? উপলক্ষ্যের উপযোগী কলম কি আছে? যতই কেন চেষ্টা করি না, কমলাকান্তের কলমের সাধ্যও নাই উৎসবের যোগ্য কিছু সৃষ্টি করে। তবে? ভাবিলাম অতিশয় সাধারণ কথাই লিখি না কেন? লেখক হইয়াছি বলিয়াই যে সর্বদা কল্পনার শরণ লইতে হইবে এমন কি কথা আছে? সাধারণ কথার চিন্তায় কয়েকটি অসাধারণ ঘটনা মনে পড়িল। বক্তাগণ অত্যন্ত সাধারণ কিন্তু ঘটনাগুলির তুলনা নাই। তৃণবনে পতিত হইলেও মুক্তার মূল্যের তারতম্য ঘটে না।

তখন ১৯৪৯ সাল। দেশে অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া এখানে ওখানে, চাপা অশান্তি ও প্রকট অসন্তোষ ইতস্তত:। ঘটনাচক্রে মেডিক্যাল কলেজের এক দারোয়ানের সঙ্গে আলাপ, তাহার বাড়ি ছাপরা জেলা। শুধাইলাম, তারপরে দারোয়ানজী, স্বাধীনতা কেমন লাগিতেছে? আমার দিকে বিস্মিত নেত্রে তাকাইল লোকটা, ভাবটা এমন বিষয়ে কি মতভেদ থাকিবে? তারপর বলিল, খুব ভালো বাবুজী।

বলো কি, দেশে অন্ন নাই, বস্ত্র দাম চড়া, তবু ভালো!

এমন তো চিরকাল থাকিবে না, অন্ন, বস্ত্র সবই পাওয়া যাইবে একসময়।

তবে এখন কেন ভালো লাগে?

এবারে বোধহয় তাহার আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল, সে একটু উত্তেজিতভাবে বলিল, আসল জিনিস যে ছিল না আংগ্রেজ আমলে।

কী সেটা?

ইমান।

কেন?

এখানে দারোয়ানি করিতেছি সাতাশ বছর। সাহেব লোক যায় আসে, আমাদের মানুষ মনে করিত না। দাঁড়াইয়া উঠিতে, সেলাম করিতে একটু বিলম্ব হইলে গালাগালি দিত, সে কী সব গালাগালি। কোনো কোনো সাহেব ছড়ি দিয়া আঘাতও করিয়াছে। কিছু বলিবার উপায় নাই, 'নোকরি' যাইবে, সব হজম করিতাম। এ সব কি ভালো ছিল বাবুজি! তারপরে যখন 'আজাদ' হইল সেই সাহেবদের চলনে-বলনে একরাত্রে তফাত হইয়া গেল। আগে ছিলাম দারোয়ান এখন হইয়াছি মানুষ—আর এসব হইয়াছে এক রাত্রের ব্যবধানে। বাবুজি এতদিন পেট ভরিয়া খাইয়াছি তবু দারোয়ান বই ছিলাম না—এখন মানুষ হইয়াছি কিছুদিন আধপেটা খাইয়া না হয় থাকিব।

ইচ্ছা করিল খপ্ করিয়া তাহার পায়ের ধুলো নিই, পারিলাম না, কাছাকাছি অন্য লোক ছিল। আর স্থানটাও কিনা মেডিক্যাল কলেজ, নানাব্যাধির চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে, হয়তো মানসিক ব্যাধির চিকিৎসাব্যবস্থাও থাকিবে—যদি সেখানে টানিয়া লইয়া যায়!

আর একটি ঘটনার স্থল হাওড়া স্টেশন। কুলির মাথায় বিছানা বাক্স তুলিয়া দিয়া অপেক্ষা করিতেছি—গাড়ি 'ইন্' করে নাই। ক্রমে কথায় কথায় নানা প্রসঙ্গ উঠিল। এবং কথাচ্ছলে 'কুলি'র জীবনের যে বিবরণ শুনিলাম—সে এক বিস্ময়ের প্রচণ্ড ধাক্কা।

সে বলিল তাহার এক লেড়কা 'মেটিয়া' কলেজে পড়ে।

লোকটা বলে কী! 'মেটিয়া' কলেজ তো জানি মেডিক্যাল কলেজ। 'মেটিয়া' কলেজে পড়িতে হইলে যে পাশ করিতে হয়।

হাঁ বাবু, আমার লেড়কা দুটা পাশ দিয়াছে।

বুঝিলাম ম্যাট্রিকুলেশন ও আই. এস-সি।

ক-বছর ঢুকিয়াছে?

তিন সাল।

ভাবিলাম তবে এবার তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী। আর বছর দুই পরে সে ডাক্তার হইয়া বাহির হইবে।

কিন্তু সেখানে পড়িতে যে অনেক টাকা লাগে। দেয় কে?

আমি দিই।

পাও কোথায়?

এখানে রোজগার করি।

বিস্ময়ের চমক ভাঙিবার আগেই গাড়ি আসিয়া পড়িল—চিন্তার সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল।

আর একটি ছোট ঘটনা। একদিন একটি স্ত্রীলোক কিছু ভিক্ষা চাহিল। তাহাকে পেশাদার ভিক্ষুক মনে না হওয়ায় তাহার হাতে একটি অপ্রত্যাশিত মুদ্রা দিলাম। কিছুক্ষণ পরে সে ফিরিয়া আসিয়া এক পয়সা বাদে বাকি আমাকে ফিরাইয়া দিতে উদ্যত হইল।

আমি বলিলাম—থাক্, ও তুমি নাও।

খুব সম্ভব সে ভাবিয়াছিল এক পয়সার বেশিতে ভিখারীর অধিকার নাই—নূতন ব্রতী কিনা!

এমন সব লোক এখনো দেশে আছে। এদেশ কেবল জাল জোচ্চোর ধাপ্পাবাজ ও রাজনৈতিক ফড়িয়াদের দ্বারা অধ্যুষিত নয়। পূর্বোক্তদের সংখ্যাই বেশি আর তাহারাই দেশের আশা-ভরসার স্থল। তাই আজ স্বাধীনতা-উৎসবের দিনে অখ্যাত অজ্ঞাতদের কথা আরো বেশি করিয়া মনে পড়িতেছে।

৬

ভারতের আত্মপ্রতিষ্ঠা

রবীন্দ্রনাথ মহাকবি, কিন্তু সেই মহাকবিত্বেই তাঁর পরিচয় ও কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ নয়। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে কাব্যের অতিরিক্ত কোনো বাণীই তাঁহার নিকট হইতে আমরা পাইতাম না। তিনি রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি সম্বন্ধেও গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছেন। শহুরে সভ্যতায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না, দেশের নাড়ীর সহিত তাঁর আত্মার যোগ ছিল। মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি তাঁর ঐকান্তিক অনুরক্তির কথাও সর্বজনবিদিত। এই নিবন্ধে উক্ত বিষয়াবলী সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

পঁচিশে বৈশাখ কবিগুরুর আবির্ভাবোৎসব দেশের সর্বত্র সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইবে। এই অনুষ্ঠানটির সর্বব্যাপিতা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, মহাকবির বাণী আমাদের চিত্তে গিয়া সাড়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহা আশার কথা, আনন্দের বিষয়। আজ পঁচিশে বৈশাখ উপলক্ষ্যে কবির বাণীকে একবার স্মরণ করা যাইতে পারে।

যে ব্যক্তি কবিমাত্র বা সাহিত্যিকমাত্র তাহার অধিক কিছু নয়, তাহার কাব্যকে, সাহিত্যিকতা বাদ দিলে স্মরণীয় আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু মহাকবির মহাকাব্যকে বাদ দিলেও স্মরণীয় অংশ কিছু থাকিয়া যায়—সেই স্মরণীয় অংশই তাঁহার বাণী। সেই বাণীরূপ তাঁহার কাব্যকীর্তিকে অতিক্রম করিয়া বিরাজ করে। ভাষাজ্ঞানের অভাববশতঃ যাহার পক্ষে রবীন্দ্রনাথের কাব্য পাঠ করা সম্ভব হয় নাই, সেই ব্যক্তিও তাঁহার বাণীকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, কারণ কাব্যের মতো বাণী ভাষার উপরে নির্ভর করে না, যে ভাষাতেই তাহাকে রূপান্তরিত করা যাক না কেন তাহার দীপ্তি সমান উজ্জ্বল থাকে। রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট বাণী কী? বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে তিনি নূতন কিছু বলিয়াছেন, আবার স্বদেশবাসীর উদ্দেশ্যেও কিছু বলিয়াছেন। আমরা শেষোক্ত বাণীকেই স্মরণ করিব।

মহাকবি গেটে একস্থানে বলিয়াছেন যে, যাহা কিছু জ্ঞানের কথা তাহা পূর্বেই চিন্তিত হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিতেছেন আমাদের কাজ সে

সমস্তকে পুনরায় চিন্তা করা। পুনরায় চিন্তা করা বলিতে বোঝায় যে পুরাতন সত্যগুলিকে আমরা জীবনের অন্ততলে প্রয়োগ করি। ইহাকেই ম্যাথ্ আর্নল্ড বলিয়াছেন, "Application of Ideas to life." একথাগুলি স্মরণ করাইয়া দিবার তাৎপর্য এই যে কবিগুরুর বাণী নূতন নয়, নূতনত্ব তাহার প্রয়োগ। ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ যে সব সত্যকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের বাস্তবনিষ্ঠ প্রতিভা তাহাদের বিশেষ ক্ষেত্রে, বিশেষ উপলক্ষে প্রয়োগ করিয়াছে। গেটের ভাষায় জ্ঞানের কথাকে নূতন করিয়া কবি চিন্তা করিয়াছেন।

'আত্মানং বিদ্ধি' একটি প্রাচীন মন্ত্র। কিন্তু বহু ব্যবহার ও বহু শ্রুতির ফলে মন্ত্রটির গুরুত্ব যেন আমাদের মনে কমিয়া গিয়াছে। সংসারে এমনই হইয়া থাকে, পুরাতন মুদ্রার জলুস কমিয়া আসে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহার মূল্য কমে কি? রবীন্দ্রনাথের সংস্কারভেদী দৃষ্টি অনায়াসে সঞ্চিত আবর্জনা-রাশি অতিক্রম করিয়া এই অভয় বাণীর মর্মস্থলে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং তাহাকে আমাদের জীবন পরিবেশের মধ্যে নূতনভাবে প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ও সামাজিক রচনাবলী ও মতামতের সহিত যাহাদের কিছু মাত্র পরিচয় আছে তাহারাই বলিবেন যে, কবির রাজনীতি ও সমাজনীতি প্রধানতঃ আত্মমুখী। যে কালে দেশের নেতাগণের নেতৃত্ব মর্যাদা ইংরাজী উচ্চারণের বিশুদ্ধতার উপরে নির্ভর করিত, এখানকার আন্দোলন বিলাতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করিলে সমস্ত ব্যর্থ বলিয়া মনে হইত, সে কালে উপহসিত হইবার আশঙ্কা সত্ত্বেও কবিকে বলিতে হইয়াছিল বিদেশে মন পড়িয়া থাকিলে দেশের কোনো কাজ হইবে না, বাহির হইতে চিত্তকে জুড়াইয়া আনিয়া ঘরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তিনি বলিয়াছিলেন যে, স্বাধীনতা লাভ মানে নিজে বড় হওয়া, অপরকে ছোট করিয়া দেওয়া নয়। তিনি সকলকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন যে, আমাদের দুর্বলতার উপরেই শত্রুর শাসনের ভিত্তি। নিজেরা সবল হইতে পারিলে বিদেশী শাসনের ভিত্তিটাই ধ্বসিয়া পড়িবে। নিজেকে দেখো, নিজের দেশকে জানো, নিজের অন্তরের কথা শোনো, দেখিয়া জানিয়া শুনিয়া শক্তিমান হইয়া ওঠো। ইহাই তাঁহার রাজনীতি ও সমাজনীতির মূলগত

সত্য। বস্তুতঃ ইহা প্রাচীন 'আত্মানং বিদ্ধি' মন্ত্রের নবতম প্রয়োগ ভিন্ন আর কিছুই নয়।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজের পরিকল্পনা, তাঁহার দেশনায়ক বরণের প্রস্তাব ওই একই মন্ত্রের নূতন ব্যবহার। তিনিই প্রথমে দেশের গোটা কয়েক শহরের দিক হইতে চিন্তাশীলগণের দৃষ্টি গ্রামে গাঁথা এই দেশের দিকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথমে বলিয়াছিলেন, যে, শহরের উন্নতি দেশের উন্নতি নয়। কবির বাণী এই যে, ভারতবর্ষের প্রাণ-পুরুষ তাহার গ্রামগুলিতে বিরাজ করিতেছে সেখানেই আমাদের প্রকৃত স্বদেশী সমাজ। শিক্ষার ক্ষেত্রেও দেখিতে পাইব যে, মাতৃভাষাকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে তাঁহার চেষ্টার ও উক্তির ত্রুটি নাই। এই সমস্ত প্রচেষ্টাই একটি সাধারণ সত্যে পর্যবসিত হইতে পারে, সেই সাধারণ সত্যটি ভারতের প্রাচীন মন্ত্র 'আত্মানং বিদ্ধি'। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে রবীন্দ্রনাথ বিলাতি বস্ত্রের বয়কট সমর্থন করিয়াছিলেন কিন্তু অন্যান্য নেতাদের সমর্থনের সহিত তাহার একটা মৌলিক ভেদ ছিল। অন্যান্য নেতারা বলিতেন যে, ইংরাজকে জব্দ করিবার জন্যই বিলাতি কাপড় পরা ছাড়িব। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, তাহা হইবে না। ইংরাজকে জব্দ করা উদ্দেশ্য হইলে মনটা ইংরাজের দরজাতেই পড়িয়া থাকিবে, তাহার ফলে ইংরাজ জব্দ হইলেও আমরাও কম জব্দ হইব না, যাহার মন স্বায়ত্ত নয়, তাহার চেয়ে দুর্বল, অসহায় আর কে? তিনি বলিলেন যে, নিজের তৈরী কাপড় পরা উচিত বলিয়াই পরিব। বাহ্য ফলের বিচারে এই দুই দৃষ্টিতে বিশেষ ভেদ নাই কিন্তু আসল ভেদটা গোড়ায়। একজনের দৃষ্টি বাহিরে পড়িয়া আছে, রবীন্দ্রনাথ তাহাকে ভিতরে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিতেছেন অর্থাৎ তিনি ভাষান্তরে 'আত্মানং বিদ্ধি' এই মন্ত্রই উচ্চারণ করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের আর এক মহাপুরুষের উল্লেখ করা যাইতে পারে। অহিংসা ও করুণার বাণী নূতন নয়। নূতন ক্ষেত্রে, নূতন ব্যবহারে তাহাদের সার্থক প্রয়োগেই মহাত্মাজীর প্রতিভা ও বাস্তববুদ্ধি প্রকাশ পাইয়াছে। মহাত্মাজী যাহাকে 'change of heart' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—বস্তুতঃ তাহাও রূপান্তরে 'আত্মানং বিদ্ধি' ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ হৃদয়ের পরিবর্তন করিতে হইলে আত্মস্থ হইতে হয়, আত্মাকে জানিতে হয়। ফল কথা, গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথ দুইজনেই ইউরোপের দিকে

বিক্ষপ্ত আমাদের চিত্তকে ঘরের মধ্যে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং এইভাবে আত্মস্থ হইবার সুযোগ আমাদের দিয়াছেন। সে সুযোগ আমরা লইব কি না বা কতখানি লইব তাহা সম্পূর্ণরূপে আমাদের উপরেই নির্ভর করিতেছে।

এখন দেশ স্বাধীন হইয়াছে। স্বাধীনতার দায়িত্বের অজুহাতে আত্মস্থ হইবার গুরুত্ব বাড়িয়া গিয়াছে। পঁচিশে বৈশাখের ঋষি পথ-নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন—এখন আমরা কি করিব, কীভাবে চলিব সে দায়িত্ব আমাদের। কিন্তু বড়ই আশঙ্কার কথা এই যে, কবিগুরুর বাণীর প্রতি আমাদের আশানুরূপ দৃষ্টি যেন নাই। রাজনীতি ক্ষেত্রে, শিক্ষায়, সমাজে সর্বত্র ব্যক্তিগত ও দলগত বিরোধ বৃহত্তর বিরোধের ভূমিকা রচনায় ব্যস্ত। একদল অপর দলকে শত্রু ভাবিতেছে আর সেই কারণেই মনটা গিয়া শত্রুর দরজায় পড়িয়া আছে। নিজের মন আর আমাদের নিজের অধীন নয়, আয়ত্ত নয়। জানিব কী? জানিব কাহাকে? গান্ধী-পূর্ব কংগ্রেসের যুগে দেশের নেতাদের মন যেমন বিলাতমুখী ছিল, স্বাধীনতালাভের পর দেশের নেতাদের, রাজনৈতিক কর্মীদের মন আজ তেমনি পরদলমুখী। পরদলের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া স্ব-জনের পুষ্টিসাধনই যেন আজ আমাদের রাজনৈতিক কৃতিত্বের পরাকাষ্ঠা হইয়া উঠিয়াছে। 'আত্মানং বিদ্ধি' মন্ত্র আজ নিরর্থক ধ্বনি মাত্র।

অনেকের বিশ্বাস এই যে, রবীন্দ্রনাথের বাণীতে রাজনীতিক ও বাস্তব কর্মীদের তেমন প্রয়োজন নাই, তাঁহাদের বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-সাহিত্য একপ্রকার সূক্ষ্ম বিলাস মাত্র। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, রাজনীতি ক্ষেত্রের ব্যক্তিদের পক্ষে রবীন্দ্র-বাণী আজ যেমন অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে—এমন আর কাহারো পক্ষে নয়। ভারতবর্ষের রাজনীতি আজ 'আত্মানং বিদ্ধি' বাণী ভুলিতে বসিয়াছে। এই বাণীতে আজ তাহার বড়ই আবশ্যক। আমাদের রাজনীতিকগণ বিনম্রচিত্তে, নত মস্তকে কবিগুরুর নির্দেশ গ্রহণ করিবার আশায় তাঁহার বাণী-প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছেন—ইহাই আজ আমরা দেখিতে চাই। কবির বাণীকে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণে, নিষ্ঠার সহিত পালনে পঁচিশে বৈশাখের যথার্থ সার্থকতা—নতুবা "মিছে তব সহকার শাখা, মিছে তব মঙ্গল কলস"।

৭

ভারতাত্মা রবীন্দ্রনাথ

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষের মহাপুরুষ, মনীষী ও জনগণ এই দেশকে উপলব্ধির চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। প্রাচীন কাব্য ও পুরাণ এই উপলব্ধির প্রচেষ্টা বহন করিতেছে। প্রধানত সাত্ত্বিক ও রাজসিক উপায়ে ভারতবর্ষকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ধর্ম-গুরুগণ সাত্ত্বিক উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, রাজা ও যোদ্ধাগণ রাজসিক উপায়কে আশ্রয় করিয়াছেন। আচার্য শঙ্করের ভারতের চার প্রান্তে চারটি মঠ প্রতিষ্ঠা সাত্ত্বিক উপলব্ধির চিহ্ন; আবার মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের দক্ষিণাপথ পরিভ্রমণ এই প্রচেষ্টারই অঙ্গ। এদেশের বহু ধর্মগুরু ভারতভ্রমণকে একটি প্রধান কর্মসূচীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের ভারতভ্রমণ তাহার একটি আধুনিক দৃষ্টান্ত। মহাত্মা গান্ধীর সমগ্র দেশ পর্যটনকেও এই পর্যায়ে ফেলিতে পারি, কেননা, তাঁহার কাছে ধর্মনীতি ও রাজনীতি অভিন্ন। এগুলিকে সাত্ত্বিক প্রচেষ্টা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

রাজসিক প্রচেষ্টার উদাহরণ পৌরাণিক কালের রাজগণের অশ্বমেধ ও রাজসূয় উপলক্ষে ভারত পরিভ্রমণ, ঐতিহাসিক-কালেরও কোনো কোনা পরাক্রান্ত রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়।

এ তো গেল মনীষী, মহাপুরুষ ও রাজন্যগণের প্রসঙ্গ। কিন্তু শুধু এখানে থামিলেই চলিবে না। জনসাধারণও এই প্রচেষ্টার অংশী। তীর্থক্ষেত্রে দেবমন্দির প্রদক্ষিণ এদেশের একটি বহু প্রচলিত রীতি। আমার বিশ্বাস, উহা সংক্ষেপে ভারত প্রদক্ষিণেরই রূপান্তর, কেননা, এদেশের লোকের চোখে ভারতবর্ষ শুধু জন্মভূমি বা কর্মভূমি মাত্র নয়, ধর্মভূমি।

এই তো হইল সাত্ত্বিক ও রাজসিক ভারত প্রদক্ষিণ। ইহার পাশাপাশি আর একটা রীতি বর্তমান তাহা সাত্ত্বিকও নয়, রাজসিকও নয়; তাহার কী নাম দিব জানি না, অন্য নামের অভাবে তাহাকে মানস-ভ্রমণ বলা যাইতে

পারে। এদেশের মহাকবিগণ তাঁহাদের কাব্যে কোনো একটা উপলক্ষ অবলম্বন করিয়া ভারতভ্রমণ বা ভারতোপলব্ধির কার্য সমাধা করিয়াছেন। রামচন্দ্রের পথ বা রামায়ণ অনুসরণ করিয়া বাল্মীকি অযোধ্যা হইতে লঙ্কায় গিয়াছেন—আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। আবার বেদব্যাস, পাণ্ডবগণের রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষে ভারতবর্ষের উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম চারি সীমাকে একাধিকবার স্পর্শ করিয়াছেন। কালিদাস রঘুর দিগ্বিজয় উপলক্ষে, যক্ষের বিরহবার্তার অলৌকিক দূত মেঘের যাত্রাপথ বর্ণনা উপলক্ষে এবং রামচন্দ্রের অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে ঐ একই কাজ করিয়াছেন।

ফলত দেখা যায় যে, এদেশের ধর্মগুরুগণ, রাজন্যগণ, মহর্ষি কবিগণ এবং তীর্থযাত্রী জনগণ, সকলেই কোনো না কোনো উপায়ে কখনো জ্ঞাতসারে, কখনো অজ্ঞাতসারে ভারতোপলব্ধির চেষ্টা করিয়াছেন। এদেশের জীবনের, ধর্মের ও কল্পনার ভিত্তি এই ভারতবোধ। কেন এমন হইল, সে তর্কে এখন প্রবেশ করিয়া কাজ নাই। খুব সম্ভব এদেশের আকৃতিগত বিশালতা এবং ভৌগোলিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা এই বোধের মূলে আছে। এদেশে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, তিনকোণা পৃথিবী ; ভারতবর্ষ ত্রিকোণ ; ভারতবর্ষই পৃথিবী ; এরূপ একটি ধারণা থাকা বিচিত্র নয় ; কাজেই ভারত-প্রদক্ষিণ মানেই ভূ-প্রদক্ষিণ ; ইহা পুণ্য কাজ, আত্মোপলব্ধির উপায়। কাজেই, এই বিচিত্র যুক্তির সূত্র অনুসরণ করিয়া দাঁড়ায় যে ভারতোপলব্ধি মানে আত্মোপলব্ধি। 'আত্মানাং বিদ্ধি' শেষ পর্যন্ত ভারতাত্মানাং বিদ্ধি। শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা কী জানি না, কিন্তু এদেশের আবহমানকালের জীবনধারা অনুসরণ করিলে মনে হয়—নিজেকে জানো এবং ভারতকে জানো—এ দুই জানা এদেশের দৃষ্টিতে অভিন্ন হইয়া দেখা দিয়াছিল। এমনটি আর কোনো দেশে ঘটিয়াছে কি না জানি না। মধ্যযুগে খ্রীষ্টীয় ইউরোপের কাছে ইউরোপ এমন মাহাত্ম্য লাভ করে নাই, কেননা, তাহার পবিত্রতম তীর্থ ছিল ইউরোপ-খণ্ডের বাহিরে ; প্রাচীন চীন ও জাপানের পবিত্রতম তীর্থও সে-সব দেশে অবস্থিত নয়; ইসলাম ধর্ম বহুদেশে বিস্তৃত, কিন্তু তাহার তীর্থসন্ধানীদৃষ্টি সর্বদাই সে-সব দেশের বাহিরে অন্যত্র, কাজেই এসব ধর্মের পক্ষে কোনো একটি দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে দেখা সম্ভব হয় নাই। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক পরিধি, ধর্মীয় পরিধি, জন্মভূমি ও ধর্মভূমি এক হইয়া গিয়া তাহাকে একটা অসাধারণ মাহাত্ম্য দিয়াছে। এই

প্রভেদটুকু না বুঝিলে ভারতবর্ষকে বুঝিবার চেষ্টা বৃথা; তাহার ধর্ম, শিল্প-সাহিত্য, লোকজীবন কিছুই বুঝিতে পারা যাইবে না।

এ যুগে রবীন্দ্রনাথ নূতন করিয়া সেই পুরাতন সত্যটিকে আবিষ্কার করিয়াছেন এবং তাহাকে অমর বাণীরূপে মণ্ডিত করিয়াছেন। 'সিন্ধু মাঝারে মিশিছে যেমন পঞ্চনদীর জল' তেমনি তাঁহার ব্যক্তিত্বের মধ্যে ভারতের বিচিত্র সাধনার ধারা আসিয়া মিশিয়াছে—আবার নিজের ব্যক্তিত্বের দ্বারা এই বৃহৎ দেশকে তিনি পরিমণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন; এই দ্বৈত ক্রিয়া বর্তমান রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূলে। খুব বেশি ভিতরে প্রবেশ না করিয়াও কেবল কথা ও কাহিনী কাব্য অবলম্বনেই একটা ক্রিয়াকে প্রমাণ করা যায়। উপনিষদ কাহিনী, বৌদ্ধ জাতক, মধ্যযুগের সাধকগণের জীবন, শিখ, মারাঠা, পাঠান ও মোগল ইতিহাস সবই মিলিত হইয়াছে; কাহিনী অংশে আছে বাঙলা দেশের বর্তমানকালের লোকজীবন। ইহার সঙ্গে যদি কল্পনা কাব্য, নৈবেদ্য কাব্য এবং গান্ধারীর আবেদন, কর্ণ-কুন্তী সংবাদ প্রভৃতি ধরি, তবে দেখা যাইবে যে, ভারতবর্ষের জীবনধারার কোনো মূল শাখাই বাদ পড়ে নাই, শাখা এবং উপশাখা, সমস্ত নদ-নদী আসিয়া 'সিন্ধু মাঝারে' আত্মসমর্পণ করিয়া তাহাকে পুষ্টতর প্রবলতর করিয়া তুলিয়াছে। এই প্রক্রিয়া প্রাচীনকালের কবিগণের মানস-ভ্রমণের অনুরূপ। ইহা ভারতোপলব্ধি বা আত্মোপলব্ধি ছাড়া কিছুই নয়।

রবীন্দ্রনাথের বেলায় যে দ্বৈত প্রক্রিয়ার উল্লেখ করিয়াছি, ইহা তাহার অন্যতর। অপরটি এবারে বর্ণনা করিতেছি। ইহা কেবল মানস-ভ্রমণ নয় তাহার বেশি; ইহা সশরীরে ভারত-ভ্রমণ, ইহাকে কবি-কল্পনার অশ্বমেধ বলা যাইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী সাহিত্য-সাধনার যদি একটা মানচিত্র রচনা করা সম্ভব হয়, তবে দেখা যাইবে যে, ভারতের এমন কোনোপ্রদেশ নাই, এমন কোনো প্রধান নগর নাই, এমন কোনো তীর্থক্ষেত্র নাই, যেখানে বসিয়া তিনি কিছু না কিছু রচনা না করিয়াছেন। এই কৌতূহল চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে আমি এইরূপ একটি মানচিত্র রচনা করিয়াছিলাম, অবশ্য সে মানচিত্র সম্পূর্ণ নয়। কিন্তু দেখিলাম যে, কাশ্মীরের অন্তর্গত শ্রীনগর হইতে সিংহলের কাণ্ডি শহর, সহ্যাদ্রি গিরিমালার অন্তর্ভুক্ত পুণা, কারোয়ার বোম্বাই হইতে

প্রাগজ্যোতিষের অদূরবর্তী শিলং নগর; দেখিলাম যে, দেবতাত্মা হিমালয়ের ক্রোড়বর্তী আলমোড়া, দার্জিলিঙ এবং বঙ্গোপসাগরস্থ শ্রীক্ষেত্র; দাক্ষিণাত্যের মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর প্রভৃতি কোনো স্থানই বাদ যায় নাই, বলা বাহুল্য, কাশী, বুদ্ধগয়া, প্রয়াগ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র অবশ্যই আছে। আর বাঙলাদেশের সর্ব অঞ্চলের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ তো একান্তই বাহুল্য। ইহা তাঁহার সশরীরে ভারত-ভ্রমণের কর্মসূচী, কবির কর্মসূচী, তাই প্রত্যেক ক্ষেত্রে বাণীর পদচিহ্ন অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিতেছে। অক্ষরের পদ-পঙ্‌ক্তি রচনা করিয়া রবীন্দ্র-সরস্বতী ভারত-ভ্রমণ সম্পন্ন করিয়াছেন। এমনভাবে, এমন সম্পূর্ণভাবে পূর্ববর্তী আর কোনো মহাকবি ভারত-পরিক্রমা করেন নাই বলা যাইতে পারে; কারণ ব্যাস, বাল্মীকি ও কালিদাসের ভারত-পরিক্রমা তৎকালীন যাতায়াতের অসুবিধার জন্যই অর্বাচীনকালের মহাকবির তুলনায় আংশিকতা লক্ষণগ্রস্ত।

তারপরে ভারতের পরিপূর্ণ মহিমার বন্দনা, বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত ভারতের মহিমার বন্দনা আর কোন মহাকবির কণ্ঠে এমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধ্বনিত হইয়াছে। ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস ও তুলসীদাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ভারতের পঞ্চ মহাকবি। ইঁহাদের প্রত্যেকের কাব্যই এই অর্থে মহাভারত; রবীন্দ্র-সাহিত্য নবীন ভারতের নূতন মহাভারত। এমন যে সম্ভব হইয়াছে, তাহার কারণ 'কায়েন মনসা বাচা' ভারতোপলব্ধি করিয়া রবীন্দ্রনাথ নিজ দেহকে ভারত-দেহে এবং নিজ আত্মাকে ভারতাত্মায় পরিণত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই মূল সত্যটি বুঝিতে পারিলে রবীন্দ্র-সাহিত্য বুঝিবার পথ সুগম হইবে আশা করা যায়।

৮

কাবুলিওয়ালা

রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে বিহারের একটি প্রধান শহরে আসিয়াছি। আমার যিনি গৃহস্বামী, আমি যাঁহার গৃহে অতিথি, তিনি বহুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তার উপরে প্রখ্যাত সাহিত্যিক আর সর্বোপরি তিনি রসিক। তিনি একটি মধুচক্র-বিশেষ, একটুখানি খোঁচা দিলেই রস ঝরিতে থাকে। তাঁহার ব্যসন

তুটি বিষয়—কথা বলা আর ফুলের বাগান করা। আমাকে পাইবামাত্র তাঁহার মুখ ছুটিল, সঙ্গে সঙ্গে পা তু-খানাও ছুটিল, 'আসুন আমার ফুলের বাগান দেখবেন।' একটি গন্ধরাজ ও একটি কামিনী ফুলের গাছ ফুলে ফুলে ভরিয়া গিয়াছে, সন্ধ্যার অন্ধকারে আর কিছু দেখা যাইতেছে না বলিয়াই সাদা ফুলগুলি যেন আরো বেশি দীপ্যমান। 'দেখছেন কেমন অজস্র ফুল! না হয়ে পারে!—সারাদিন আমি নিজ হাতে জল দিয়ে থাকি যে!' তারপরে নানা বিষয়ের পথ ধরিয়া তাঁহার মুখ ছুটিল। হাঁ, কথা বলিতে পারেন বটে! রসাইয়া, জমাইয়া, মজাইয়া, গুছাইয়া কথা বলিতে পারেন বটে! আর কোন বিষয় না জানেন। দেশ বিদেশের সরস্বতী তাঁহার মস্তকের উদার গড়ের মাঠে আসিয়া হাওয়া খাইয়া যান। তাঁহার কথা ঐ গন্ধরাজ কামিনী ফুলের মতোই অজস্র!

এক সময়ে মানুষ কথা বলিতে জানিত। কিন্তু এখন সুলভ পুস্তক, সংবাদপত্র, বেতার প্রভৃতির প্রভাবে মানুষে কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছে; এখন সবাই হয় শ্রোতা নয় পাঠক, কথকের সংখ্যা খুব অল্প, সেই অল্পর দলে আমার গৃহস্বামী। কথাভোলা এ যুগের মানুষ সেই সংস্কৃত প্রবাদের বিপরীত জগতের অধিবাসী, বাচাল এখানে মূক। কিন্তু আমার সৌভাগ্যবশতঃ আমার গৃহস্বামী ও তাঁহার প্রিয় ফুল গাছ তুটি উভয়েই বাচাল—একজন কথায়, অপর তুজন ফুলে ফুলে।

গতকাল সন্ধ্যায় রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উৎসবের একটি অঙ্গস্বরূপ কাবুলিওয়ালা গল্পের নাট্যীকৃত রূপের অভিনয় দেখিয়া আসিলাম। গল্পটি তো কত বারই পড়িয়াছি, কিন্তু অভিনয় দেখিয়া তাহার পূর্ণ স্বাদ ও পূর্ণ পরিচয় যেন পাইলাম। ছোট গল্পে শুধু দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ পাওয়া যায়, কিন্তু নাটকে পাওয়া যায় সেই সঙ্গে বেধ বা গভীরতা, তাই নাটকের রস পূর্ণতর। কাবুলিওয়ালার ভূমিকায় যিনি অভিনয় করিলেন তিনি যে-কোনো পেশাদার রঙ্গমঞ্চের গৌরবের পাত্র হইতে পারেন। অভিনয় শেষে প্রেক্ষাগৃহে অল্প চক্ষুই শুষ্ক ছিল, অল্প মনই অনভিভূত ছিল। পথের কাবুলিওয়ালা অভিনয়ের গুণে বৈঠকখানা পার হইয়া একেবারে অন্তরের অন্তঃপুরে আসিয়া হাজির হইল। অতঃপর কাবুলিওয়ালার উপরে রাগ করা কঠিন হইবে, কাবুলিওয়ালা দেখিলেই তাহাকে রহমৎ বলিয়া মনে হইবে, মনে হইবে তাহার পর্বত গৃহে চার বছরের

একটি কন্যা আছে, মনে হইবে তাহার ঐ ঢিলা জামার মধ্যে তেলে মলিন ভূসা-মাখানো একখানি মলিন কাগজে ছোট্ট একখানি হাতের ছাপ আছে আর সেই জামার তলে যে বক্ষস্থল সেখানে স্নেহে কোমল অশ্রুতে গভীর একটি মানবহৃদয় বিরাজিত ; তাহার ঐ খুনে রূপটা নিতান্তই মুখোস।

অত্যন্ত গরম পড়িয়াছে। গতকাল তাপের মাত্রা ১১১° অতিক্রম করিয়াছে। আজ কত হইবে কে জানে, জানলা দরজা বন্ধ করিয়া পাখা চালাইয়া বসিয়া আছি বুঝিবার উপায় নাই। বৈশাখ মাস প্রচণ্ড গরমকাল, রবি উদয়ের যোগ্যকাল বটে। আবার বৈশাখ মাস অজস্র ফুলের মাস, কবি উদয়ের যোগ্য মাস বটে। বাহিরের মাঠ ব্যাপিয়া রৌদ্রে আগুন জ্বলিতেছে, গুল্‌মোরের গাছে গাছে তাহারই শিখা। "কিন্তু আমার ফুলগুলো কেমন স্নিগ্ধ, কেমন মৃদু, অথচ কত অজস্র।' সত্যই তাই বটে! ঐ কামিনী গন্ধরাজ আর গুল্‌মোর দুই-ই বৈশাখের বুক জুড়িয়া ফুটিয়াছে। কাল সারা রাত্রি জ্যোৎস্নার প্ররোচনায় গোটা দুই কোকিল ডাকাডাকি করিয়া মরিয়াছে, শেষরাতে আসিয়া একটার গলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, কোকিল প্রায় কাকে পরিণত, বাচাল মূকে পরিণত হইবার মতো। আগামীকাল রওনা হইব, সবচেয়ে বেশি মনে থাকিবে আমার গৃহস্বামীর কথকতা আর তাঁহার প্রিয় গন্ধরাজ ও কামিনী ফুলের অজস্রতা! 'সারাদিন স্বহস্তে জল দিই কিনা!'

৯

কবি-ঋণ

"রেভারেণ্ড পি ফাঁর্লো বাঙলায় লিখিত "ইউরোপ ও রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজনীন কবি বলিয়া আমরা গর্ব বোধ করিতেছি। কিন্তু তিনি নিজের সাম্প্রতিক ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া বলেন যে, তিনি সেখানে দেখিয়া আসিয়াছেন, অতি অল্পসংখ্যক প্রবীণ বয়সের কয়েকজন 'গীতাঞ্জলি' ছাড়া আর কাহারও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ নাই। তিনি ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া

বলেন যে, একদা পশ্চিম দেশে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলিই শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া সমাদৃত হইয়াছে। অথচ রবীন্দ্রনাথের কাব্যকৃতির আরও যে সুন্দরতর বিস্তৃত প্রকাশ অন্যান্য কাব্যে কবিতায় রহিয়াছে, তাহার পরিচয় আধুনিক ইউরোপ জানে না। রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ইউরোপে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য তিনি ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায় তাঁহার অন্যান্য কাব্যের অনুবাদের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।"

রবীন্দ্র-ভারতীর একটি অধিবেশনে উক্ত প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল।

প্রবন্ধের বিষয়টি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের কবি-পরিচয় যদি বহির্বিশ্ব বিস্মৃত হয়, তবে তাহা বিশ্ব ও ভারত কাহারো পক্ষেই কল্যাণজনক হইবে না। এমন অবস্থায় আমাদের কর্তব্য কী? একদল বলিবেন, রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব স্বপ্রতিষ্ঠিত, তাহা ইউরোপের কাছে প্রমাণের কী প্রয়োজন? তাহাদের প্রয়োজন থাকিলে বাঙলা শিখিয়া রবীন্দ্র-সাহিত্য তাহারা অধ্যয়ন করুক। এই উক্তির মধ্যে যুক্তি ও ভক্তি দুই-ই আছে, তবে বোধ করি, ভক্তির অংশই বেশী।

বিদেশী ভাষায় অনুবাদের যে প্রয়োজন আছে, তাহার প্রমাণ স্বয়ং কবি-কৃত অনুবাদ, প্রয়োজন অনুভব না করিলে তিনি স্ব-কাব্যের অনুবাদ করিবার শ্রম স্বীকার করিতেন না। আরও কারণ আছে। ইউরোপের প্রধান ভাষাগুলির ব্যাপকতা বাঙলা ভাষা কখনো লাভ করিবে না, কাজেই অনুবাদের সাহায্যে তাহাকে ভাবের হাটে লেনাদেনা চালাইতে হইবে। ইউরোপের প্রধান প্রধান ভাষায় কোনো উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইবামাত্র অন্যান্য ভাষায় তাহার অনুবাদ প্রকাশিত হইয়া থাকে। বিদেশী ব্যক্তি জার্মান শিখিয়া গ্যেটের কাব্যের রসাস্বাদন করিবে বলিয়া জার্মাণ গুণিজন বসিয়া থাকেন নাই, বিভিন্ন ভাষায় গ্যেটের কাব্যের অনুবাদ করিয়াছেন। গ্যেটের সহিত অধিকাংশ বিদেশীর পরিচয় অনুবাদের সাহায্যে। বিশেষজ্ঞ জার্মান শিখিয়া গ্যেটে অধ্যয়ন করিয়াছে। এখন তেমন বিশেষজ্ঞ কেহ থাকিলে সে বাঙলা শিখিবে ও মূল রবীন্দ্র-কাব্যের স্বাদ পাইবে, ইতরজনের জন্য মিষ্টান্ন মানে অনুবাদই একমাত্র ভরসা। কাজেই আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্র-কাব্যের অনুবাদের বিশেষ প্রয়োজন আছে, সে প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথের নিজের নয়, সে প্রয়োজন প্রথমতঃ ভারতবাসীর, দ্বিতীয়তঃ বিশ্ববাসীর। রবীন্দ্র-কাব্য

বিশ্বের গুণিজনের দরবারে আমাদের প্রধান পাসপোর্ট, আর সকলেই জানেন যে, পাসপোর্ট পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভাষায় আপনার পরিচয় বহন করে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কবি-কৃত অনুবাদ কি যথেষ্ট নয়? প্রথমতঃ, কবি সমস্ত কাব্যের ও রচনার অনুবাদ করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, কবি-কৃত অনুবাদে রবীন্দ্র-সাহিত্যের মৌলিক বৈচিত্র্যকে রক্ষা করিবার চেষ্টা হয় নাই। তৃতীয়তঃ, নূতন যুগের Idiom-এ নূতন করিয়া রচনার অনুবাদ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। এই কারণেই ইউরোপীয় ক্লাসিকসের একাধিক অনুবাদ থাকা সত্ত্বেও নিত্য নূতন অনুবাদ বাহির হইতেছে। হোমারের ওডীসি কাব্যের বহুতর অনুবাদ ইংরেজী ভাষায় আছে। কিন্তু সম্প্রতি 'পেঙ্গুইন' গ্রন্থমালায় তাহার যে অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, জনপ্রিয়তায় তাহা অনেক 'থ্রিলার' গ্রন্থকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ আর কিছুই নয়—অনুবাদক নূতন যুগের Idiom-এর সাহায্য লইয়াছেন। সাহিত্যের শাশ্বত গ্রন্থরাজিকে এইভাবে বেশ বদল করিয়া আপন স্থান রক্ষা করিতে হয়, সাপ যেমন খোলস ছাড়িয়া নূতন জীবন লাভ করে, অনেকটা তেমনি। রবীন্দ্র-সাহিত্যও শাশ্বত, যুগান্তের সঙ্গে তাহারও বেশ পরিবর্তন আবশ্যক, নূতন অনুবাদ আবশ্যক, আর একমাত্র সেইভাবেই বিশ্বের গুণিসমাজে তাহার স্বস্থান রক্ষা করা সম্ভব হইবে।

এখন একথা সত্য হইলে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের কর্তব্য কী? আমরা বলিতে এখানে রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারী, বিশ্বভারতী, ভারত সরকার ও দেশবাসী শিক্ষিত সমাজ। আর কর্তব্য বলিতে বুঝিতেছি, ইহাদের সকলের যোগাযোগে রবীন্দ্র-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অংশের নূতন অনুবাদ প্রকাশের এবং সে সমস্ত পৃথিবীর গুণিসমাজে যাহাতে পৌছায়, তাহার ব্যবস্থা করা। অবশ্য ব্যাপারটাকে আমি কেবল রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে চাই না, ভারতীয় সাহিত্যের যাবতীয় শ্রেষ্ঠ সম্পদ সম্বন্ধেই এই উক্তি প্রযোজ্য। ভারত সরকার একটা ভারতীয় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের গ্রন্থমালা প্রকাশ করিতে পারেন। অর্থের অপব্যয় হইবে মনে করিবার কারণ নাই, যেহেতু তাঁহারা বিদেশে প্রচারের জন্য যে অর্থব্যয় করেন, তাহার সামান্য অংশে এ কাজ সম্পন্ন হইতে পারে; —আর তাঁহাদের প্রচার-পুস্তিকাগুলি যখন বিবিধ গৃহকার্যে নিযুক্ত হইয়া সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিবে, তখনো এই গ্রন্থমালা

বিরাজ করিতে থাকিবে, আর মানুষের মনের উপরে যে কাজ করিবে, তাহাও অধিকতর স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা। এই জাতীয় কাজের মর্ম বিদেশী অনেক রাষ্ট্র বোঝে, কিন্তু এদেশে অনেক গুরুতর কথাও অরণ্যে রোদন করিতেছি ধরিয়া লইয়া বলিতে হয়। তবু না বলিয়া উপায় নাই, কারণ বলিলেও যেখানে না হইবার সম্ভাবনা, না বলিলে সেখানে কী আশা। এখন রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে ভক্তির জোয়ার চলিতেছে, তাই প্রাসঙ্গিক মনে করিয়া কথাটা বলিলাম, কিন্তু আশঙ্কা হইতেছে যে, ঢাক ঢোল সানাই নহবতের সম্মিলিত সোরগোলের তলায় কথাটা শান্তিপূর্ণ সমাধি লাভ করিবে।

১০

রবীন্দ্র জন্মোৎসব প্রসঙ্গ

রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান বোধ করি এ বছরের মতো শেষ হইল। মাসাধিককাল ধরিয়া বাঙলা দেশে ও বাঙলা দেশের বাহিরে কত সংখ্যক সভা হয়, জানিতে পারিলে কৌতূহল নিবৃত্ত হইত। আশা করি, কোনো এক সুযোগে খতিয়ান-নবীশেরা একটা হিসাব দাখল করিবেন। এই উৎসবের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ মনে করেন্ যে, বাহ্যাড়ম্বর কিছু বেশি হইতেছে আর তাহার ফলে উৎসবের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য ও মাধুর্য নষ্ট হইতে বসিয়াছে। কিন্তু খেদ করিয়া লাভ নাই। বহু লোক যখন উৎসবে প্রবৃত্ত হয়, তখন এমন ঘটা অনিবার্য। যাহার রুচি সাত্ত্বিকভাবে আয়োজন করুক, যাহার রুচি রাজসিকভাবে করুক, নিতান্ত তামসিক ভাব না আসিয়া পড়িলেই যথেষ্ট।

রবীন্দ্র জয়ন্তী ও রবীন্দ্রচর্চা সম্বন্ধে দু-একটি কথা এই উপলক্ষে বলিয়া লইতে ইচ্ছা করি। এবারকার জয়ন্তী উৎসবের কোনো কোনো সভায় অবাঙালী ও বিদেশী পণ্ডিতগণকে বক্তৃতা করিতে আহ্বান করা হইয়াছিল। গত দু-এক বছর হইতে এরূপ হইতেছে। এটি ভালো। অন্য প্রদেশের ও অন্য দেশের লোকে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কী ভাবিতেছে আমরা জানিতে চাই।

এবারে রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে কটকে গিয়াছিলাম। উদ্যোক্তা

কটকের ওড়িয়া সমাজ। ওড়িয়া সমাজ যদি বাঙালীকে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যায়, তবে বাঙলা দেশেই বা ওড়িয়া সাহিত্যিক আমন্ত্রিত না হইবেন কেন? আমার তো মনে হয়, কলিকাতায় যে-সব সম্মেলন হয়, তাহার উদ্যোক্তাগণ যদি বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সাহিত্যিকদের এই উপলক্ষে আমন্ত্রণ করেন, তবে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁহাদের চিন্তাধারা যে কেবল জানিতে পাওয়া যায় তাহা নয়, বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যিকগণের মধ্যেও মেলামেশার একটা সুযোগ উপস্থিত হয়। রবীন্দ্র জন্মোৎসবে সেটা একটা অতিরিক্ত লাভ। প্রস্তাবটি ভাবিয়া দেখিবার মতো—আশা করি, কথাটা কাহারো কাহারো মনে থাকিবে।

আরো একটি কথা। মাঝে মাঝে কানাঘুষায় শুনিতে পাই যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের নামে একটি অধ্যাপক-পদ প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু প্রস্তাবটা এমন কুণ্ঠার সঙ্গে ও মৃদুস্বরে হয় যে—বিশ্বাস স্থাপন করিতে ভরসা হয় না। আর রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ১৬ বছর পরেও যাহা হইল না, তাহা যে অতঃপর হইবে তাহারই বা স্থিরতা কী? অর্থাভাব প্রকাণ্ড অজুহাত। সম্প্রতি শতবার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে এক কোটি টাকা আসিয়াছে বলিয়া শুনিতে পাই। ২-৩টি অধ্যাপক-পদ প্রতিষ্ঠিত হইবে এমনও শোনা যায়। কিন্তু রবীন্দ্র-অধ্যাপক পদের কথা শোনা যায় নাই। রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথের নামে তিনটি অধ্যাপক-পদ অবিলম্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। এরূপ করিলে বিদ্বৎসমাজের চোখে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বাড়িবে।

আরো একটি কথা। রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকীর আয়োজন ইতিমধ্যেই শুরু হইয়া গিয়াছে। শতবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্র রচনাবলীর একটি সর্বজনলভ্য সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া অত্যাবশ্যক। শোভন সংস্করণ যেমন আছে থাকুক, নির্দিষ্ট সংখ্যক সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত হইতে বাধা কী? তাহাতে আর কিছু উপকার না হোক, জয়ন্তীর সভাপতিগণ বক্তৃতার কিছু খোরাক পাইবেন। এখনকার মতো নিজ নিজ মতামত ঋষিবাক্য বলিয়া চালাইতে হইবে না। ঐ সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী গ্রন্থাবলীর সুলভ সংস্করণ প্রকাশের কথাও ভাবিয়া দেখা দরকার। রবীন্দ্র-জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠানের সংখ্যাবাহুল্য যদি দেশবাসীর শ্রদ্ধার সূচী হয়, তবে আশা করা অন্যায় নয় যে, প্রস্তাবগুলি ধীরভাবে বিবেচিত হইবে।

১১

রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী

ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশত-বার্ষিক যথোচিত সমারোহ ও মর্যাদার সঙ্গে পালন করিবেন। ভারতীয় সাহিত্য আকাদামী এই ভার লইয়া পরিকল্পনায় উদ্যত হইয়াছেন। আর বিভিন্ন রাজ্যেও শিক্ষিত ব্যক্তির কাছে পরামর্শ চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। পরিকল্পনার দুটি অঙ্গ—একটি স্থায়ী, অপরটি সাময়িক।

সাময়িক বলিতে সভা সমিতি, কবিগুরুর নাটকাদির অভিনয় প্রভৃতি বুঝায়। ভারতের বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন ভাষায় এগুলি অনুষ্ঠিত হইবে। আর স্থায়ী বলিতে রবীন্দ্র রচনাবলীর শতবার্ষিক সংস্করণ প্রকাশ, ভারতীয় প্রধান ভাষায় কবির গ্রন্থ প্রকাশ এবং ভারতীয় কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির নামে বাঙলা সাহিত্যের অধ্যাপক পদ প্রতিষ্ঠা। এ ছাড়া আছে উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা কবির একখানি জীবনী রচনার পরিকল্পনা। বলা বাহুল্য ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্ত উৎসাহের সঙ্গে সমর্থনযোগ্য। ভারতের নবযুগের শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান দ্বারা ভারতীয় আকাদমী নিজেকে সম্মানিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেন। এবারে পরিকল্পনাটি খুঁটাইয়া আলোচনা করা যাইতে পারে।

প্রথমে স্থায়ী অংশের কথা ধরা যাক।

(১) রবীন্দ্রনাথের প্রধান গ্রন্থগুলির (সাকুল্য রচনাবলীর না হইলেও ক্ষতি নাই) সুলভ শতবার্ষিক সংস্করণ প্রকাশ অত্যাবশ্যক।

(২) ভারতীয় প্রধান ভাষাসমূহে কবির প্রধান গ্রন্থসমূহের নির্ভরযোগ্য অনুবাদ প্রকাশিত হওয়া উচিত। এ কাজ এখনই আরম্ভ করিয়া দিতে হইবে যাহাতে ১৯৬১ সালে সমাপ্ত হইতে পারে।

(৩) কবির প্রধান গ্রন্থসমূহের নির্ভরযোগ্য অনুবাদ প্রকাশ—বিদেশী প্রধান ভাষাসমূহে। এ কাজ ভারত সরকারের নিজের তত্ত্বাবধানে করিতে হইবে, বিদেশীয়দের মর্জির উপরে ছাড়িয়া দেওয়া কিছুতেই চলিবে না।

(৪) কবিকৃত ইংরাজি অনুবাদ যাহাতে যথোচিত সংখ্যায় মুদ্রিত হয় তজ্জন্য ইংরাজী প্রকাশককে উৎসাহ দান।

(৫) রবীন্দ্রনাথের নামে একটি সর্বভারতীয় সাহিত্য পুরস্কার দানের ব্যবস্থা।

(৬) সেই সঙ্গে উচিত কবির নামে একটি আন্তর্জাতিক সাহিত্য পুরস্কার দানের পরিকল্পনা গ্রহণ।

(৭) কবির নামে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা ভাষার অধ্যাপক-পদ সৃষ্টির ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে আকাদামী। প্রথম ও প্রধান অধ্যাপক-পদ প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে—কারণ কলিকাতা বাঙালী সংস্কৃতির কেন্দ্র। কিন্তু তজ্জন্য ১৯৬১ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে কেন? ১৯৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইবে। সেই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র অধ্যাপক-পদ প্রতিষ্ঠিত হইলে শোভন হয় নাকি? ১৯৫৭ সালে অধ্যাপক নিযুক্ত হইলে তিনি ৪-৫ বছর সময় পাইবেন যাহাতে আকাদমীর সংযোগিতায় কবিজন্ম শতবার্ষিকীর জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন। এই পদটিকে কেন্দ্র করিয়া বাঙলাদেশে পরিকল্পনা ঘনীভূত হইয়া উঠিতে পারিবে।

(৮) আর কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এইরূপ অধ্যাপক-পদ সৃষ্টি হইবে? সব বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্ভব নয়, কাজেই ভারতের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সমস্ত অঞ্চলে যাহাতে ২-১টি অধ্যাপক-পদ সৃষ্টি হইতে পারে তাহা দেখা উচিত। এই অধ্যাপক-পদগুলি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের Professor of Poetry-র ছাঁচে গঠিত হওয়া আবশ্যক। অধ্যাপককে ছাত্র পড়াইবার কাজে নিযুক্ত করা চলিবে না—আর কোনোক্রমেই পাঁচ বৎসরের বেশি তাঁহাকে উক্ত পদে রাখা চলিবে না। আমাদের দেশে সমস্ত পদেরই বংশগত হইবার একটা কেমন যেন প্রবণতা আছে। আমার মনে হয় রবীন্দ্র অধ্যাপক-পদ প্রতিষ্ঠা পরিকল্পনার প্রধান অঙ্গ হওয়া উচিত। কারণ এখন পর্যন্ত বাঙলাদেশে (অন্যদেশের কথা ছাড়িয়াই দিলাম) রবীন্দ্রচর্চার সূত্রপাত হয় নাই বলিলে কম বলা হয়—অবজ্ঞা, অজ্ঞতা ও যথেচ্ছাচার মিলিয়া রবীন্দ্র-সাহিত্যবোধের ক্ষেত্রে কুয়াশা সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা অপনোদন করিবার সূত্রপাত রবীন্দ্র অধ্যাপক-পদের দ্বারা হইতে পারে।

পরিকল্পনার সাময়িক অঙ্গ সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব আছে। জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ভারতে একটি সাহিত্যিক সম্মেলন করিলে বড় শোভন হয়, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে সাহিত্য সম্মেলন নয়, সাহিত্যিক সম্মেলন। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ভারতের ও বিদেশের সাহিত্যিকগণকে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত ও পরিচিত হইবার সুযোগ দান। এটির উপরে আমি বিশেষ গুরুত্ব দান করিতেছি।

১২

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

রবীন্দ্র জন্মোৎসব এখন কার্যতঃ আমাদের জাতীয় উৎসবে পরিণত হইয়াছে। বাঙলা দেশে, প্রবাসী বাঙালী সমাজে, এমন কি ভারতের সর্বত্র মহাসমারোহে এই উপলক্ষে আনন্দোৎসব হইয়া থাকে। ইহা বিশেষ আশা ভরসার কথা। যিনি মানুষের মুখে ভাষা দেন, অব্যক্ত ভাবরাজিকে মূর্তি দেন তাঁহার কাছে মানুষের কৃতজ্ঞতার অন্ত থাকে না। কিন্তু জাতীয় চিন্তাধারার পটে এই উৎসবটিকে দেখিলে স্বভাবতই একটি প্রশ্ন মনে জাগে, অন্ততঃ আমার মনে তো জাগিয়াছে। আজ সে বিষয়ে আলোচনা করিব।

একদিকে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা, রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ, অপর দিকে সাহিত্য ও শিল্পের উপরে ক্রমবর্ধিত নিয়ন্ত্রণ ও রাষ্ট্রপ্রভাব—এ দুয়ের মধ্যে সঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নয়। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে নৃত্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, নাট্য ও ললিতকলার আকাদামি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাদের মুখ্য ও সচেতন উদ্দেশ্য যাহাই হোক, শেষ পরিণাম ও দূরবিসর্পী প্রভাব শুভ নহে বলিয়াই অনেকের ধারণা। প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতিই এই যে তাহা ক্রমে রক্ষণশীল হইয়া পড়ে। আর এই রক্ষণশীলতা যদি সাহিত্য ও শিল্পের উপরে প্রভাব বিস্তার করে, প্রভাব বিস্তার করিবে বলিয়াই উহাদের সৃষ্টি, তবে তাহা কখনো স্পৃহনীয় হইতে পারে না। সাহিত্য ও শিল্প মানব অভিজ্ঞতার নূতন নূতন ক্ষেত্রকে ক্রমশঃ অধিকার করিবে, ইহাতেই তাহাদের সার্থকতা; আর আকাদামি নূতন নূতন বাঁধ

তুলিয়া আপনার ক্ষমতা ও প্রভাব বজায় রাখিবে ইহাই তাহার ধর্ম। এখন এ দুয়ের দ্বন্দ্বে সাহিত্য ও শিল্পেরই অবশ্যম্ভাবী পরাজয়, কেননা আকাদামি রাষ্ট্রচালিত বলিয়া প্রবল। তাহার হাতে টাকা ও যশ। যে-সব সাহিত্যিক আকাদামির বশ্যতা স্বীকার করিবেন তাঁহারাই কীর্তিত হইবেন, ইহাই স্বাভাবিক। আদর্শের খাতিরে কোনো সাহিত্যিক দূরে থাকিলে তিনি উপেক্ষিত হইবেন—ইহাও স্বাভাবিক। আর যেহেতু অধিকাংশ সাহিত্যিক মানুষ, স্বভাবতই তাঁহারা আকাদামির বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইবেন। এখন সাহিত্যের গগনবিহারী গড়ুরকে আকাদামির স্বর্ণপিঞ্জরে ভরিলে আকাদামির পক্ষে গৌরবের হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের পক্ষে শেষ পর্যন্ত কী ফলপ্রদ হইবে সহজেই অনুমেয়। গড়ুর তোতাপাখী হইবে। আকাদামি ও নানাবিধ পুরস্কারের প্রভাবে সাহিত্যিক সমাজ ইতিমধ্যেই পুরস্কারসচেতন হইয়া উঠিয়াছেন—অপরং কি ভবিষ্যতি, তবু তো এখনো কলির সন্ধ্যা। দান ভালো কিন্তু পুরস্কার দান ভালো নয়। দুঃস্থ বা অভাবগ্রস্ত সাহিত্যিকের প্রতি রাষ্ট্র ও সমাজের বিশেষ দায়িত্ব আছে, তাঁহাদের অভাবমোচন হোক। কিন্তু সাহিত্যিক কীর্তির জন্য পুরস্কার দান নৈব নৈবচ। পুরস্কারের দ্বারা বিশেষ সাহিত্যিক রীতি বা আদর্শকে চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হয়, সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের পক্ষে সে দায়িত্ব গ্রহণ না করাই ভালো। সাহিত্য ও শিল্পের পক্ষে রাষ্ট্রপ্রভাব অত্যন্ত হানিকর, কারণ শেষ পরিণামে সাহিত্য ও শিল্প রাষ্ট্রের তাম্বূল-করঙ্কবাহী হইয়া পড়িতে বাধ্য। এমন অনেক দেশে হইয়াছে, সেখানে সাহিত্যে ও প্রচারপুস্তকে ভেদ নাই, সেখানে সাহিত্যিকে ও সরকারী কর্মচারীতে ভেদ নাই; সেখানে আজকার সরকারী মহীরূহ পর দিনে যেমন এরণ্ডে পরিণত হয়, সাহিত্যিকেরও তেমনি ভাগ্য বিপর্যয় নিত্য ঘটে। আমাদের দেশও কি সেই পথটার প্রারম্ভেই পদার্পণ করিতে চলিল?

কালে কালে সাহিত্যকে বাঁধিবার আয়োজন বড় কম হয় নাই। অলঙ্কার-শাস্ত্র একটা প্রধান বন্ধন। কুমারসম্ভব কাব্যের পক্ষে যাহা ভূষণ ভট্টিকাব্যের পক্ষে তাহাই বন্ধন। পৌরাণিক বিশ্বাসও আর একটা বন্ধন। উদাহরণ বাঙলার মঙ্গলকাব্যসমূহ। সৌভাগ্যবশতঃ মধুসূদনের প্রভাবে এ দুই প্রকার বন্ধন হইতে বাঙলা সাহিত্য মুক্ত হইয়াছিল। বঙ্কিমের প্রভাবে বাঙলা সাহিত্য উদারতর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথে আসিয়া

শিল্পীচিত্তের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ঘটিয়া সে নির্ঝর মুক্তধারায় পরিণত হইয়াছে, তাহার কলধ্বনিতে বিশ্বচিত্তের মুক্তির কলরোল শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এখন আবার অপ্রত্যাশিতভাবে সেই মুক্তধারাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্যোগ চলিতেছে। নিয়ন্ত্রণ যে ক্ষতিকর ব্যবস্থা চাল, আটা, বস্ত্র প্রভৃতি বস্তুতে তাহা সবাই দেখিয়াছে। সাহিত্য ও শিল্পে নিয়ন্ত্রণ শতগুণ ক্ষতিকর। এ নিয়ন্ত্রণ আবার আসিতেছে পুরস্কারের নামে, গুণ বিচারের নামে, সাহিত্যিকদের প্রতি ন্যায় বিচারের নামে—আর আসিতেছে সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের হাতে। রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত মুক্তধারা কি অবশেষে খালের জলে পরিণত হইয়া শিল্পী এঞ্জিনিয়ারদের নির্দেশে নিয়মিত শক্তির আলো জ্বালাইবে, গম ভাঙিয়া আটা তৈয়ারি করিবে আর শাসনসংযত কণ্ঠে রাষ্ট্র-দেবতার জয়ধ্বনি করিতে থাকিবে? ইহাই কি মুক্তধারার পরিণাম?

শিল্পের মুক্তি চাই, শিল্পীর মুক্তি চাই, অবাধ, অকুণ্ঠ, উদার মুক্তি। লাভের আশায়, লোভের মোহে, পুরস্কার পণে, তাহার স্বাধীনতা ব্যাহত হইলে শিল্প আর শিল্প থাকিবে না, প্রচার কার্যে পরিণত হইবে; শিল্পী আর শিল্পী থাকিবে না, রাষ্ট্র ব্যবস্থার নগণ্য যন্ত্রে পরিণত হইবে; মানুষের চিত্তক্ষেত্র Collective Farm-এ পরিণত হইয়া রাষ্ট্রের খেয়াল ও প্রয়োজন অনুসারে কখনো বা গম, কখনো বা ভুট্টা কখনো বা Season Flower সৃষ্টি করিতে থাকিবে। মুক্তধারার এমন সম্ভাবনা নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গকালে বঙ্গ সরস্বতীর কল্পনাতেও ছিল না। আজ মুক্তধারার ঋষির শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে কী প্রার্থনা করিব যদি না শিল্পের মুক্তির প্রার্থনা করি? এই মুক্তি 'যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ সুখ আছে সেই মরণে।' বৈষয়িকক্ষেত্রে যত খুশি নিয়ন্ত্রণ চলুক, কিন্তু আত্মার ক্ষেত্রে, সাহিত্য শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে একপ্রকার Laissez Faire নীতি একান্ত আবশ্যক।

১৩
মুক্তধারা

সেদিন পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মুক্তধারা নাটকের অভিনয় দেখিলাম। আমার অনেক দিন হইতে ধারণা ছিল যে, রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলির মধ্যে অভিনয়-যোগ্যতার বিচারে মুক্তধারার স্থান সকলের উপরে। অভিনয় ও রূপ পরিকল্পনা যে সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল এমন বলি না, কিন্তু আমার ধারণার সমর্থন পাইলাম। যোগ্যতর পরিকল্পনায় মঞ্চস্থ হইলে না জানি আরও কত চিত্তাকর্ষক হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্বন্ধে অনেকের অভিযোগ এই যে, রঙ্গ-মঞ্চোপযোগিতা ইহার যথেষ্ট নাই। মুক্তধারার অভিনয় দেখিলে এ ধারণা দূর হইবে। কত অল্প উপকরণে কত গভীর রস আদায় করিয়া লওয়া হইয়াছে। পটান্তর নাই, স্থানান্তর নাই, সমস্তই একটি সন্ধ্যা ও রাজপথের একাংশের ব্যাপার, অদূর আকাশে যন্ত্রের ও মন্দিরের চূড়া এই দুটি মাত্র প্রত্যক্ষ সহায়। একদল দর্শক আছে যাহারা Action বাতিকগ্রস্ত, কিন্তু মুক্তধারায় Action বলিয়া সত্যই কিছু আছে কি! কেবল কথা আর গান। কিন্তু ঘটনার কী গতি! প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত, অনিবার্য পরিণামের দিকে কী রুদ্ধনিশ্বাস, কী অবিচ্ছেদ প্রচণ্ড বেগ। মুক্তধারায় অবান্তর বিষয় নাই বলিলেই হয়, তুলনায় তপতী ও রক্তকরবী অতিকারমন্থর। তপতী ও রক্তকরবী মূল্যবান মাল বোঝাই মন্থরগামী পালোয়ারি নৌকা, মুক্তধারা সর্বপ্রকার বাহুল্যবর্জিত দ্রুতগামী ছিপ। ইহাতে কত সংক্ষেপ, কত সার্থক ইঙ্গিতে কত গভীর ও জটিল বিষয় না ব্যক্ত হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্যের সাহিত্যিক বড়বাজারে যাঁহারা মূল্য বিচারের পাইকারী ব্যবসা করেন স্বদেশের স্বভাষার এ কৃতিত্ব নিশ্চয় তাঁহাদের চোখে পড়িবে না, আর পড়িলেও তাহা স্বীকার করা চলে না, কারণ অনেক কুখ্যাতি শিকারীর কাছে বড়কে অস্বীকার করাই বড় বলিয়া স্বীকৃতি পাইবার একমাত্র উপায়। ইহাকেই বলে 'ঘরকা মুরগী ডাল বরাবর'। যাক, বিপরীত বুদ্ধি,

স্বল্পবুদ্ধি, ভ্রমান্ধ ও বাহবা-শিকারীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া লাভ নাই, নিজের আচরণ ও বাক্যই তাহার উপযুক্ত দণ্ড।

Regimentation of life, বাংলায় এই ভাবটিকে প্রকাশ করিতে বলা চলে জীবনকে খাকি পোষাক পরানো। Regimentation আর কিছুই নয় মানুষের বুদ্ধি, চিত্ত, হৃদয় ও কল্পনাকে জঙ্গী য়ুনিফর্ম পরাইবার চেষ্টা। স্বাধীন বুদ্ধি, নির্ভীক চিত্ত, সরস হৃদয় ও স্বাধীন কল্পনার মতো বালাই অল্প আছে—মনুষ্যত্বের শত্রুর নিকটে। মুক্তধারার গুরুমশায়ের সাক্ষাৎ অল্পবিস্তর আজ সব দেশেই পাওয়া যায়, কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তাহারা এখনো নৈমিত্তিক, এখনো নিত্য হইয়া ওঠে নাই। শিবতরাই মূঢ় ভক্তির খাকি পোষাক পরিয়াছে, আর উত্তরকূট পরিয়াছে যন্ত্রমোহের খাকি পোষাক। সব দেশেই সব রাষ্ট্রেই আজ মুক্তধারাকে বাঁধিবার চেষ্টা, কোন দেশ এক নামে, কোন দেশ অন্য নামে, আর সব চেয়ে রহস্য এই যে, কোন কোন দেশে বাঁধভাঙার ছদ্ম নামের অন্তরালে বাঁধ বাঁধিবার চেষ্টা। বহু প্রাচীন শব্দ আজ প্রচলিত অর্থ হারাইয়া নিতান্ত বাউণ্ডুলে বেশ ধারণ করিয়াছে। Regimentation-এর শনির দৃষ্টি আর একটু কৃপা করিলেই বিশ্বাস হইবে যে, মুক্তধারা মানেই বদ্ধধারা। যেমন কোন কোন মহলে ইতোমধ্যেই ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে, রক্ত করবী মানেই রক্তপতাকা। যে Regimentation-এর বিরুদ্ধে কবির অভিযান বুদ্ধির অভিনব যুযুৎসুর প্যাঁচে তাহাকেই অনেকে Regimentation-এর স্বপক্ষযুক্তিরূপে প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে, মহাকবি হইবার ঝামেলা অনেক, নিজেকেই নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে হয়। যাই হোক, এ সব অপপ্রয়াস সত্ত্বেও মুক্তধারা চিরদিন বদ্ধ থাকিবে না, নেহরু বাঁধ ভাঙিবার চেষ্টা করিতেছেন ; ভৈরব চিরদিন নিদ্রিত থাকিবেন না, তাঁহার বোধনের দূরাগত শঙ্খধ্বনি মাঝে মাঝে শুনিতে পাই ; ভৈরব জাগিয়া দেখিবেন দেবত্বলোভীর দল তাঁহার পায়ে শিকল পরাইয়াছে, তখন তাঁহার প্রলয়ের শিঙা বাজিয়া উঠিবে, অমনি মুক্তবন্ধ মানবচিত্তধারা সঙ্গে বাজাইবে ডমরু, উৎসব শেষের সেই শেষ প্রহরের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকা ছাড়া আজ আর উপায় নাই।

১৪

শান্তিনিকেতনে

কলিকাতা হইতে শান্তিনিকেতনে গিয়া উপস্থিত হইলে পরিবর্তনটি সহজে বুঝিতে পারা যায়। সেদিন অনেক রাত অবধি খোলা জানালার ধারে বসিয়া ছিলাম, আশে পাশে গাছপালার উপরে বৃষ্টির শব্দ কানে আসিতেছে, দূরে একবার শিবা ধ্বনি উঠিল; নিস্তব্ধতার ঐ দুটি দ্বীপ উপদ্বীপ স্মরণ করাইয়া দেয় সে মহাসমুদ্রের দুস্তরতা। হঠাৎ কর্কশ শিস দিয়া রেলগাড়ী চলিয়া যায়—চমকিয়া উঠিতে হয়। আবার দিনের বেলায় কাঁঠাল গাছটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ঘুঘুর দীর্ঘায়ত করুণ বিলাপ, সেটাও যেন নিস্তব্ধতার প্রকারভেদ, নিস্তব্ধতার স্বপ্নে কথা বলা। কলিকাতার সঙ্গে শান্তিনিকেতনের অনেক প্রভেদের মধ্যে এইটি বোধ করি সর্বপ্রধান; কলিকাতায় কান কখনো ছুটি পায় না; আর শান্তিনিকেতনে সর্বদা কানের সুদীর্ঘ পূজাবকাশ।

শান্তিনিকেতনের এখন নিয়ত প্রবর্ধমান বৃহৎ জনপদ, প্রতিনিয়ত তাহার কলেবর বাড়িতেছে। হয়তো কালক্রমে এক সময়ে তথাকার অতলস্পর্শী নীরবতার অবসান ঘটিবে, দিবারাত্রির সমান কর্মব্যস্ততা সেখানকার একদা নির্জন প্রান্তরকে সহরের মুখরতা দান করিবে। তবে আশা করিয়া থাকিব এমন না ঘটুক! শান্তিনিকেতনের আদি কুঠি-বাড়ী প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে নির্মিত হইয়াছিল, তখন গোটা কয়েক বৃক্ষ ছাড়া এই ভূখণ্ডে আর অন্য বনস্পতি ছিল না। আর মানুষ! কুঠি-বাড়ীর পাঁচ সাতজন রক্ষক ও মালী ছাড়া আর কাহারো থাকিবার কথা নয়। তখন নিস্তব্ধতা না জানি কি অপরিমাপ্য ছিল। নিস্তব্ধতা ও মুখরতার কমি বেশিতে সমাজের ভালোমন্দ নির্ণয় করা চলে। বর্তমান যন্ত্রভিত্তিক সমাজ অত্যন্ত মুখর; কৃষিভিত্তিক সমাজ অপেক্ষাকৃত নিস্তব্ধ। এখন আমরা দ্রুত একটা ছাড়িয়া অপরটিকে গ্রহণ করিতেছি। শান্তিনিকেতনও করিতেছে। শুনিলাম, সেখানে উচ্চ বিজ্ঞান পঠন পাঠনের ব্যবস্থা হইতেছে, শীঘ্রই পাঁচতলা অট্টালিকা উঠিবে

ইত্যাদি। বিজ্ঞান যখন আসিল তখন সঙ্গে তাহার Camp follower টেকনিক্যাল বিভাগও আসিবে। কালের ধর্মের ইহাই বোধ করি নিয়ম।

সহজেই বুঝিতে পারিলাম যে, শান্তিনিকেতন এখন একটি পথের মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা দেশের আর দশটা প্রতিষ্ঠানের মতো হইবে, না বিশিষ্ট কিছু হইবে! আর দশটা প্রতিষ্ঠান খুব ভালো হইতে পারে, তবু ছাঁচে-ঢালা ছাড়া কিছু নয়। ছাঁচে-ঢালা প্রতিষ্ঠানের পাশে হাতে-গড়া একটা থাকুক না কেন। অন্ততঃ হাতে-গড়াকে ভাঙিয়া চুরিয়া ছাঁচে ঢালাই করিয়া গড়িলে এমন কি সার্থকতা হইবে? "Made in machine, Not touched by hand" নীতি এক্ষেত্রে গ্রাহ্য হওয়া উচিত নয়।

শান্তিনিকেতনের আবহাওয়া হইতে বুঝিলাম যে, এখানে দুটি ভিন্ন প্রকৃতির মানসিক স্তর দেখা দিতেছে। একদল প্রতিষ্ঠানটিকে ভাঙিয়া চুরিয়া ছাঁচে ঢালাই করিতে চান; অপর দল হাতে-গড়া রূপটিই পছন্দ করেন। কোন্ দলের মত সাব্যস্ত হইবে জানি না, কিন্তু একথা নিশ্চয় কালধর্ম ছাঁচে ঢালাইএর পক্ষে। হাতে-গড়ার দল কিঞ্চিৎ নিস্তেজ এবং অনেক ক্ষেত্রেই অবজ্ঞাত! প্রাচীনপন্থী কিনা! রেলগাড়ীর শিঙা ও মহাদেবের শিঙার উপমা মনে পড়িবার কারণ রেলগাড়ীর শিঙা কানে আঙুল দেওয়ানো চীৎকার উৎস্রাব করে, মহাদেবের শিঙা বিকিরণ করে পুঞ্জ পুঞ্জ নিস্তব্ধতা। স্বল্পকালের পাল্লায় রেলের শিঙার সঙ্গে মহাদেবের শিঙা পারিয়া ওঠে না সত্য, তবু ভোলা চলে না যে কালটা স্বল্প নয়। আজ শান্তিনিকেতনের নিস্তব্ধতা সঙ্কটাপন্ন হইলেও মনে রাখিতে হইবে কালের পরে পরশু আছে, তরশু আছে, আছে অনন্তকাল। শেষ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনের নিস্তব্ধতারই হইবে জয়।

১৫

বিশ্বভারতী

একুশে ডিসেম্বরের দেশ পত্রিকায় ইন্দ্রজিৎ লিখিত সফোক্লিস ও শান্তিনিকেতন প্রবন্ধটি ইতোমধ্যে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হইবার পরে বিশ্বভারতীর যে রূপ দাঁড়াইয়াছে তাহার বিবরণ ও সমালোচনা প্রবন্ধটি। ইন্দ্রজিৎ লেখকের ছদ্মনাম। প্রকৃত ব্যক্তি যিনিই হোন তিনি বিশ্বভারতীকে ভিতর হইতে দেখিয়াছেন, ঘনিষ্ঠভাবে দেখিয়াছেন আর তিনি বিশ্বভারতীর হিতকামী বন্ধু। আরো বুঝিতে পারা যায় যে, রবীন্দ্রসাহিত্যে ও রবীন্দ্র-আদর্শে তাঁহার প্রবেশ গভীর ও সার্থক। এমন লোকের সমালোচনার বিশেষ মূল্য আছে।

লেখকের মূল বক্তব্য এই যে, আইনের বলে বিশ্ববিদ্যালয় হইবার পর হইতে বিশ্বভারতীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলি ঝাড়িয়া ফেলিয়া দশের এক হইবার জন্য, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো হইবার জন্য একটা উৎকট আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে প্রতিষ্ঠানটিতে। লেখক বলিতে চান এই আকাঙ্ক্ষা অব্যাহতভাবে চলিলে রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পিত মূর্তিটি লোপ পাইবে, তার বদলে একটি সুষ্ঠু বিশ্ববিদ্যালয় দাঁড়াইবে কিনা বিতর্কের স্থল। সম্প্রতি যে অপ্রীতিকর ঘটনা আন্তর্জাতিক কুখ্যাতি লাভ করিয়াছে ইহা মূল রোগ নয়, মূল রোগের একটি লক্ষণমাত্র। এই রোগকে কেহ কেহ নূতন ও পুরাতন আদর্শের অনিবার্য দ্বন্দ্ব বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন জানিতে পারিলাম প্রবন্ধটি পড়িয়া। বিশ্বভারতীর শুভাকাঙ্ক্ষিগণের পক্ষে প্রবন্ধটি অবশ্যপাঠ্য।

লেখক অনুযোগ করিয়াছেন যে, সাধারণের উদাসীনতার ফলেই প্রতিষ্ঠানটি এমন অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে—অন্ততঃ বর্তমান দুর্গতির তাহা অন্যতম কারণ। এ অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য নয়। তবে যে সাধারণ উদাসীন ভাব দেখায় তাহার অনেক কারণ বর্তমান। একটি কারণ, বিশ্বভারতী সমালোচনা সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। দ্বিতীয় কারণ, স্বয়ং রাষ্ট্রের দৃষ্টি

যখন বিশ্বভারতীর উপর আছে, সব ঠিক পথে চলিতেছে এই ধারণার বশেও অনেকে নীরব। আসল গলদ ভিতরে এবং সে দায়িত্ব বিশ্বভারতীকেই বহন করিতে হইবে।

সে গলদটি হইতেছে বিশ্বভারতীকে রবীন্দ্র পরিকল্পনা হইতে ভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা। ইহার দায়িত্ব কর্তৃপক্ষ ছাড়া আর কাহার? বিশ্বভারতী অ্যাক্ট ইহার প্রতিকূল নয়। বিশ্বভারতীর আচার্য বারংবার গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বিশ্বভারতী স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সার্থকতা লাভ করিবে ইহাই দেশ আশা করে। তবে বাধা কোথায়? নিশ্চয় ভিতরে। অন্ততঃ বাহিরে নয়। অনেকের মতো আমারও বিশ্বাস বাধা ভিতরে, বাহিরে নয়। সে বাধাটি কি? রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনার প্রতি অবিশ্বাস আর গতানুগতিকতার প্রতি অত্যন্ত বেশি আকর্ষণ। ইহাই খুব সম্ভব সেখানে নূতন আদর্শ বলিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেছে।

মহাপুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত কর্মকেন্দ্রে তাঁহাদের প্রবর্তিত ধারাটি চলিবে ইহাই বাঞ্ছনীয়। বেলুড় মঠে যদি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধারা চলে, পণ্ডিচেরিতে যদি শ্রীঅরবিন্দের ধারা চলে, ওয়ার্ধাতে যদি গান্ধীজির ধারা চলে, তবে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রধারা বদলের কথা উঠিবে কেন? ওখানকার একদল লোকের যদি রবীন্দ্রপরিকল্পনা ভালো না লাগে, মনে রাখিতে হইবে যে, দেশে এমন লক্ষ লক্ষ লোক আছেন, যাঁহারা উহা পছন্দ করেন। মনে রাখিতে হইবে যে, রবীন্দ্রপরিকল্পনা বর্জনের অধিকার কাহাকেও দেওয়া হয় নাই, উহাকেই সার্থকতর করিয়া তুলিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। কাজেই ও বস্তু কাহারো ভালো না লাগিলে বস্তুটির অসারত্ব প্রমাণ হয় না, যাঁহাদের ভালো না লাগিল তাঁহাদেরই অনধিকারিত্ব সূচিত হয়। এই কথাটা স্বীকার করিয়া লইলে মূল ব্যাধি চিকিৎসা-সাধ্য হইয়া আসিবে।

১৬

গান্ধীজী

মহাত্মা গান্ধী বহু-চিত্রিত ব্যক্তি। এত চিত্র, এত মূর্তি আর কোন ব্যক্তির রচিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। কোন ব্যক্তির খ্যাতি যত বাড়িতে থাকে তাহার ছবির গতি তত নামিতে থাকে; নামিতে নামিতে অবশেষে একদিন পানের দোকানে গিয়া পৌছায়। তখন তাঁহার খ্যাতির বনিয়াদ পাকা হইল বলিতে পারা যায়, তখনই সে 'জনগণমন অধিনায়ক।'

নন্দলাল বসু অঙ্কিত মহাত্মাজীর ডাণ্ডী যাত্রার ছবিখানি আমার সব চেয়ে প্রিয়। এই ছবিখানি দেখিলে বুঝিতে পারা যায় গান্ধী কেবল মহৎ পুরুষ নয়, বৃহৎ পুরুষও বটে। পটের পুরোভাগ অধিকার করিয়া বিরলতম রেখায় অঙ্কিত সরলতম মূর্তিটি; যাত্রার আনন্দে দুই পায়ের মাংস-পেশীর মধ্যে কানাকানি পড়িয়া গিয়াছে; ধৃতযষ্ঠি দক্ষিণ হস্তের পেশীগুলির স্ফীতিতে গান্ধীর মনের দৃঢ়তা প্রত্যক্ষ; আর যষ্ঠিখানার মধ্যেও যেন এক অভূতপূর্ব শক্তি সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছে। মুখ ঈষৎ নত, চোখের দৃষ্টি মাটি সম্মার্জিত করিয়া চলিয়াছে, মুখমণ্ডলে প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা ও বিষাদের কোমলতার ছায়াতপ; প্রসারিত পদদ্বয়ে দশক্রোশী ধাপ। আর ছবিখানির পটভূমির খোপে খোপে বালখিল্য মনুষ্যমূর্তি, ডাণ্ডী-যাত্রার সহচর, চল্লিশ কোটির উনআশীটি প্রতিনিধি। ওই মূর্তিগুলির তুলনায় পুরোভাগের মূর্তিটি কি বিরাট্! "আমি যাত্রা স্বরু করিলে সমস্ত ভারতবর্ষ উদ্বেল হইয়া উঠিবে।" ওই মূর্তিগুলি সেই উদ্বেলিত ভারতবর্ষের উচ্ছ্বসিত ঊর্মিমালা।

এই চিত্রের গান্ধী মূর্তিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার একটি একরোখা ভাব বিজড়িত। গান্ধী ও চার্চিল চরিত্রের শতরকম প্রভেদ সত্ত্বেও একটা চরম জায়গায় দু'জনের মিল আছে। দু'জনেই প্রচণ্ড একরোখা। এই মিলটুকু আছে বলিয়াই কোনকালে তাহাদের আর মিলন ঘটিল না। মূলে প্রভেদ না থাকিলে কখনও সত্যকার মিলন ঘটে কি? প্রকৃতিগত ঐক্য দুইজনকে পৃথক করিয়া রাখে।

আবার এই একরোখা ভাবের মূলে আছে গান্ধী-চরিত্রের সরলতা। আপাত-বৈচিত্র্য এবং নানা মিশ্রতত্ত্বর সন্নিবেশ সত্ত্বেও গান্ধী-চরিত্র একান্ত সরল। গান্ধী-ব্যক্তিত্ব একখানি মাত্র পাথর কুঁদিয়া তৈয়ারী। জগতের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষেরা সকলেই 'মনোলিথিক' পাথরের মূর্তি। গান্ধী-চরিত্রের এই সরলতাই জনগণের পক্ষে তাঁহাকে সহজবোধ্য করিয়াছে। ঠিক এই কারণেই চার্চিলও ইংলণ্ডের জনগণের পক্ষে সহজবোধ্য। জনচিত্ত মিশ্রধাতুকে প্রশংসা করিতে পারে, যাদুঘর পর্যন্ত অনুসরণ করিতে পারে, কিন্তু বোমাবর্ষণ বা লাঠি বর্ষণের নীচে গান্ধী ও চার্চিলকেই অনুসরণ করিবে।

গান্ধী-চরিত্রে এই সরলতার কারণ গান্ধীচরিত্র মূলত মধ্যযুগীয়। এবারে পাঠকের সহিত আমার ভুল বোঝার আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। মধ্যযুগ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্কটের উপন্যাস হইতে সংগৃহীত। গিরিশিখরের চূড়ায় দুর্ভেদ্য প্রাকারের দুর্গ-প্রাসাদ, আপাদমস্তক লৌহবর্মে আবৃত বীর-পুরুষের দল, দ্বন্দ্বযুদ্ধের আসরের একান্তে উপবিষ্ট সুন্দরী সমাজ, বিজন পার্বত্য প্রদেশের মধ্যে বিচিত্রকীর্তি সন্ন্যাসী সম্প্রদায় এইসব উপাদানে আমাদের মধ্যযুগ গঠিত। বলা বাহুল্য, এ সমস্তই মধ্যযুগের লক্ষণ, কিন্তু নিতান্তই বাহ্য লক্ষণ। মধ্যযুগের স্বরূপ এসব হইতে ভিন্ন। মধ্যযুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র মানুষের আত্মা। উত্তর-রেনেসাঁস কালের মনোবিজ্ঞান আত্মাকে অস্বীকার করিয়াছে, বলে আত্মার প্রমাণাভাব; আর প্রমাণ ছাড়া কোন বস্তুকে সে স্বীকার করিতে রাজী নয়। কিন্তু একটা কথা ভুলিয়া যায় যে, মানুষের হাতে প্রমাণ যেমন একটা অস্ত্র, বিশ্বাসও তেমনি আর একটা অস্ত্র। প্রমাণের চালক বুদ্ধি। বিশ্বাসের চালক আত্মা। মনোবিজ্ঞান বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিতে সম্মত নয়, কারণ আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সে নাস্তিক। কিন্তু মনোবিজ্ঞানই কি একমাত্র জ্ঞান? তবে প্রজ্ঞা কি? উত্তর-রেনেসাঁস কালে বিজ্ঞানের যে স্থান, মধ্যযুগে সেই স্থান ছিল প্রজ্ঞার। প্রজ্ঞার রঞ্জনরশ্মিতে অন্তরের রহস্যভেদ সম্ভব, প্রজ্ঞার আলোকে আত্মা আত্মোদ্ঘাটন করে।

মনোবিজ্ঞান মানুষের বুদ্ধি, কর্তব্যজ্ঞান, সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতি সমস্ত বৃত্তিকেই স্বীকার করে, কেবল যে অদৃশ্যবৃন্তের সহিত এ সমস্ত বিধৃত, যাহা আছে বলিয়াই এ সমস্তই কেন্দ্রগতবৎ নিয়ন্ত্রিত হইয়া সক্রিয়, সেই বিন্দুটিকে সে

স্বীকার করে না। সেই অদৃশ্য, অজ্ঞেয় (প্রজ্ঞার সাহায্য ব্যতীত) বিন্দুটিই আত্মা। উত্তর-রেনেসাঁস বিজ্ঞানী বিনাসূতায় মালা গাঁথিতে চায় তাই ফুলের বহুত্ব মালার একত্বে পরিণত হয় না। মধ্যযুগ অনায়াসে আত্মার সূত্রে বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎকে এক করিয়া অখণ্ড বিশ্বমাল্য রচনা করিয়াছিল। নিরর্থক বহুর বিড়ম্বনা তাহাকে সহ্য করিতে হয় নাই। তাহার সাধন-রত অঙ্গুলিতে বিশ্বমাল্য জপমাল্যের মত আবর্তিত হইত। এই কারণেই মধ্যযুগ সরল। সে সরলতা অজ্ঞতাপ্রসূত নয়, প্রজ্ঞা-প্রসূত। এই কারণেই মধ্যযুগের মানব-চরিত্র এত সরল ছিল, সাধনলব্ধ সরলতা। রেনেসাঁসের প্রারম্ভ হইতে এই সরলতার অন্তর্ধানের সূত্রপাত। সূত্রকে অস্বীকার করিবামাত্র মালা ছিঁড়িয়া গিয়াছে, ফলে একরাশ ফুল আছে, মালা কোথায়? বৃন্তচ্যুত অসমন্বিত বুদ্ধি, নীতিবিজ্ঞান, সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতি মানুষকে বিভ্রান্ত করিতেছে, এক একজন এক একদিকে টানে। বুদ্ধি যদি আণবিক বোমা প্রস্তুত করে, নীতিজ্ঞান তাহাকে সমর্থন করিতে পারে না, সৌন্দর্যবোধ যখন আশ্রয় সন্ধান করে, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি তখন ইফেল টাওয়ারের মতো একটা লোহার শূল খাড়া করিয়া বলে—এটাই সুন্দর। ফলে কেন্দ্রচ্যুত বৃত্তিগুলো মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে নিরন্তর হানাহানি করিয়া মরে। মানুষের ব্যক্তিত্ব আজ আর অখণ্ড নয়, শত খণ্ড মানুষ আজ আত্মবিরোধী। এই কারণে আধুনিক মানব এমন অ-সরল, মিশ্র উপাদানের ভারে সে এমন পীড়িত।

গান্ধীকে যখন মধ্যযুগীয় ব্যক্তিত্ব বলি, তখন বলিতে চাই যে, তাঁহার চরিত্রে উত্তর-রেনেসাঁস পর্বের বিশ্লেষণী প্রক্রিয়া সক্রিয় হইয়া উঠিয়া অরাজকতা ঘটাইতে সক্ষম হয় নাই। জগৎ তাঁহার কাছে বহু ফুলের বিড়ম্বনা নয়, এক-সূত্রে গ্রথিত একটি জপমাল্য। জগৎকে তিনি যেমন সহজে বোঝেন, তাঁহার অন্তর্নিহিত সরলতার জন্যে জনচিত্তও তাঁহাকে তেমনি সহজে বোঝে। আধুনিক শিক্ষাদীক্ষার ফলে সংস্কৃতিমান সম্প্রদায় রেনেসাঁসের অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু অশিক্ষিত সর্বজন এখনও মধ্যযুগের উপান্তে বিরাজিত ওইখানে গান্ধীর সহিত তাহাদের মিল, সেইজন্য গান্ধী যখন বলেন যে, তিনি সর্বজনের প্রতিনিধি, সেকথা এমন সত্য। আবার ওই একই কারণে শিক্ষিত লোকে, রেনেসাঁসের পূর্বাচল ইউরোপের শিক্ষিত লোকে গান্ধীকে বুঝিতে এমন অযৌক্তিক অজ্ঞতা দেখায়।

আত্মা-বিশ্বাসী বলিয়াই গান্ধী আত্মবিশ্বাসী, জগৎ ও জীবনের সমুদয় সমস্যাকে তিনি ভিতরের দিক হইতে স্পর্শ করিতে চান, সম্ভব হইলে সমাধান করিতে চেষ্টা করেন। এই অন্তর্লোকের বাণীকেই তিনি বলিয়া থাকেন, 'Inner Voice'। অন্তরের দিক হইতে বাহিরের দিকে তাঁহার গতি বলিয়াই প্রেমের দ্বারা অন্তরের পরিবর্তন ঘটাইয়া সমস্যা সমাধান তাঁহার পন্থা। এযুগের বহুঘোষিত 'Objective Condition'-এর গান্ধী আবিষ্কৃত প্রতিষেধক 'Subjective Condition'। দৃষ্টির পরিবর্তন ঘটিলে জগৎ পরিবর্তিত হয়, অন্তরের পরিবর্তনে দৃষ্টি পরিবর্তিত। আজকার যুগ এসবকে অবাস্তব মনে করে, মধ্যযুগে ইহাই ছিল একমাত্র বাস্তব। তবু তো হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটিতেছে। কোনদিন ভারত-রাষ্ট্রের হৃদয় পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে গান্ধীকে সত্যাগ্রহ করিতে হইলে আমি অন্তত বিস্মিত হইব না।

আশ্চর্য এই লোকটি—গান্ধী! কৈলাস শিখর হইতে স্খলিত তুষার স্তূপের সূক্ষ্ম, শুভ্র রেণুপুঞ্জে দিঙমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গিয়া যেমন দিব্যভাবে আবিষ্ট করিয়া দেয়, তেমনি এক প্রকার স্বর্গীয় উন্মাদনা আছে গান্ধীর হাসিতে। সেই হাসির শুভ্র উত্তরীয়ে শ্রোতাদের একইভাবের আবেশে জড়াইয়া নেয়! আর গান্ধীর চোখের অতল করুণার তুলনা কৈলাস সানুশায়ী মানস সরোবর। গান্ধীর কথায় কৈলাস শিখরকে মনে পড়াই স্বাভাবিক। কৈলাসেশ্বর ভারতবর্ষের ধ্যানের প্রতীক। ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি ভারতবর্ষের শিল্পকে যেমন প্রভাবিত করিয়াছে এমন আর কিছু নয়। ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি রচিতে শিল্পিগণ অগোচরে ধ্যানী শিবকেই আদর্শ ধরিয়া লইয়াছে। ভবিষ্যতের শিল্পী সমাজ ধ্যানী গান্ধীর মূর্তি রচনা উপলক্ষ্যে ধ্যানী শিব-বুদ্ধকেই দৃষ্টির সম্মুখে রাখিবে। ভবিষ্যতের ধ্যানী গান্ধী মূর্তি ত্রয়ীর এক অপূর্ব সমন্বয়। গঙ্গা প্রবাহে নদনদী আসিয়া মিলিবা মাত্র তাহাদের অস্তিত্ব লোপ পায়, তখন সবই গঙ্গা। ভারতের ধ্যান-প্রবাহেও তেমনি একটি মোহিনী শক্তি আছে, স্বাতন্ত্র্যলোপকারিণী শক্তি। শিব-প্রবাহ, বুদ্ধ-প্রবাহ, আসিয়া পড়িয়াছে, এবারে গান্ধী-প্রবাহ আসিয়া পড়িয়া মূল-প্রবাহের শক্তি বর্ধন করিল। ভারতের ধ্যান-গঙ্গার শক্তি বর্ধনে যে সহায় হইতে পারিল না, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহার স্থান নাই। গান্ধী এই প্রবাহের যেমন শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে, এমন আর কে? গান্ধীর নাম ভারত ইতিহাসের শিরোদেশে।

১৭

সাধারণ মানুষ গান্ধী

অসাধারণ ব্যক্তি মূলত অত্যন্ত সাধারণ। যে ব্যক্তি যত অসাধারণ সে তত অধিক সাধারণ। অসাধারণ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পিরামিডের বা গিরিশৃঙ্গের ন্যায়। পিরামিড ও গিরিশৃঙ্গ যত উচ্চ হোক না কেন তাহার ভিত্তিটা সাধারণ মাটির উপর প্রতিষ্ঠিত। যে গিরিশৃঙ্গ যত উচ্চ তাহা তত অধিক পরিমাণ ভূমিকে আপনার ভিত্তিরূপে অধিকার করিয়া লয়। ঐখানেই তাহার মৌলিক সাধারণত্ব—আর তাহার উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে তাহার অসাধারণত্ব।

গান্ধী ব্যক্তিত্ব এ যুগের সবচেয়ে সাধারণ সম্পত্তি—যদিচ গান্ধীজী এ যুগের সবচেয়ে অসাধারণ ব্যক্তি। এ যুগের আর কোন মনীষীকে জানি না, শুধু ভারতের নয়, সমগ্র পৃথিবীতে যাঁহার ব্যক্তিত্ব রঘুবংশের রাজন্বের ন্যায় 'আসমুদ্র ক্ষিতীশানাম' এবং যাঁহার ব্যক্তিত্বের উর্ধগতি 'আনাক রথবর্ত্মনাম।' আর কাহারো ব্যক্তিত্ব এত পরিব্যাপ্ত অথচ উচ্চ নয়—ঐ পরিব্যাপ্তিই উচ্চতার কারণ, অর্থাৎ আর কোন ব্যক্তিত্ব এমন সাধারণত্ব উদ্ভূত অসাধারণ নয়। মূলত সাধারণ ছিলেন বলিয়া সাধারণে গান্ধীজীকে সহজেই বুঝিতে পারিত। ১৮৯৩ সাল হইতে ১৯৪৮-এর ৩০শে জানুয়ারী পর্যন্ত, দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে নয়াদিল্লী পর্যন্ত কখনো কোনখানে সাধারণ লোকে গান্ধীজীকে ভুল বোঝে নাই। মহত্ব বুঝিবার পক্ষে অশিক্ষা অন্তরায় নয়, অন্তরায় কুশিক্ষা। শিক্ষিতে, অশিক্ষিতে তাঁহাকে বুঝিয়াছে, দুই-ই মূলত সাধারণ। যত গোল পাকাইয়াছে কুশিক্ষিতে, কারণ ভিন্নার্থে সেই প্রকৃত অ-সাধারণ, তাহার মধ্যে সাধারণের সমান ধর্ম বলিয়া কিছুই নাই।

ইংরাজিতে যাহাকে Everyman বলি গান্ধীজী তাহারই আত্যন্তিক আদর্শ। প্রত্যেক মহাপুরুষই Everyman। মহাকবিগণের ব্যক্তিত্বের চরম প্রকাশ তাঁহাদের বাণীতে, কাজেই তাঁহাদের বাণীকে বলা চলে Everyword। বুদ্ধ, যীশু, গান্ধীর উপদেশ সর্বজনবোধ্য। আবার ব্যাস, বাল্মীকি, হোমার,

সেক্সপীয়র বা রবীন্দ্রনাথ এমন কোনো বাক্য বলেন নাই যাহা সর্বজনবোধ্য নয়। Everyman এবং Everyword বস্তুত অভিন্ন। সব ক্ষেত্রে এই মিল চোখে পড়ে না, কিংবা এই মিলন সম্পূর্ণ সম্ভব হয় না বটে, কিন্তু গান্ধীজীর বেলায় হইয়াছিল—তাই তাঁহার 'আমার জীবনই আমার বাণী'—এই উক্তি এমন সার্থক ও সত্য। মহাকবিদের বাণী তাঁহাদের পথ দেখাইয়া চলে—আর মহাপুরুষগণ বাণী সনাথ পথে চলিতে থাকেন। এই কারণেই সাধারণের পক্ষে মহাপুরুষগণকে বুঝিতে পারা এত অনায়াস হয়। কাব্য ও তাহার টীকা একত্র থাকিলে যেমন বোঝা সহজ, মহাপুরুষদের বাণী ও জীবন পরস্পরের সাহচর্যে পরস্পরকে ব্যাখ্যা করিতে থাকে বলিয়া তেমনি তাঁহাদের বোঝা কঠিন নয়। বুদ্ধ ও যীশুর বাণী যেমন সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে, গান্ধী-বাণী তেমনি গ্রথিত হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তাহাতে এমন একটা বর্ণও নাই যাহা সাধারণের অনায়াসবোধ্য নয়, আর কোথাও যদি খটকা বাধে তবে পাশেই তো প্রশস্ততম স্বচ্ছতম টীকা অবারিত গান্ধীজীর জীবন।

গান্ধীজীর এই বাণীর আধার তাঁহার ভাষা ও স্টাইল। আগে ভাষার কথাই বলা যাক। বুদ্ধের সময়ে পালি একটা সঙ্কীর্ণ অঞ্চলের লোকভাষা ছিল। সর্বলোকের উপদেশ অমৃতকে তথাগত সেই ক্ষুদ্র লোকভাষার আধারে রক্ষা করিলেন এবং দেখিতে দেখিতে 'সত্য যেথা কিছু আছে বিশ্ব সেথা রয়'—প্রমাণ হইয়া গেল। মগধের লোকভাষা বিশ্বের অন্যতম সংস্কৃতির বাহন হইয়া উঠিল। বুদ্ধ পালি ভাষায় কথা বলিয়াছিলেন—পালির বিশ্বভাষা হইয়া উঠিবার ইহাই একমাত্র কারণ। গান্ধীজী চূড়ান্তভাবে হিন্দুস্থানীকেই তাঁহার বাণী-মাধ্যমরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পণ্ডিতজনার মাথা নাড়া সত্ত্বেও, আর রাজনীতিকদের বিপক্ষে হাত তোলা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত হিন্দুস্থানীই ভারতবর্ষের বিপুলতম লোকভাষায় পরিণত হইবে। পণ্ডিতেরা আপত্তি করেন হিন্দুস্থানীর ব্যাকরণ ও অভিধান নাই। কিন্তু সে কেমন ধরনের পাণ্ডিত্য জানি না, যাহা অবগত নয় যে আগে ভাষা ও সাহিত্য, তন্নিবাহক ব্যাকরণ ও অভিধান পরে দেখা দেয়। পণ্ডিতেরা আরও আপত্তি করেন যে, হিন্দুস্থানীর সাহিত্য নাই। সাহিত্যজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে অনুকম্পা করিতে হয়। হিন্দুস্থানীতে শুধু সাহিত্য আছে বলিলে যথেষ্ট বলা হয় না, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্যের নমুনা হিন্দুস্থানীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গান্ধীজীর প্রার্থনান্তিক ভাষণগুলি সবই হিন্দুস্থানীতে কথিত। যাঁহারা হিন্দুস্থানীর স্বরূপ কী জানেন না বলেন তাঁহাদের গান্ধী-ভাষণ পড়িয়া দেখা উচিত। ইহাই হিন্দুস্থানীর প্রকৃত স্বরূপ। গান্ধীজীর অন্যান্য বিভূতির তলে চাপা পড়িয়া গিয়াছে—তিনি কত বড় গদ্য লেখক ছিলেন। প্রাঞ্জলতা, শরবৎ ঋজুগতি ও হৃদ্যতা যদি শ্রেষ্ঠ গদ্যের লক্ষণ হয়, তবে নিঃসন্দেহ গান্ধীজী পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখক। আদর্শ গদ্যের এইসব গুণ শ্রেষ্ঠ ফরাসী গদ্যে প্রচুর বর্তমান। আমাদের দেশে গদ্যের চেয়ে কাব্যের উন্নতিই অধিক হইয়াছে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ গদ্যের উদাহরণ যে নাই তাহা নয়। শঙ্করাচার্যের ভাষ্য গদ্য রচনার আদর্শ হিসাবে অতুলনীয়। ফরাসী মনীষী Pascal এইরূপ গদ্য লিখিলে লিখিতে পারিতেন। আর লিখিয়াছেন বর্তমান যুগে গান্ধীজী। শঙ্করাচার্য ও গান্ধীজী শ্রেষ্ঠ ভারতীয় গদ্য লেখক। গান্ধীজীর সেই অতুলনীয় গদ্যের আধার হিন্দুস্থানী। তবু পণ্ডিতজনেরা মাথা নাড়িয়া বলেন, হিন্দুস্থানীতে সাহিত্য কোথায়? পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যের জ্ঞাতিবিরোধ কি কিছুতেই ঘুচিবে না? গান্ধীজীর সর্বজনগ্রাহ্য উপদেশ, সর্বজনবোধ্য ভাষায় রক্ষিত হইয়াছে এবং সর্বজন তাহা গ্রহণ করিয়াছে—এখন পণ্ডিতজনেরা তাহা প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিবেন অথবা সর্বজন হইতে অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়া থাকিবেন, ভাবিয়া দেখিতে পারেন। গান্ধীজীর বাণী, জীবন ও ভাষা সর্বজনের জন্য উন্মুক্তদ্বার।

আমি যদি ভাস্কর হইতাম, আর ভারত সরকার যদি আমাকে ভারতবর্ষের একটি প্রতীক গড়িতে আদেশ করিতেন, তবে আমি একটি গান্ধীমূর্তি গড়িতাম। ভারতের সর্বজনের স্বরূপ গান্ধীমূর্তিতে যেমন বিকশিত তেমন আর কোথায়? বস্ত্রদীন ভারতবর্ষ, তপঃকৃশ ভারতবর্ষ, অর্ধনগ্ন ভারতবর্ষ, ক্ষুৎক্ষাম দৃঢ়সঙ্কল্প ভারতবর্ষ, চলমান ভারতবর্ষ, বদ্ধদৃষ্টি ভারতবর্ষ, উন্নত ললাট ভারতবর্ষ—সমস্তই প্রতিফলিত গান্ধী মূর্তিতে! ভারতবর্ষের আকাশে যে প্রশান্ত বিষাদ, ভারতবর্ষের সাধনায় যে অমেয় মৈত্র, ভারতবর্ষের হিমাচলে যে অটল মহিমা, গান্ধীজীর নেত্রে, ওষ্ঠাধরে ও বক্ষপটে কি তাহা প্রকাশিত নয়? ভারতবর্ষের সাধন বেগের দৃঢ়তা কি তাঁহার ধৃতযষ্ঠি মূর্তিতে পরিদৃষ্ট নয়? অতীন্দ্রিয় লক্ষ্যচারী ভারতবর্ষের ইতিহাসের চলমানতাই কি তাঁহার চরণ দুটিকে চঞ্চল করিয়া তোলে নাই? আর তাঁহার হাতের ঐ যষ্ঠিখানি সে তো কোনো

ঐন্দ্রজালিকের যাদুদণ্ড, যাহার ইঙ্গিতে 'তামাম হিন্দুস্থান' বারংবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। শাস্ত্রে বলে ব্রহ্মার এক এক অঙ্গ হইতে এক এক বর্ণের উৎপত্তি। গান্ধী-অঙ্গে সকল বর্ণের সকল মানবের অপূর্ব সমাবেশ। এমন করিয়া একটা মহাদেশ একটি মানুষের ব্যক্তিত্বে আর কখনো ধরা পড়িয়াছে কি? এই মূর্তির পাদপীঠ সমগ্র ভারতবর্ষ—সেই সাধারণ ভিত্তির উপরেই অসাধারণ গান্ধীর প্রতিষ্ঠা। সাধারণকে কত অসাধারণ করিয়া তোলা যায়—গান্ধীব্যক্তিত্ব তাহার আদর্শ।

১৮

নীলকণ্ঠ

আসামের রাজ্যপাল শ্রীজয়রামদাস দৌলতরাম গান্ধীজীর জীবন হইতে অভয়ের সাধনার একটি অত্যন্ত দুঃসাহসিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। অভয়ের সাধনায় কতদূর সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, সে বিষয়ে গান্ধীজী সর্বদা সচেতন ছিলেন। সাপ মানুষের চিরশত্রু। শাপ সম্বন্ধে তিনি অভয় লাভ করিয়াছেন কিনা, এ কৌতূহল তাঁহার ছিল। কীভাবে সাপ লইয়া তিনি একদা পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার একটি দৃষ্টান্ত আসামের রাজ্যপাল সেদিন প্রকাশ করিয়াছেন। সমস্ত ঘটনাটি আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হইতে তুলিয়া দিলাম। সংক্ষেপেও বলিতে পারিতাম, কিন্তু এই শ্রেণীর বিবরণের যতই পুনরুক্তি হয়, সমাজের পক্ষে ততই মঙ্গল মনে করিয়া একটু বিস্তারিতভাবেই বলিলাম।

"ঘটনাটি ঘটে ওয়ার্ধায় প্রায় ২০ বৎসর পূর্বে। এই সময়ে একদিন একটি অপরিচিত গ্রামবাসী কতগুলি বিষধর সর্প লইয়া গান্ধীজীকে দেখাইতে আসে। সেগুলির বিষদন্ত উৎপাটিত করা হয় নাই। লোকটি গান্ধীজীকে বলে, উহার একটি সাপ সে গান্ধীজীর গলায় জড়াইয়া দিবে, কিন্তু তাহার মন্ত্র-প্রভাবে সর্পটি গান্ধীজীকে দংশন করিবে না; গান্ধীজী ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে প্রস্তুত আছেন কি না। গান্ধীজীর সম্মুখে অভয়ের পরীক্ষা এইভাবে

উপস্থিত হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। গ্রামবাসীটি একটি বিষধর সর্প তাঁহার গলায় জড়াইয়া দিল। মানুষের উষ্ণ অঙ্গের সংস্পর্শে আসিয়া সাপটি অস্থিরতা প্রকাশ করিতে লাগিল এবং একবার জিহ্বা বাহির করিয়া গান্ধীজীর দিকে যেন উদ্যত ফণা বিস্তার করিল। উৎকণ্ঠিত দর্শকেরা প্রতি মুহূর্তে বিপদের আশঙ্কা করিতে লাগিল। কিন্তু বিপদ হইল না। গান্ধীজী একেবারে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। সাপটি কিছুক্ষণ গান্ধীজীর শরীরের উপর যথেচ্ছ গড়াইল এবং তাহার পর গ্রামবাসীটি সর্পটিকে সরাইয়া লইল!"

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র হইতে মুনি-ঋষিগণের জীবনে ও তপোবনে এই শ্রেণীর ঘটনা ঘটিত বলিয়া জানিতে পারা যায়। কিন্তু লৌকিক অভিজ্ঞতায় এই শ্রেণীর ঘটনা নূতন বটে। এমন কি, অভয়সাধক গান্ধীজীর জীবনেও ঠিক এই শ্রেণীর ঘটনা বোধ করি একাধিকবার ঘটে নাই। এমন হওয়া যে সম্ভব, ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ তাহা বারংবার বলিয়াছেন। যে-ব্যক্তি কায়-মনোবাক্যে অহিংস, শ্বাপদ ও সরীসৃপগণও তাহার সঙ্গে অহিংস আচরণ করিয়া থাকে। গান্ধীজী কায়মনোবাক্যে অহিংসার সাধক ছিলেন। কিন্তু ঠিক এই জাতীয় "গান্ধীবাদী" এদেশে বিরল। একবার গান্ধীজী খেদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, লোকে যাহাকে "গান্ধীবাদী" বলে তাহার একমাত্র দৃষ্টান্ত তিনি নিজে। দেশের বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোনো ভ্রান্ত ধারণা ছিল না।

তাঁহার নেতৃত্বে পরিচালিত ও তাঁহার বলে বলীয়ান কংগ্রেস "অহিংসা"কে রাজনৈতিক পদ্ধতিরূপে মাত্র গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার বেশি তিনি কংগ্রেসকে অগ্রসর করিতে পারেন নাই। ভারতে বৃটিশ শাসন সম্বন্ধে কংগ্রেস "অহিংস" ছিল, সে "অহিংসায়" গান্ধীজীর অহিংসায় দুস্তর প্রভেদ। আজকার কংগ্রেস গবর্নমেণ্টের যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতির মূল ঐ "রাজনৈতিক অহিংসার" মধ্যে নিহিত বলিলে অন্যায় হইবে না। অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় অহিংসার ক্ষেত্রেও মনের সঙ্গে চোখ ঠারিলে তাহার দণ্ড ভোগ করিতে হয়—কংগ্রেস আজ সেই দণ্ড ভোগ করিতেছে।

তবে অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে যে, প্রধানতঃ কংগ্রেস সরকারের কর্ণধার নেহরুর নেতৃত্বে পৃথিবীর সর্বত্র আজ অহিংসা, শান্তি, পঞ্চশীল প্রভৃতি

ধ্বনি উঠিতেছে। বলা বাহুল্য, এ সমস্তও পলিটিক্যাল অহিংসা, গান্ধীজীর অহিংসার সঙ্গে ইহাদের নামের বেশি মিল নাই। আবার বলা বাহুল্য—একদা ইহারও মূল্য দিতে হইবে, রক্তে এবং অশ্রুতে।

অন্য দেশের কথা ছাড়িয়া দিই। গান্ধীজীর এই দেশেই "অহিংসা"র নানা বিচিত্র রূপ নিত্য নিয়ত দেখিতে পাইতেছি। ভারত সরকার ব্রহ্মদেশ ও মিশরকে অস্ত্র বিক্রয় করিতেছে। সরকারের মুখপাত্র বলিতেছেন, ইহাকে কেহ যেন হিংসার দালালী না মনে করেন, ইহা ব্যবসায় মাত্র। অবশ্যই ব্যবসায়, দাস বিক্রয় প্রথাও ব্যবসায় ছিল। প্রতিরক্ষা বিভাগের মন্ত্রী শ্রীমহাবীর ত্যাগী বলিয়াছেন যে, ভারত মতামতনির্বিশেষে যে-কোনো দেশ হইতে অস্ত্র ক্রয় করিবে, কেবল মূল্য সুলভ হইলেই হইল। অতএব ইহাও ব্যবসায়! যুদ্ধ নামক যে পাইকারী ব্যবসায় আছে, এসব ছোটো-খাটো 'ব্যবসায়' তাহারই খুচরা রূপ। কাজেই "অহিংসা"র চর্চা আমরা ভালোই করিতেছি। তারপরে দেশের যত্রতত্র সদাসর্বদা অনশন, উপবেশন, প্রয়োপবেশন, দ্বাররোধ প্রভৃতি কত রকম সত্যাগ্রহই না দেখিতেছি। এমন কি, কম্যুনিস্ট সত্যাগ্রহও দেখিতে পাইলাম। এ সমস্তই "অহিংস", আবার এই সব "অহিংসা"র মূলে আছে তৎকালীন কংগ্রেসের "অহিংস নীতি"। মানুষ খুব চালাক, কিন্তু অদৃষ্টের চালাকি আরো কিছু সূক্ষ্ম, একেবারে মূলে আঘাত করে।

কিন্তু ওয়ার্ধার ঐ মহাপুরুষটির কথা কিছুতেই যে ভুলিতে পারিতেছি না। ভুলিতে চাই, ভুলিতে পারিলেই স্বস্তি, মনে পড়িলেই নীতি, বিবেক, সত্য, অহিংসা প্রভৃতি নানা বাধা সহস্র মস্তক উত্তোলন করিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়ায়। কেন আবার ঐসব অবান্তর বস্তু জীবনের পথ বিঘ্নিত করে—জীবনের পথ তো দিব্য সরল, সটান ব্যবসায়ের দিকে গিয়াছে, যে ব্যবসায়ের চরম পরিণাম মহা আহব! অতএব ওয়ার্ধার ব্যক্তিটিকে ভুলিতেই হইবে, বোধ করি, সেজন্য খুব বেশি চেষ্টাও করিতে হইবে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, মনের সদজাগ্রত সতর্কতা সত্ত্বেও এক একবার চোখ পড়িয়া যায়, জীবনের ও দেশের যাবতীয় ভীতি, যাহার কৃত কণ্ঠহার, সেই মৃত্যুঞ্জয় নীলকণ্ঠের নির্বিকার প্রসন্ন মুখচ্ছবি।

১৯

মহামানব মহাত্মা গান্ধীর জীবনাবসান

বিড়লা ভবন। অপরাহ্ন পাঁচটা। প্রাঙ্গণে উৎসুক জনতা। প্রার্থনার নিয়মিত সময় অতিক্রান্তপ্রায়। এমন সময়ে দ্বার খুলিয়া গেল, সৌম্যগম্ভীর মহাপুরুষ দুই পৌত্রীর স্কন্ধে দুই হাত রাখিয়া বাহির হইয়া আসিলেন, প্রার্থনা বেদীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। জনতা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পথ করিয়া দিল, তিনি প্রার্থনাবেদীর সিঁড়িতে একখানি পা রাখিয়াছেন, এমন সময়ে জনতার বেষ্টনী অতিক্রম করিয়া খাকি পোশাক পরিহিত একটা লোক মহাপুরুষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে পদধূলিপ্রার্থী ভাবিয়া বাধা দিবার পূর্বেই শ্রীমতী মানু গান্ধীকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া দুরাত্মা পকেট হইতে রিভলবার বাহির করিয়া লইল, তারপরে একবার, দুইবার, তিনবার, চারবার! হা রাম বলিয়া মহাত্মাজী বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার চশমা ও চটি কোথায় ছিটকিয়া পড়িল। অনুচরগণ তাঁহার দেহ বহন করিয়া গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেল। শেষ প্রার্থনা অসমাপ্ত রহিয়া গেল। কিংবা জীবন দান করিয়া তিনি চরম প্রার্থনা সমাধা করিয়া গেলেন।

জনতা আর্তনাদ করিয়া উঠিল, নিঃশ্বাস রোধ করিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল! বাড়ির ভিতরে কী হইতেছে কে জানে? জনতার মনের ভিতরেই বা কী হইতেছে কে জানে? দুশ্চিন্তার দণ্ডপল আর নড়িতে চাহে না। একবার দরজা খুলিয়া গেল—কে একজন জানাইল, বাপুজী এখনও জীবিত আছেন। আবার দরজা বন্ধ হইল। কালস্রোত কি বন্ধ হইয়া গেল নাকি! কিছুক্ষণ পরে দরজা আবার খুলিল—জনতা শুনিল, বাপুজী নাই। এবারে জনতা আর্তনাদ করিতেও বিস্মৃত হইল। তাহারা কি ওই কথাগুলির মর্ম বুঝিতে পারে নাই, বাপুজী নাই।

বাপুজী নাই। ইহাও কি সম্ভব? আর সবই আছে আর সবাই আছে, কেবল, যিনি সবচেয়ে বেশী করিয়া ছিলেন তিনিই নাই! না ইহা সম্ভব নয়, তাই বুঝি জনতা আর্তনাদ করিল না।

তড়িৎস্পর্শবৎ এই সংবাদ দিল্লীতে ছড়াইয়া পড়িল—দিল্লীর শত পথের লক্ষ্য পথিক বিড়লা-ভবনমুখী। প্যাটেল, নেহরু, রামদাস ও দেবদাস তাঁহার দুই পুত্র (তাঁহার পুত্র কে নয় ?), দিল্লীর প্রধানগণ বিড়লা ভবনে সমাবিষ্ট হইলেন। ইতিমধ্যে বিড়লা ভবন প্রাঙ্গণ জনতায় পূর্ণ হইয়া গেল, তাহারা মহাত্মাজীর দর্শন চায়। তখন তাঁহার স্নাত, চর্চিত, নববস্ত্র পরিহিত দেহ বিড়লা ভবনের অলিন্দে রক্ষিত হইল। জনতা যাঁহাকে এতদিন জীবনময় দেখিয়া আসিয়াছে, এক্ষণে তাঁহাকে প্রাণহীন দেখিল।

তারপরে মহাত্মাজীর পুণ্য দেহ তাঁহার কক্ষে পুনরায় নীত হইল। সেখানে তাঁহাকে যমুনার জলে স্নান করানো হইল, নূতন বস্ত্রে সজ্জিত করা হইল, তাঁহার কণ্ঠে খদ্দরের মালা পরানো হইল, পুষ্পস্তূপে তাঁহার দেহ আবৃত হইল, কেবল বক্ষের একটা স্থানে ক্ষতচিহ্ন অনাবৃত রহিল। তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ স্বজনগণ ভজন গান করিতে লাগিল। কক্ষে একটি মাত্র ঘৃতের দীপ। সেই দীপালোকে তাঁহার সৌম্য গম্ভীর মুখমণ্ডল দৃশ্যমান, সে মুখে অশান্তি নাই, বেদনা নাই, সে মুখে কানায় কানায় পূর্ণ জোয়ারের জলের গম্ভীরতা, সে মুখে তথাগতের মুখচ্ছবির পূর্ণতা, জীবন ও মৃত্যু যাঁহার কাছে তুল্য-মূল্য ছিল, জীবন-মৃত্যুর পরমা শান্তি সে মুখে বিদ্যমান। সারারাত্রি তাঁহার প্রিয় ভজন গান সেই কক্ষে ধ্বনিত হইতে লাগিল। বিনিদ্র স্বজনদের পক্ষে রাত্রির প্রহর আর শেষ হইতে চাহে না।

আততায়ীর গুলি স্পৃষ্ট হইবামাত্র তাঁহার মুখ হইতে রাম নাম বহির্গত হইল। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার জীবনান্ত ক্ষণ সমাগত। যে রাম নাম তাঁহার জীবন-স্বরূপ ছিল সেই ইষ্ট নাম জপ করিতে করিতেই তিনি দেহত্যাগ করিয়া গেলেন। অন্তিম মুহূর্তে তাঁহার জীবন-কুহর হইতে রাম ধ্বনি উচ্চারিত হইল—সেই পুণ্য ধ্বনি, জীবনের সার্থকতা-স্বরূপ সেই ধ্বনি অনন্তকাল ধরিয়া মানুষের হৃদয়াকোশে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে—'হা রাম, হা রাম'—সেই ধ্বনি মানুষের জীবনে আশ্রয় সন্ধান করিয়া ফিরিবে, 'হা রাম, হা রাম'—সেই ধ্বনি যুগে যুগে দেশে দেশে সম্প্রদায় হইতে সম্প্রদায়ে সমবিশ্বাসীর অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইবে, অবিশ্বাসীকে বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করিবে, পতিতকে পবিত্রতায় আহ্বান করিবে, নিষ্ঠুরকে প্রেমে আহ্বান করিবে, বিশ্বে

রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়া অবধি সেই শেষনিঃশ্বাস-উচ্ছ্বসিত ধ্বনির বিরাম থাকিবে না—'হা রাম, হা রাম'।

সেই রাত্রির নির্জন কক্ষে তাঁহার স্বজনগণ ব্যতীত আর কেহ ছিল না—ইহা আমরা বিশ্বাস করি না, আমরা সংস্কারগ্রস্ত জীব, আমাদের বিশ্বাস ভজন গানের সুরে আহূত হইয়া দেবলোক হইতে, পিতৃলোক হইতে মহাপুরুষগণ আসিয়া সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অনুজ এই মহাপুরুষ যিনি মাহাত্ম্যে সকলের অগ্রজ তাঁহাকে বরণ করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে যে অদৃশ্য জনতা কক্ষে সমবেত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ সংবাদপত্রে নাই বলিয়াই যে অবাস্তব এমন আমরা বিশ্বাস করি না।

কালরাত্রি অতিক্রান্ত হইল। বিড়লা ভবনের দ্বার খুলিয়া গেল। জাতির জনতা জাতির জনককে দর্শন করিতে প্রবেশ করিল, তাহারা সারা রাত্রি শীতের প্রকোপ অগ্রাহ্য করিয়া বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। এখন তাহারা নীরবে দর্শন করিতে লাগিল—কিন্তু দর্শন করিতে কি পারিয়াছিল? চোখের জল যে চোখের দৃষ্টির অন্তরায়, সমস্ত দিল্লী আজ শোকের নগরী।

বেলা এগারটায় নেহরু প্রবেশ করিলেন, এক রাত্রিতে তাঁহার বয়স দশ বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে। পুণ্য দেহকে কী ভাবে সজ্জিত করিতে হইবে, কোথায় স্থাপন করিতে হইবে, সময়োচিত নির্দেশ দিতে তিনি ব্যস্ত। বেলা পৌনে বারোটায় শঙ্খধ্বনি উঠিল, 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' ধ্বনি শব্দিত হইল, শবাধার বিড়লা ভবন হইতে বাহিরে আনীত হইল; মহাত্মাজীর পৌত্রী, পিয়ারীলাল প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহার দেহ বহন করিয়া আনিয়া শকটের উপরে স্থাপন করিল। ভারতীয় স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর সৈনিকগণ শকট টানিয়া লইয়া চলিল। দেশ-বিদেশের শ্রদ্ধা-ভক্তির নিদর্শন পুষ্পমাল্যে সেই দেবদেহ আবৃত হইয়া গেল—কেবল মুগ্ধ ভক্তগণের সান্ত্বনার স্বরূপ তাঁহার মুখমণ্ডল অনাবৃত। মহাত্মাজীর অন্তিম যাত্রা আরম্ভ হইল, নেহরু-প্যাটেল ও অন্যান্য মন্ত্রিগণ অনুসরণ করিলেন; সপত্নীক লর্ড মাউণ্টব্যাটেন যাত্রারম্ভের আয়োজন করিয়া দিলেন। শবানুগামী বিরাট জনতা আজ গম্ভীর, তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে ইহা কেবল একটি মহাপুরুষের জীবনান্ত নয়; একটি মহাযুগেরও অবসান—তাই কোলাহল নাই, চপলতা নাই; কেবল মাঝে মাঝে 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' ধ্বনি। জনতা ক্রমেই

বাড়িতে লাগিল, রাস্তার প্রত্যেক মোড়ে মোড়ে জনতার নূতন নূতন অববাহিকা বিশাল স্রোতকে বিশালতর আয়তন দিতে লাগিল—আকাশ হইতে বিমানবাহিনী পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল, যাহারা জনতায় স্থান পায় নাই তাহারা বৃক্ষ, মূর্তি, অট্টালিকা যে-কোনো আশ্রয়বস্তু অবলম্বন করিয়া ভারত-পুরুষের শেষ দর্শন পাইবার চেষ্টা করিল। জনতা যমুনা-তীরবর্তী রাজঘাটের মুখে চলিতেই লাগিল।

এ কি শবযাত্রা, না জয়যাত্রা! তুলসীদাস বলিয়াছেন যে, মানুষে এমনভাবে জীবনযাপন করিবে, যাহাতে মৃত্যুকালে সে যেন হাসিতে পারে আর সবাই কাঁদিবে। তুলসীদাসের উপদেশ দিল্লীর রাজপথে আজ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল,—একটি চোখও আজ শুষ্ক নয়। নেহরু বালকের মতো কাঁদিতেছে, অন্তর্লীন অশ্রুর ভারে প্যাটেল আজ পাষাণমূর্তিবৎ। শিশু, বৃদ্ধ, নরনারী সকলেই আজ পিতৃহীন হইল—একই শোকের অখণ্ড প্রভাবে সমস্ত দেশ আজ অভাবিত ঐক্য অনুভব করিতেছে। এ কেমনতরো জয়যাত্রা! ঐ যে বালকটি কাঁদিতেছে, বহুকাল পরে তাহার নাতিদের নিকটে সে গল্প করিবে—"হ্যাঁ, বাপুজীকে আমি একদিন দেখিয়াছিলাম বটে, সেদিন তিনি রাজা, উজীর, মন্ত্রী, সেনাপতির দ্বারা অনুসৃত হইয়া জয়যাত্রায় বাহির হইয়াছিলেন।"

অপরাহ্ন চারটা কুড়ি মিনিটে মহাত্মাজীকে অনুসরণ করিয়া জনতা রাজঘাটে আসিয়া পৌছিল। সেখানে সেই ঐতিহাসিক পুণ্য প্রবাহিনীর তীরে চন্দনকাষ্ঠের চিতা সজ্জিত ছিল। ঘৃত, কর্পূর, সৌগন্ধ্য, পুষ্পমাল্য প্রভৃতি উপকরণ মানুষের চেষ্টায় যাহা আহৃত হইতে পারে, কোনো সামগ্রীর ন্যূনতা ছিল না—যথাবিহিত শাস্ত্রীয় আচার অনুসারে পুণ্য দেহখানি চিতার উপরে স্থাপিত হইল। লর্ড মাউন্টব্যাটেন, নেহরু হইতে ভারতবর্ষের বহু প্রাদেশিক শাসনকর্তা, মন্ত্রী, অমাত্য, পারিষদ নতশিরে দণ্ডায়মান। পাঁচটার কিছু আগে রামদাস চিতায় অগ্নিসংযোগ করিলেন। জনতা দুঃখে-সান্ত্বনায়, আশায়-বেদনায়, আর্ত আনন্দ ধ্বনি করিয়া উঠিল—'মহাত্মা গান্ধী অমর হো গয়ে'। ওদের কথাই ঠিক। ওই অশিক্ষিত জনতাই স্বরূপ নির্দেশ করিল—মহাত্মাজী মরেন নাই; তিনি অমর হইয়া গেলেন। তখন জনতায় আর জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে বিভেদ ঘুচিয়া গেল। প্যাটেল মাউন্টব্যাটেন-পত্নী নেহরু কোলে

করিয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় শিশুদের নিরাপদ স্থানে আনিতে লাগিলেন। কিন্তু কে কাহাকে সান্ত্বনা দিবে! আর্ত নরনারী চিতাগ্নির দিকে ছুটিয়াছে। যে রক্ষা করিবে, আর যে রক্ষা পাইবে দুইজনেই কাঁদিতেছে। সারাজীবন যিনি মানুষে মানুষে বিভেদ ভাঙিবার কাজে নিযুক্ত ছিলেন, মৃত্যুকালে তিনি ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা, মন্ত্রী-চাপরাসী, শিক্ষিত-অশিক্ষিতকে একাসনে সমান করিয়া বসাইয়া, বড়লাট-পত্নীর কোলে দীনতম হতভাগ্যের কন্যাকে চড়াইয়া সকলের সম্মিলিত অশ্রুর প্রবাহ যমুনাতে সমর্পণের দ্বারা নূতন জনসঙ্গম তীর্থ রচনা করিয়া চলিয়া গেলেন। যে থাকে, দুঃখ তাহারই।

চিতাগ্নি জ্বলিতেছে। একটি দেহ পুড়িতেছে, আর একটি যুগ পুড়িতেছে; ওদিকে যমুনার পরপারে অর্ধ-অস্তমিত সূর্যমণ্ডলেও যেন আর একটি চিতাগ্নি শিখা! একটি দিনান্ত আর একটি যুগান্ত এমনভাবে মানুষের ইতিহাসে আর কয়বার মিলিয়াছে? চিতা পুড়িতেছে, নেহরু-চিত্তে কী ঘটিতেছে—তাহাই ভাবিতেছি। সকলেই আজ বটে পিতৃহীন, কিন্তু নেহরু কর্তব্যের পথে জ্যেষ্ঠ—তাই তাঁহার অভাব আজ সকলের চেয়ে দুঃসহ। নেহরুর চিত্তে কী ঘটিতেছে, তাই ভাবিতেছি। ছটার মধ্যে নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইল। চিতা নিভিয়া গেল—ওপারে সূর্যের চিতাও নিভিয়া গিয়াছে। হে পুষণ, তুমি তোমার হিরন্ময় বাহুর আলিঙ্গনে তাহাকে বেষ্টন করিয়া লইয়া চলিলে—তোমার স্বর্ণপাত্রের মুখ অবারিত করিয়া সত্যের স্বরূপ যাহাকে দেখাইয়াছিলে, আজ বুঝি তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া সত্যলোকের উদ্দেশে প্রয়াণ করিলে।

ইতিহাসের নানা চিহ্নের দ্বারা অঙ্কিত পথ বাহিয়া জনতা ঘরে ফিরিয়া গেল—সূর্য-অস্তমিত আকাশে যুগ-যুগান্তের অক্ষয় সাক্ষীর দল তখন চোখ মেলিয়াছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন শ্মশানযাত্রা কি আর ঘটিয়াছে—কই মনে তো পড়ে না। অশ্রুজলের কুয়াশায় ঝাপসা প্রাচীন ইতিহাসের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছি—কই! মহাভারতের কাহিনী তো এই ভূখণ্ডেই ঘটিয়াছিল; কিন্তু ঠিক এমন ব্যাপার তো কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বর্ণনা করেন নাই? কেবল পিতামহ ভীষ্মদেবের অবর্ণিত শবযাত্রার সহিত তুলনা চলিলেও চলিতে পারে।

পিতামহ ভীষ্মের শরশয্যা ব্রত শেষ হইলে যেদিন তিনি স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করিলেন, সেদিন কি কুরু-পাণ্ডবে মিলিয়া এমনি মুগ্ধ শোকাতুরভাবে তাঁহার দেহ যমুনাতীরে বহন করিয়া লইয়া যায় নাই? হয়তো রাজঘাটের ঠিক এই স্থানটিতেই লইয়া গিয়া চিতা রচনা করিয়া দগ্ধ করিয়াছিল। কে বলিতে পারে? সেদিনও তাঁহাকে ঠিক এইভাবেই চতুরঙ্গ বাহিনী, রাজা ও রাজপুত্র, মন্ত্রী ও অমাত্য, উচ্চ ও নীচ এবং শোকাতুর জনতা অনুসরণ করিয়া শ্মশান পর্যন্ত আসিয়াছিল। পিতামহ ভীষ্মের জীবনান্তেই মহাভারতের যুগান্ত! আজও আর একটা যুগান্তের পুনরভিনয়।

মহাত্মাজী পিতামহ ভীষ্ম ছাড়া আর কী? স্বজন-বিরোধের মর্মভেদী শরশয্যায় তিনি শয়ান ছিলেন—আজ তাঁহার এ মৃত্যু স্বেচ্ছামৃত্যুরই নামান্তর। ভারতবর্ষের ইতিহাসের নাভিপদ্ম এই দিল্লীনগরী, ভারতবর্ষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এখানে সংহত, দিল্লীর সেই পবিত্র ভূখণ্ডে ভারত-পুরুষ দেহরক্ষা করিবেন, তাহাকে পবিত্রতর করিয়া তুলিবেন, ইহার চেয়ে স্থানোচিত কালোচিত আর কী হইতে পারিত?

তবু মুগ্ধ মন সান্ত্বনা মানে না। বুঝিয়াও বোঝে না, 'তিনি নাই' এই তথ্যটাকে চাপা দিবার জন্যই তো এত লেখা! বুদ্ধি বুঝিয়া প্যাটেলের মতো অশ্রু সম্বরণ করিয়া রাখে, মন বুঝিয়াও বোঝে না, নেহরুর মতো তাহার চোখের জল আর থামিতেই চায় না।

বিড়লা ভবন। মহাত্মাজীর নিবাস-কক্ষ। রাত্রি। যে আসনে তিনি উপবেশন করিতেন, সেখানে তাঁহার নিত্য-সঙ্গী চরখাটি, তাঁহার ব্যবহারের সামান্য দু-চারিটি বস্তু, আর পুষ্পমালাশোভিত তাঁহার একখানি প্রতিকৃতি। এক কোণে একটি ঘৃত-দীপ। অন্তরঙ্গ দু-চারজন ভক্ত তাঁহার প্রিয় রামনাম গান করিতেছেন। সমস্ত শান্ত, সুগভীর। যে সুগভীর শান্তি তাঁহার পরম আশ্রয় ছিল, তাহারই একটি ক্ষীণ স্পর্শ যেন ওই কক্ষটিকে অবলম্বন করিয়া বিরাজ করিতেছে।

২০

মহাত্মাজীর সাধনার বৈশিষ্ট্য

সত্য জগতে চিরকাল নির্ণীত রহিয়াছে, কিন্তু সেই অলক্ষ্য সত্য সাধকের জীবনে মূর্ত না হওয়া অবধি মর্ত্যজনের কাছে তাহা না থাকিবারই মতো। সাধকের জীবনে যখন সত্যের কোনো অংশ জীবন্ত হইয়া উঠে, তখনি সত্যের সার্থকতা। ভুবনের অন্ধকারে যাহা অসৎবৎ, জীবনের আলোকপাতে তাহার প্রকাশ। বিশ্বমৈত্রী তথাগতের জীবনে একবার মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তারপরে আড়াই হাজার বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, এই সুদীর্ঘকালে বিশ্বমৈত্রীর ব্যতিক্রমনই মানুষের ইতিহাস। বুদ্ধের জীবন ও বাণীর সহিত একরকমভাবে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বমৈত্রীর উপরে তেমন আস্থাশীল নই, ভাবি যে ওটা একবার দৈবাৎ একজন সাধকের জীবনে সত্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু বর্তমান জগৎ তাহার অনুকূল নয়। এই ভাবে মনের সঙ্গে যখন একরকম বনিবনাও করিয়া লইয়াছি—তখন হঠাৎ আততায়ীর গুলিতে গান্ধী নিহত হইলেন। অমনি কী দেখিলাম? গান্ধীজীর পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক জীবনচর্য্যায় তাহা দেখিবার অবকাশ হয় নাই। যাহা দেখিলাম তাহাই কি miracle নয়? লোকে miracleএর অস্তিত্বে কেন সন্দেহ প্রকাশ করে জানি না। Miracle যে সম্ভব মাত্র তাহাই নয়, miracle-ই একমাত্র সম্ভব, কারণ আজকার জগতে যে-সব ঘটনাকে real বলিয়া আমরা বুক ফুলাইয়া বেড়াই, কিছুকাল পরে সেই সব real-এর কিছুমাত্র চিহ্নও অবশিষ্ট থাকিবে না, এই miracle-টিই মাত্র থাকিয়া যাইবে।

গান্ধী-হত্যা ব্যাপারে যে miracle দেখিলাম তাহা আর কিছুই নয়, একটি অলক্ষ্য সত্যের সার্থক মূর্তি-পরিগ্রহ। গৃহমধ্যে একটি স্বচ্ছ স্ফটিক-পাত্র ছিল, সর্বদা চোখে পড়িত না, একদিন যখন সেই পাত্রটি ভাঙিয়া গেল, অমনি গৃহের চতুর্দিক ঝন্‌ঝন্ শব্দে আর্তনাদ করিয়া উঠিয়া প্রমাণ করিয়া দিল যে পাত্রটি নিশ্চয়রূপে ছিল। গান্ধীজীর মৃত্যুর পৃথিবীব্যাপী শোক

প্রমাণ করিয়া দিল যে গান্ধীজী ছিলেন, প্রমাণ করিয়া দিল যে গান্ধীজী সব চেয়ে বেশি করিয়া ছিলেন, আর প্রমাণ করিয়া দিল যে তাঁহার সত্তা পৃথিবীর কোটি কোটি শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী নির্ধনের জীবন পরিব্যাপ্ত করিয়া ছিল। গান্ধীজীর মৃত্যুতে প্রমাণ হইয়া গেল যে একজন মহাপুরুষের পক্ষে স্বদেশ, স্বধর্ম, স্বসম্প্রদায়, স্বজাতিকে অতিক্রম করিয়া বিরাজ করা নিতান্তই সম্ভব। তাঁহার জীবনকালে যাহা সম্যকরূপে আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, মৃত্যুতে তাহা ঘটিল। কে বলিতে পারে হয়তো তাঁহার এইভাবে মৃত্যুটি তাঁহার অত্যাশ্চর্য জীবনের পরম উপসংহাররূপে অত্যাবশ্যক ছিল। আমাদের অসাড় জীবনকে যাহা স্পর্শ করিতে পারে নাই, মৃত্যুর নিদারুণ আঘাত হয়তো তাহার মর্ম ভেদ করিতে সক্ষম হইবে।

গান্ধীজীর মৃত্যুতে প্রমাণ হইয়া গেল যে বুদ্ধ ছিলেন, খ্রীষ্ট ছিলেন, গান্ধীজীর মৃত্যুতে প্রমাণ হইয়া গেল যে বিশ্বমৈত্রী কেবল কথার কথা নহে, তাহার রূপ-পরিগ্রহ সম্ভব। এই যে কোটি কোটি লোকের ব্যথার সাক্ষ্য ইহাকে মিথ্যা বলিব কী প্রকারে? প্রত্যেকেই যে ব্যক্তিগত বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিল তাহাকে মিথ্যা বলিব কী প্রকারে? প্রত্যেকেই যে মনে করিল তাহার পিতা, প্রিয়তম বন্ধু, বিশ্বস্ততম নির্ভর গত হইল—এ তো মিথ্যা নহে। চোখের জল আর যাই করুক মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। সত্যটা কী? সত্যটা এই যে একজন ব্যক্তি সাধনার দ্বারা তাঁহার জীবনকে বিশ্বজীবনে পরিণত করিতে পারে, নিজের জীবনকে অলক্ষ্যে কোটি কোটি জীবনের সহিত গ্রথিত করিয়া দিতে পারে, তাঁহার সাধনার প্রভাবে দেশ, সম্প্রদায়, ধর্ম প্রভৃতি লূতাতন্তুর ন্যায় অপসারিত হইয়া যায়। গান্ধীজীর মৃত্যুতে সবচেয়ে বেশি করিয়া প্রমাণ হইল যে বিশ্বমৈত্রীর সিদ্ধি-লাভ বর্তমান জগতে অন্ততঃ একজনের দ্বারা সম্ভব হইয়াছে।

গান্ধীজীর মৃত্যু-সংবাদে পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশ হইতে যে হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে তাহার বিবরণ সংবাদপত্রে দেখিয়াছি, কিন্তু আর্তনাদের সমস্তটা ধরিতে পারে এত অধিক, এত বড় সংবাদপত্র কোথায়? বিশেষ, সংবাদপত্রে কেবল রাজা মহারাজা, প্রধান মন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট, আমির ওমরাহদেরই আর্তি প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু যে কোটি কোটি লোক সংবাদপত্রের দৃষ্টির বাহিরে বাস করে, তাহাদের দুঃখ অবশ্যই সংবাদপত্র অবধি গড়াইয়া আসিতে পারে

নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের দুঃখ কাহারো চেয়ে কম হয় নাই, কিংবা বলা উচিত তাহাদেরই দুঃখের তীব্রতা সবচেয়ে বেশি, কারণ গান্ধীজীর মৃত্যুতে তাহাদের সর্বনাশের পাত্র পূর্ণ হইয়াছে, তাহাদের সেবক, বান্ধব, বাপু গত হইয়াছে। সংবাদপত্রেই দেখিয়াছি তাঁহার মৃত্যু-সংবাদে আট দশজন লোক হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মারা গিয়াছেন। এমন দুর্ঘটনা সংবাদপত্রের সীমার বাহিরে আরও নিশ্চয় ঘটিয়াছে। এমনটি কি করিয়া সম্ভব হয়? মৃত্যুই তো জীবনের চরম সাক্ষী। তবে তো একজন লোক কোটি কোটি লোকের পিতৃস্থানীয় হইতে পারে, বন্ধুস্থানীয়, সেবকস্থানীয় হইতে পারে। একটি ঘটনার কথা জানি। পূর্ববঙ্গের কোনো শহরে শোকসভার অনুষ্ঠান হইয়াছে। মহাত্মাজীর একখানি পুষ্পমালা-বিভূষিত প্রতিকৃতি উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সভাতে গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সভাপতির আসনের নিকটে উপবিষ্ট—চারিদিকে কিছুদূরে অন্যান্য লোকের স্থান। এমন সময়ে একজন বৃদ্ধা, হিন্দুস্থানী ভাঙ্গী রমণী মহাত্মাজীর ছবিখানির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, একদৃষ্টে সে ছবিখানি দেখিতে লাগিল, তাহার কাছে সভাতে আর কেহই নাই, কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিবার পরে হঠাৎ সেই বৃদ্ধার বক্ষভেদী একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত বাহির হইয়া আসিল—"দুনিয়া আজ খতম হো গিয়া"। এই একটি মর্মভেদী কাতরোক্তিতে কোটি কোটি অজ্ঞাত লোকের বেদনা ধ্বনিত হইয়া উঠিল—'দুনিয়া আজ খতম হো গিয়া'। লক্ষ লক্ষ লোকের পক্ষে গান্ধীজীর মৃত্যুতে দুনিয়া খতম হইয়া গিয়াছে, বিশ্বনাট্যে কালো যবনিকা পড়িয়া গিয়াছে।

বুদ্ধ, যীশু প্রভৃতি ধর্মগুরুগণের সহিত মহাত্মা গান্ধীর জীবনের একটা পার্থক্য আছে। জগতের সকল ধর্মগুরুকেই জীবনের প্রারম্ভে একটা সময় নির্জন সাধনায় অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। নির্জন সাধনার পূর্ণ সিদ্ধি লইয়া নবোদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মানব সমাজের সমক্ষে তাঁহারা উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু গান্ধীজীর জীবনে নির্জন সাধনার কোনো চিহ্নিত পর্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার পক্ষে সাধনা ও কর্ম একার্থক, কিংবা কর্মই তাঁহার সাধনা আর কর্মময় সাধনা তাঁহাকে মানব সমাজের অন্তর্গত থাকিয়া করিতে হইয়াছে, শত্রু ও মিত্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া করিতে হইয়াছে, তাই তাঁহার অভ্যুদয়ে আকস্মিকতা নাই, কলায় কলায় বিকশিত

পূর্ণচন্দ্রের মন্থর প্রত্যাশা মাত্র আছে, তাঁহার জীবনের উদয়াস্ত সমাজের চক্ষের উপর ঘটিয়া গিয়াছে।

পূর্বোক্ত ধর্মগুরুগণের সিদ্ধিকেই মাত্র জানি, মহাত্মাজীর বেলায় সাধনা ও সিদ্ধি দুই-ই আমাদের পরিজ্ঞাত। সাধনা মানে চেষ্টা, আর চেষ্টা মানেই ভ্রম-ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা। মহাত্মাজীর জীবনের অনেক ভ্রমত্রুটি আমাদের জানিত, তিনিও সে সব লুকাইতে চেষ্টা করেন নাই, খুলিয়া বলিয়া দিয়াছেন, বলিয়া দিয়া নিজেকে ও অপরকে সতর্ক হইতে বলিয়াছেন। ইহাও তাঁহার বৈশিষ্ট্য। তাঁহার সাধনার ক্রমবিকাশ সুদীর্ঘকালব্যাপী, এরূপ ক্রমবর্ধমান পরিণতি আর কোনো ধর্মগুরু বা মহাপুরুষের জীবনে দৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ, অসহযোগ আন্দোলন, কংগ্রেস ত্যাগ, গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ, আইন অমান্য আন্দোলন ও পুণা-চুক্তি, হরিজন উন্নয়ন কার্যক্রম, আগস্ট বিপ্লব, নোয়াখালি-দিল্লী সাম্প্রদায়িক শান্তি প্রচেষ্টা—প্রত্যেকটি কার্য ও পর্ব আশ্চর্যজনক এবং একটি পূর্বেকারটি অপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্যজনক। তাই মনের খেদ আর যাইতেই চাহে না যে জগতের সৌভাগ্য স্বরূপে তিনি জীবিত থাকিলে আরও কী দৈব পরিণতিই না তাঁহার জীবনে ঘটিতে পারিত! তাঁহার জীবনের কার্যসূচীকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—ভারতের স্বাধীনতা লাভ, ভারতে সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘবদ্ধতা এবং বিশ্বের বিবদমান জাতি-সমূহের মর্ত্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা। প্রথমটিতে সিদ্ধিলাভ করিয়া দ্বিতীয়টি সাধনার বেলায় তিনি নিহত হইলেন, মহত্তম কর্মসূচীতে হস্তক্ষেপের অবসর আর তিনি পাইলেন না। এখন তাঁহার জীবন-প্রভাব সেই-কাজ করিতে থাকিবে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার আর করা ঘটিয়া উঠিল না। কাজেই বলিতে চাই যে যখন তিনি লোকান্তরিত হইলেন তখন তাঁহার ক্রমপরিণতির পালা পূর্ণমাত্রায় চলিতেছিল, যাহা হইতে পারিত তাহার দীপ্তি 'যাহা-হইয়াছে'-কে সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ করিয়া দিত বলিয়াই বিশ্বাস। কিন্তু এই অর্ধ-সমাপ্ত ক্রমবিকাশটুকুও অন্যান্য ধর্মগুরুদের জীবনে দৃষ্ট হয় না। বুদ্ধ এক পূর্ণিমায় উদিত হইয়া আর এক পূর্ণিমায় অস্তমিত হইয়াছেন—মাঝখানের এক পূর্ণিমার সহিত তাঁহার সিদ্ধিলাভ জড়িত। তাঁহার জীবনের তিন মহা লগ্নে এই পূর্ণিমার সঞ্চার নিরর্থক নহে, তাঁহার জীবনটাতে পূর্ণচন্দ্রের স্বতোবিকশিত পূর্ণতা বিদ্যমান।

যীশু মরুভূমির শুক্লচন্দ্রকলা, উদিত হইয়াই অস্ত গেলেন, কিন্তু গান্ধী-চন্দ্রমার উদয়-দিগন্তের কলাবিকাশ হইতে তিথিতে তিথিতে দীপ্তির পূর্ণতরতা জানি, তারপরে ত্রয়োদশীর অন্তমুহূর্তের পরিপূর্ণপ্রায় মহিমাকেও দেখিলাম, কিন্তু এই খেদ রহিয়া গেল যে গান্ধী-মহিমার পৌর্ণমাসী আর আসিল না, ক্রমবিকাশের শেষতম দলটি উন্মীলিত হইবার পূর্বেই শশাঙ্কশুক্র সরোরুহটি ঝরিয়া পড়িল। ভালই হইল। ওই শেষ অনুন্মীলিত দলটিকে এবার যুগযুগান্ত ধরিয়া উত্তর-সাধকগণকে সাধনার প্রভাবে খুলিবার চেষ্টা করিতে হইবে। অসমাপ্ত সাধনার ভার সর্বজনের হাতে তুলিয়া দিয়া সর্বজননায়ক সরিয়া পড়িলেন। কিন্তু ইহাও কি অদৃষ্টপূর্ব? ইতিপূর্বে বারংবার রাজনৈতিক আন্দোলনের মুখে রাজশক্তি যখন তাঁহাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে লইয়া গিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, জনগণ কি তাঁহার অসমাপ্ত কার্য উদ্‌যাপন করিয়া যায় নাই? এবারে অদৃষ্ট আততায়ীর অস্ত্রে তাঁহাকে অপসারিত করিয়া লইল—তাঁহার মহত্তম কর্মটি সিদ্ধিতে লইয়া যাইবার ভার আপনিই পৃথিবীর সর্বজনের উপরে আসিয়া পড়িল। ইহার মধ্যে গান্ধী-কর্ম-কৌশল নীতির ইঙ্গিত যেন বিরাজমান। তিনি সর্বজনের আয়ত্ত সাধক, তাঁহার চরখা সর্বজনের আয়ত্ত অস্ত্র, তাঁহার সাধনাও সর্বজনের আয়ত্তগম্য। যে-স্বরাজ (পৃথিবীব্যাপী রামরাজ্য) সর্বজন-সাধ্য নহে, তাহা সর্বজনের সমস্যা সমাধানের যোগ্য বলিয়া তিনি মনে করিতেন না। স্বরাজ বলিতে তিনি সর্বজন-রাজ বুঝিতেন—সেই সর্বজনের হাতে স্বরাজ সাধনের শেষ পালাটি অর্পণ করিয়া গান্ধী-চন্দ্রমা অস্তমিত হইয়াছেন। ভালোই হইয়াছে। তাঁহার স্বরাজ-সাধনার উত্তরাধিকারী সর্বজন। এবারে তাহাদের পালা।

২১

"সেই যে চটি, দেশী চটি"

এমন সময়ে সভাস্থলে একজন অপরিচিত বৃদ্ধ ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। সভায় সভ্যসংখ্যা অযথেষ্ট, কাজেই একটি সংখ্যাবৃদ্ধিতে খুশী হইলাম। কিন্তু ভদ্রলোকের এ কী রকম পোশাক পরিচ্ছদ, একেবারেই সভার যোগ্য নয়। পরনে মোটা থান ধুতি, গায়ে মোটা বোম্বাই চাদর, পায়ে জীর্ণ একজোড়া চটি —এই দুর্মূল্যের বাজারেও পাঁচ শিকার বেশি দাম হইবে কিনা সন্দেহ। চেহারাটাও পোশাকের অনুরূপ। ছোট করিয়া ছাঁটা পাকা চুল, মস্তকের মধ্যখানে একটা দ্বীপের সৃষ্টি করিয়া বিরাজমান—চারদিক ক্ষুরে কামানো। কপালে অনেকগুলি তরঙ্গিত বলিরেখা; নাকটা মোটা : গোঁফ দাড়ি নাই; ওষ্ঠাধর পুরু কিন্তু খুব লক্ষ্য করিয়া দেখিলে সেখানে একটা কৌতুক হাস্যের আভা দেখিতে পাওয়া অসম্ভব নয়। চাদরের অবকাশে শুভ্র উপবীতের একাংশ দৃশ্যমান। অদ্ভুত লোকটি। সেকালের কোন খিড়কি খুলিয়া যেন একালে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন!

আসুন, স্যার বসুন—বলিয়া একখানা চেয়ার দেখাইয়া দিলাম। আমার ইঙ্গিত গ্রহণ না করিয়া রঙ্গমঞ্চে নৃত্যপর তরুণ তরুণীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া শুধাইলেন—কি হচ্ছে রে?

—আজ্ঞে নৃত্যনাট্য সীতার বনবাস।

—ওরা বুঝি রাম, লক্ষ্মণ আর সীতা?

দেখিলাম ভদ্রলোক একেবারে মুর্খ নন, মোটামুটি বুঝিয়াছেন।

—উপলক্ষ্যটা কী?

—স্মরণোৎসব।

—কার?

—প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগরের। আশা করি নাম শুনেছেন।

—বিলক্ষণ। কিন্তু প্রাতঃস্মরণীয়ের স্মরণ সন্ধ্যাবেলায় কেন? বেশ বেশ, আর কী কী আছে?

—অনেক আছে স্যার, একটু বস্থন, সব বলছি। এর পরে হবে "বর্ণ সংগ্রাম" বলে একটা নৃত্যনাট্য। বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়কে আমরা নৃত্যনাট্যে পরিণত করেছি কিনা। একদল সাজবে স্বরবর্ণ, একদল ব্যঞ্জনবর্ণ। প্রথমে দুই দলে লড়াই হবে, তারপরে হবে সন্ধি। এই ভাবে বর্ণপরিচয় শিক্ষার ব্যবস্থা করেছি।

—কেন, পড়ে শেখা যায় না?

—যায়, তবে নেচে শেখা আরো আনন্দদায়ক নয় কি?

—আর কি আছে শুনি?

—সব শেষে আছে "পথে পথে" নামে একটি শিক্ষাপ্রদ নৃত্যনাট্য।

—ব্যাপারটা কী?

—বালক বিদ্যাসাগর আর তাঁর পিতা বীরসিংহ থেকে কলকাতায় আসছেন। পথের 'মাইল স্টোন' দেখে বিদ্যাসাগর ইংরাজী সংখ্যা শিখছেন, এটাই নৃত্যনাট্যে প্রকাশ করা হয়েছে।

—নৃত্যনাট্যে নাচবে কে?

—সবাই নাচবে।

—বলিস কী? বিদ্যাসাগর, বিদ্যাসাগরের বুড়ো বাপ সবাই নাচবে?

—অবশ্যই নাচবে। কিন্তু এখনো তো সব শোনেন নি—মাইল স্টোন পাথরগুলোও নাচবে। সেই সঙ্গে থাকবে একখানি করে গান। এই ধরুন না একখানি মাইল স্টোন বালক বিদ্যাসাগরকে উদ্দেশ করে গাইছে—

"এই দেখো মোর বুকে
যতনে রেখেছি টুকে
ইংরাজী আখরেতে 2
এর পরে 3, 4,
নয়নে পড়িবে তোর,
কোকিলায় কুহরিবে কুঃ॥"

ভদ্রলোক বলিলেন, বেশ, বেশ। আচ্ছা, এরকম স্মরণোৎসব তোরা শুধু করছিস না আরো আছে?

—বাংলা দেশের যেখানে যত স্কুল কলেজ, পাঠশালা, সর্বত্র এইভাবে চলছে শ্রদ্ধা নিবেদন! তাছাড়া সাড়ে বাহান্ন হাজার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানেও চলছে এই রকম সভা। কেউ বোধোদয়কে নৃত্যনাট্যে পরিণত করেছে, কেউ করেছে আখ্যানমঞ্জরীকে। কিন্তু সবচেয়ে বাহাদুরি ওদের— ওরা ব্যাকরণ কৌমুদীকে নাচে গানে আবৃত্তিতে, তরুণ-তরুণীতে এমন ভর্তি করে দিয়েছে যে, দশটা দেশের 'কালচার এম্বেসেডার' দলটাকে নিজ নিজ দেশে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত।

সমস্ত শুনিয়া ভদ্রলোক এবারে যে প্রশ্ন করিলেন, তজ্জন্য প্রস্তুত ছিলাম না।

—চালের দাম কত রে?

—সরকার বলে ২৩৷৵০, বাজারে ২৬৷৴০ আনার কমে পাওয়া যায় না।

—কাপড়?

—খুব দুর্মূল্য।

—অন্যান্য দ্রব্য?

—অনুরূপ দর।

—এবারে তো দেখলাম বাহাত্তর হাজারের মধ্যে ফেল করেছে সাঁইত্রিশ হাজার। দেশটার বারো আনা এখন পরের কুক্ষিগত। উনিশ লক্ষ উদ্বাস্তু পথে পথে ঘুরছে। তবু এত আনন্দ তোদের আসে কোত্থেকে রে?

—আজ্ঞে আমরা যে জাতশিল্পী!

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু বাঁচিস কী খেয়ে?

—কালচার খেয়ে।

—কালচারেই তোদের খাচ্ছে। Culture তোদের Vulture।

—আপনি দেখছি যে স্যার নিতান্ত সেকেলে। স্যার, তেমন তেমন নাচতে পারলে পৃথিবী ঘুরে আসা যায়। অমুক কেবল পায়ের জোরে, পৃথিবী ঘুরে এলো। এহেন বস্তুর নিন্দা করবেন না। আমরা খেতে পাইনে, পরতে পাইনে, পড়তে পাইনে সত্য, হয়তো মরবো, এ-ও সত্য, কিন্তু দেখবেন স্যার আপনাদের মতো ইষ্ট-মন্ত্র জপতে জপতে মরবো না—নাচতে নাচতে মরবো।

আমার কথা শুনিয়া চটিয়া উঠিয়া বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি, তবে তাই মর্, শীঘ্র মর্ —বলিয়া একপাটি চটি আমার মাথা লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িলেন। সেই চটির আঘাতে বোধোদয় হইল, ঘুম ভাঙিয়া জাগিয়া দেখি, শিয়রের কাছে টাঙানো

বিদ্যাসাগরের ছবিখানা ছিঁড়িয়া মাথার উপরে পড়িয়াছে। মনে হইল, একটু রক্তও বাহির হইয়াছে। দেখিবার জন্য আলো জ্বালিতেই লক্ষ্য করিলাম, স্বপ্নে-দৃষ্ট ভদ্রলোকের সঙ্গে ছবিখানার বড় বেশি মারাত্মক রকমের মিল।

২২

প্রফুল্লচন্দ্র

গত মঙ্গলবারে গোলদীঘি বাগানে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মূর্তি প্রতিষ্ঠা উৎসব আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হইবার সংবাদে বুঝিলাম যে মূর্তিটি প্রাতঃস্মরণীয় আচার্যদেবের। কিছুদিন হইল মূর্তিটা ওখানে দেখিতেছিলাম, কাহার মূর্তি বুঝিতে পারি নাই, যাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়াছি তাহারাও নিশ্চয় উত্তর দিতে পারে নাই, তবে সত্য কথা বলিতে কি অন্যান্য পরিচিত অপরিচিত আট দশ জন ব্যক্তির নামের সঙ্গে আচার্যদেবের নামও অবশ্য মনে পড়িয়াছে। এক্ষণে মূর্তি প্রতিষ্ঠা উৎসবের বিবরণ পড়িয়া সকল সংশয় ভঞ্জন হইল, উহাই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মূর্তি বলিয়া বিশ্বাস করা ছাড়া আর এখন গত্যন্তর রহিল না।

আচার্যদেবকে স্বচক্ষে দেখিবার সৌভাগ্য কমলাকান্তের হইয়াছে। প্রফুল্লচন্দ্র সুপুরুষ ছিলেন না সত্য, দেহ অশক্ত ও ক্ষীণ ছিল ইহাও সত্য, কিন্তু ঐ মূর্তিটি যে সাক্ষ্য বহন করিতেছে তিনি সেরূপও ছিলেন না। মূর্তিটি অবশ্যই একটি মানুষের, কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রের নয়। আচার্যদেবের কথায়-বার্তায়, আচরণে-ব্যবহারে, কাজে-কর্মে, চলায়-ফেরায় সদাসর্বদা যে ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত হইত, সেই ব্যক্তিত্বের সমষ্টিই মানুষটি। এ মূর্তিতে তাহার লেশমাত্র নাই। এই নির্জীব, নিষ্প্রাণ মূর্তিকে সেই পরম প্রাণবন্ত পুরুষের প্রতিকৃতি বলিয়া গ্রহণ করিতে মন চাহে না। যাঁহারা এ মূর্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়াছেন, নিঃসন্দেহ তাঁহারা প্রফুল্লচন্দ্রের ভক্ত ও গুণগ্রাহী, আর এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা দ্বারা তাঁহারা সমগ্র বাঙালী সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন তাহাও নিশ্চয়। কাহারও প্রতি কোনো দোষারোপ না করিয়াও বলা যায় এ ত্রুটি ঠিক ব্যক্তিগত নয়, বোধ করি ইহা আমাদের সমাজের অভ্যাসগত ও সূক্ষ্ম শিল্পরুচির অভাবগত।

পাশেই আছে বিদ্যাসাগরের মূর্তি, যতদূর মনে পড়িতেছে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ উভয়েই মূর্তিটির নিন্দা করিয়াছেন। মূর্তিটি বিদ্যাসাগরের অবিকল প্রতিকৃতি হইলেও হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে কোথায় সেই পুরুষসিংহের পৌরুষ, কোথায় সেই বীর্য? এ যে নিতান্ত 'ভালো মানুষটি', কিন্তু বাঙালী যাহাকে 'ভালো মানুষ' বলে বিদ্যাসাগর তো তাহা ছিলেন না।

কলিকাতা শহরে ভারতীয়দের যতগুলি মূর্তি দেখিয়াছি, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের বিরাট মূর্তিটি বাদে, কোনোটিই সন্তোষজনক নয়। সুরেন্দ্রনাথের মূর্তিটিতে পৌরুষ, বিক্রম ও ব্যক্তিত্ব আছে। হাঁা, বুঝিতে পারা যায় যে, মানুষটির বুকে ঝড়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাহস আছে, প্রসারিত হস্তটি যেন ঘটনার বল্‌গা ধারণের জন্যই সৃষ্ট, সবসুদ্ধ মিলিয়া যেন একটা স্তম্ভিত ঘূর্ণিবায়ু। সুরেন্দ্রনাথের কীর্তি ও জীবনী না জানিয়াও লোকে তাঁহার চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব বুঝিতে পারে মূর্তিটি মাত্র দেখিয়া।

প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রাঙ্গণে হেয়ার সাহেবের দণ্ডায়মান মূর্তি মানুষকে স্মরণ করাইয়া দেয়—একটা মানুষ বটে! অথচ মানুষ হিসাবে বিদ্যাসাগর, প্রফুল্লচন্দ্র কেহই হেয়ার সাহেবের চেয়ে ন্যূন নহেন। তবে তাঁহাদের মূর্তি তেমন সজীব, তেমন সপ্রভ, তেমন ব্যক্তিত্বস্ফূরী হয় না কেন?

অথচ আমাদের ঢিলেঢালা ভারতীয় পোশাক সুষ্ঠু ভাস্কর্যের অনুকূল, যেমন অনুকূল রোমান টোগা। রোমান টোগাতে ভাঁজ দেখাইবার, আলোছায়ার লীলা খেলাইবার সুযোগ আছে বলিয়া অনেক ইংরাজকে ঐ পোশাকে কল্পনা করিয়া মূর্তি বানানো হইয়াছে। যতদূর মনে হইতেছে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে অবস্থিত লর্ড কর্নওয়ালিশের মূর্তি রোমান টোগায় বিভূষিত। আমাদের কোঁচা, চাদর, জোব্বা সমস্তই আলোছায়া খেলিবার প্রশস্ত ক্ষেত্র, তৎসত্ত্বেও আশানুরূপ সাফল্য ঘটে না কেন? আরও একটা কথা, মর্মর মূর্তির উগ্র শুভ্রতা বাংলা দেশের শ্যামল কোমল পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় কিনা সন্দেহ! আমাদের দেশের পক্ষে ব্রোঞ্জ ও কালো পাথরের মূর্তিই বোধ করি উপযুক্ত। দেশ স্বাধীন হইয়াছে, এখন ক্রমেই অধিক সংখ্যায় নমস্য ভারতীয়গণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা হইবে; এই সময় শিল্পের মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিলে আমাদের নগরগুলি মূর্তি-মূরতে শোভন ও প্রাণবন্ত হইয়া উঠিবে।

২৩

বিপিনচন্দ্র

সাতই নভেম্বর মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের নিরানব্বইতম জন্মবার্ষিক। ১৮৫৮ সালে তিনি শ্রীহট্ট জেলায় জন্মগ্রহণ এবং ১৯৩২ সালে পরিণত বয়সে শেষনিশ্বাস পরিত্যাগ করেন। তাঁহার শেষজীবনের সাক্ষ্য বহন করিয়া বহু লোক এখনও জীবিত কিন্তু তাঁহার প্রথম জীবনের, যখন বিচিত্র উপাদানে তাঁহার জীবন গঠিত হইয়া উঠিতেছিল, তখনকার সাক্ষ্য বহন করিবার মতো ব্যক্তি আজ বিরল। কিন্তু বিপিনচন্দ্রের চরিত্রের রহস্য বুঝিবার পক্ষে সেই সময়টিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সত্য কথা বলিতে কি সেই সময়টাই কিছু বিচিত্র ছিল। সেই সময়ের প্রকৃতি জানিতে পারিলে বিপিনচন্দ্রের প্রকৃতি জানাও সহজ হইবে।

উনিশ শতকের শেষার্ধে যাঁহারা জন্মিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে ও নবজাগ্রত দেশাত্মবোধের প্রেরণায় তাঁহাদের চরিত্র গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। উনিশ শতকের প্রারম্ভে যাঁহারা জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকটা শক্তি ব্যয় হইয়াছে খ্রীষ্টানী প্রভাবের বিরুদ্ধে ও বৈদেশিক সভ্যতার মোহের বিরুদ্ধে সংগ্রামে। এদিক দিয়া বিচার করিলে শেষার্ধে জাত ব্যক্তিগণ অনেক পরিমাণে সৌভাগ্যবান। ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব ও জাতীয়তার প্রেরণা অর্থাৎ ধর্ম ও রাজনীতিকে এক পাত্রে অন্ততঃ এক সঙ্গে গ্রহণ করিতে দ্বিধা জাগে নাই এ সময়ের মনীষীদের মনে। ইউরোপে চিরকাল ধর্ম ও রাজনীতিতে রেষারেষি, আমাদের দেশেও আজকাল তা-ই। কিন্তু যে সময়ের কথা বলিতেছি তখনকার মনীষিগণ এ দুয়ের মধ্যে বিরোধ দেখেন নাই, তাঁহাদের ধারণা হইয়াছিল যে, এ-দু'য়ে মিলন ঘটাইতে পারিলে এক্ষেত্রেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সমন্বয় ঘটিয়া ইউরোপীয় patriotism-এর বিষদাঁত ভাঙিয়া ফেলা সম্ভব হইবে। এই বিশ্বাসের বশেই তাঁহারা চলিয়াছিলেন, এই বিশ্বাসের দৃষ্টিতেই তাঁহারা দেশ ও বিদেশকে দেখিতেন এবং এই বিশ্বাসের বশেই

বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'সামাজিক প্রবন্ধ' রচনা করিয়াছিলেন। বিপিনচন্দ্র পালের জীবনও এই মিশ্রণের একটি অপূর্ব চেষ্টা। সাহিত্য রচনায় এই মিশ্রণ যত সহজ, জীবনযাপনে তাহাকে রূপ দেওয়া তত সহজ নয়। অনেকে মনে করেন আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরাণীতেও এ দুটি ভালো মিশ খায় নাই, কাজেই সহজেই অনুমেয় জীবনে মিশ খাওয়ানো আরও কঠিন। বিপিনচন্দ্রের জীবনে এ দুটির যদি সুষ্ঠু রাসায়নিক মিলন না ঘটিয়া থাকে, তবে তাহা তাঁহার শক্তির অভাবে নয়, বস্তুর প্রকৃতিগত বিরোধেই। জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক ছিলেন বিপিনচন্দ্র, কিন্তু শেষজীবনে তিনি গান্ধীপ্রবর্তিত আন্দোলনকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারেন নাই, প্রতিবাদ করিয়া লোকের অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন তাহার কারণ এইখানে। যে-কারণেই হোক তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, দুটি আন্দোলনের আদর্শে মূলগত পার্থক্য আছে—তাই তিনি প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তখনকার দিনে এই প্রতিবাদের অর্থ যে কী ছিল, কতখানি সাহসের যে প্রয়োজন হইত এখনকার লোককে তাহা লিখিয়া বোঝানো সহজ নয়। কিন্তু আর যাই হোক স্বীয় আদর্শের খাতিরে জনমতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাহসের অভাব ছিল না এই নিঃসঙ্গ বীরের বক্ষে। জনমতের বা কোনো জননেতার মতের প্রতিধ্বনি করিতে পারিতেন না বলিয়াই তিনি সারা জীবন বৈষয়িক দুর্গতি ভোগ করিয়াছেন। নতুবা তাঁহার যে শক্তি ও পাণ্ডিত্য ছিল, বৈষয়িক সমৃদ্ধি তর্জনী-সঙ্কেতমাত্রে তাঁহার কাছে উপনীত হইত। যৌবনে তিনি বন্ধুদের সঙ্গে একত্রে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে কখনো সরকারী চাকুরী করিবেন না—সে অঙ্গীকার নিতান্ত দুঃখ-দারিদ্র্যে তিনিও ভঙ্গ করিবার কথা ভাবেন নাই। এই দুর্জয় শক্তির মূলে ছিল ধর্ম ও রাজনীতির সমন্বিত প্রভাব।

রবীন্দ্রনাথকে বলিতে শুনিয়াছি যে, বিপিনচন্দ্রের মতো মনীষা তিনি অল্প লোকের মধ্যেই দেখিয়াছেন। কথাটি অত্যন্ত সত্য। ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় তাঁহার যেসব রচনা আছে তাহাতে তাঁহার মনীষার আভাস থাকিলেও পরিণত ফসল নাই, সেদিকে মন দিবার অবসর তাঁহার ছিল না, প্রত্যক্ষ রাজনীতি সে সময় হরণ করিয়াছিল। দেশজননীর উদ্দেশে তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান

এই অরচিত গ্রন্থসমূহ। তিনি ইচ্ছা করিলে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালী মনীষী লেখক হইতে পারিতেন—এইসব গ্রন্থ 'যাবচ্চন্দ্রদিবাকর' তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিত। কিন্তু সেরূপ ইচ্ছা তিনি সংবরণ করিয়া দেশজননীর পদতলে শুধু নিজেকে দান করেন নাই—নিজের অমরত্বলাভের অভিলাষকেও দান করিয়াছেন। মানুষের হাতে ইহার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আর কোন্ সামগ্রী থাকা সম্ভব!

২৪

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন

সেদিন আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের স্মৃতিরক্ষাকল্পে সভার আয়োজন হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁহার কথা মনে পড়িয়া গেল। তাঁহার শেষ জীবনে তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয়। অবশ্য আগেই তাঁহার অনেক পুস্তক পড়িয়াছি। তবু এমনটি দেখিব আশা করি নাই। গোলদীঘির কাছে পথে তাঁহার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ। মির্জাপুর স্ট্রীট ধরিয়া পুব দিকে তিনি চলিয়াছেন, গায়ে একটি পুরাতন চেস্টারফিল্ড, গলায় একখানা কম্ফার্টার, হাতে ছড়ি ছিল কিনা মনে পড়িতেছে না, তখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও নিত্য যাতায়াত বন্ধ করেন নাই। নিজ পরিচয়দানের সঙ্কোচ দূর হইতেছে না, দূরে দূরে থাকিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করা উপলক্ষ্যে সঙ্কোচ কাটাইবার চেষ্টা করিতেছি, তাঁহাকে ভালো করিয়া দেখিয়া লইতেছি। মনে হইল, তাঁহার বিহ্বল নেত্র কলিকাতার পথঘাটে যথার্থ আশ্রয় খুঁজিয়া পাইতেছে না, ঠাসাঠাসি অট্টালিকাসমূহের অন্তরালবর্তী কোনো একটা শ্যামস্নিগ্ধ পল্লীদৃশ্যকে যেন তিনি সন্ধান করিয়া ফিরিতেছেন। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কাল কলিকাতায় কাটিলেও, কলিকাতা তাঁহার গৌরবময় কর্মকেন্দ্র হইলেও, এখানে যেন তাঁহার মনের সায় ছিল না। সেই যেখানে গারো পাহাড়ের কাছে সোমেশ্বরী নদী প্রবাহিত; চাঁদমহুয়ার দল যেখানকার গাঁয়ে গাঁয়ে খেলা দেখাইয়া ফেরে; জালিয়াহাওড়ে যেখানে কেনারাম দস্যুর

দল জগন্নাথ গায়েনের গানে মুগ্ধ হইয়া হাতের খাঁড়া ফেলিয়া দণ্ডায়মান, নিজেদের করুণার হেতু নিজেরাই খুঁজিয়া পায় না; চণ্ডীদাসের পদাবলী-স্রোতে যেখানে দুঃখের রক্তকমল নিরুদ্দেশ হইয়া ভাসিয়া ভাসিয়া যায়; প্রাচীন বাংলার প্রাচীনতর গোষ্ঠগৃহে যেখানে নিমীলিত নেত্র গো-বৎসের অঙ্গলেহন করে ক্ষরিত দুগ্ধ গো-মাতা; যেখানে শামা ফিঙে দোয়েলের ঝাঁক উদ্‌গতশীর্ষ শস্যের ক্ষেত্রে ডাকাডাকি লুটোপুটি করে; বিলম্বিত খেয়ার শেষ আহ্বানে ক্লান্ত হাটুরে যেখানে গতি ত্বরান্বিত করিয়া অগ্রসর হয়; সোনার ঝারি ভরিয়া বর্ষা যেখানে স্নিগ্ধ বারিবর্ষণ করে; বারোয়াড়িতলার আসর যেখানে খোলে-করতালে উন্মাদিত; বারো মাসে তেরো পার্বণ, তেরো পার্বণে উচ্চ নীচে যেখানে গলাগলি; সেই দারিদ্র্য-মধুর, মাধুর্যে-অতল, সেই সুখ-দুঃখে অতুল, পাঁচালী-ভাটিয়ালীতে অপূর্ব, সেই প্রাচীন বাংলাকে, চিরন্তন বাংলাকে অনুসন্ধান করিয়া ফিরিত তাঁহার চক্ষু, তাঁহার মন, তাঁহার হৃদয়। নব্য বাংলা সাহিত্যের অগ্রণী লেখক হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার লেখনীর টান ছিল সেই প্রাচীন বাংলার দিকে। তাঁহার ব্যক্তিত্বে জড়িত ছিল প্রাচীন বাংলার আবহাওয়া। তিনি একালের মনে সেকালের প্রতি, সেকালের সাহিত্য ও জীবনের প্রতি একটা অনুরাগ ও কৌতূহল জন্মাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি প্রাচীন বাংলার পল্লীদূতরূপে লোষ্ট্র কাষ্ঠ লৌহময় কলিকাতা নগরীতে সার্থক প্রবেশ করিয়াছিলেন, কলিকাতায় আধুনিক সমাজের প্রাকারে প্রাচীন বাংলার নক্সা কাটা কন্থার জয়পতাকা উড্ডীন করিতে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন —ইহাই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই রহস্যটুকু বুঝিলে তাঁহাকে সাকুল্যে বোঝা হইল, এ রহস্যটুকু ফস্কিয়া গেলে বোঝা সম্ভব হইল না দীনেশচন্দ্রকে।

বড় লজ্জার বিষয় যে, এহেন মনীষী সম্বন্ধে এতকাল আমরা উদাসীন ছিলাম, এক্ষণে চৈতন্য হইয়াছে, ইহাও কম আশার কথা নয়। 'দীনেশচন্দ্র বক্তৃতামালা' প্রবর্তনের বিষয়ে প্রস্তাব হইয়াছে। সাধারণতঃ পরীক্ষায় কৃতকার্যদের স্বর্ণপদক দান করিয়া ঐরকম স্থলে স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। ঐ অর্থকেই অন্য প্রকারে ব্যয় করিবার একটা প্রস্তাব আমার মনে আসিতেছে। যোগ্য পরীক্ষোত্তীর্ণকে বাংলা দেশ ঘুরিয়া দেখিবার জন্য এককালীন টাকা পুরস্কারস্বরূপ দেওয়া চলে নাকি? স্বর্ণপদকের চেয়ে ইহার

সার্থকতা বেশি বলিয়া আমার ধারণা। যে পল্লীবঙ্গ দীনেশচন্দ্রের এমন প্রিয় ছিল সেই 'পল্লীবঙ্গ দর্শন' বৃত্তিতে তাঁহার স্বর্গত আত্মা নিশ্চয়ই খুশী হইবে। প্রস্তাবটা সম্বন্ধে ধীরভাবে বিচার করিতে অনুরোধ করি 'দীনেশচন্দ্র স্মৃতিরক্ষা কমিটি'কে।

২৫

চার্চিলের চুরুট

চার্চিলের প্রধান মন্ত্রিপদ ত্যাগ উপলক্ষ্যে অনেকে অনেক কথা লিখিয়াছেন, এমন কি যাঁহারা চার্চিলের গুণগ্রাহী নহেন তাঁহারাও লিখিয়াছেন। আসল কথা, চার্চিলের ব্যক্তিত্ব এত বিরাট ও তিনি ইতিহাসের এত দীর্ঘকাল জুড়িয়া আছেন যে, তাঁহাকে লক্ষ্য না করিয়া উপায় নাই। গুণে হোক দোষে হোক, লেখনীতে হোক লড়াইয়ে হোক, চার্চিল সকলেরই লক্ষ্যের বিষয়।

চার্চিল ও তদীয় চুরুট অভিন্ন। চুরুট ছাড়া চার্চিলকে চিন্তা করাই যায় না। চুরুট যেন তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রতীকে দাঁড়াইয়াছে। চুরুটের আকৃতি একটি জেট বিমানের মতো, আর তাহার অগ্রভাগে অগ্নি। গতি ও দীপ্তিই চার্চিল ব্যক্তিত্বের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। আবার ক্ষণস্থায়ী সিগারেটের তুলনায় চুরুট দীর্ঘকাল জ্বলে—চার্চিলও দীর্ঘজীবী। কাজেই চুরুটকে চার্চিলের প্রতীক বলিয়া আশা করি অন্যায় করি নাই।

কিন্তু চার্চিল স্বকালভ্রষ্ট। প্রথম এলিজাবেথের যুগে তাঁহার জন্মানো উচিত ছিল। সেকালে জন্মিলে তিনি এসেক্স, র‍্যালে, স্যার ফিলিপ সিডনির সহিত বেমালুম মিশিয়া যাইতে পারিতেন। সকাল বেলায় ফরাসী উপকূল হইতে হামলা করিয়া ফিরিয়া বিকাল বেলায় বই লিখিতে বসিতেন। তাঁহার বর্ণাঢ্য গদ্য রীতির ভাঁজে ভাঁজে সেকালের রঙীন পোশাক আন্দোলিত হইতেছে; তাঁহার অলঙ্কারবহুল গদ্য সেকালের কর্ণভূষণ স্মরণ করাইয়া দেয়; তাঁহার শব্দাঢ্য গদ্যে সেকালের নিত্যসঙ্গী অসি ও অন্যান্য অস্ত্রের ঝঙ্কার ধ্বনিত। একালের কানে তাঁহার গদ্য সেকেলে ঠেকে; একালের চোখে বহুমুখী

চার্চিল চরিত্রও সেকেলে লাগে ; একাল দশের যুগ, দশের মধ্যে বিশেষভাবে চোখে না পড়াতেই একালের বৈশিষ্ট্য ; মিঃ এট্‌লি লণ্ডনের জনতার চোখে পড়িবেন না, চার্চিল চোখে পড়িবেনই। যেকালে এক মানুষের মধ্যে অনেক মানুষ বিরাজ করিত, যোদ্ধা, বক্তা, সাহিত্যিক, চিত্রকর, সেই জটিল ও বিচিত্র ব্যক্তিত্বের যুগের মানুষ চার্চিল। যাঁহার প্রথম এলিজাবেথের যুগের **knight** হওয়া উচিত ছিল, তিনি হিসেবের ভুলে দ্বিতীয় এলিজাবেথের যুগের **knight** হইয়াছেন। তবু ভালো কোন রকমে শেষ রক্ষা হইয়াছে।

কোথায় যেন চার্চিলের একটা বর্ণনা পড়িয়াছিলাম—চার্চিল যেন 'তোবড়ানো গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ'। তাঁহার চেহারার এটি মন্দ বর্ণনা নয়। আর এটি তাঁহার ব্যক্তিত্বের পক্ষেও প্রযোজ্য। ঐ তোবড়ানো গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগের মধ্যে বৃটিশ ও সমসাময়িক ইতিহাসের পঞ্চাশ বছরের দলিল দস্তাবেজ রক্ষিত। পঞ্চাশ বছরের বেশি লোকচক্ষে দেদীপ্যমান থাকা ব্যক্তিত্বের সার্থক পরীক্ষা। এ রকম লোকের সংখ্যা আঙুলে গণনীয়, আপাতত শ' ও বার্ট্রাণ্ড রাসেলের নাম মনে পড়িতেছে। কিন্তু গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ এ যুগে অচল, চার্চিল যে সচল, কালস্রোতের প্রতিকূলে সচল, তাহার মূলেও ব্যক্তিত্বের প্রচণ্ড গতি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে চার্চিলের মৃত্যু হইলে, নিউইয়র্কে একবার মোটর গাড়ি চাপা পড়িয়াছিলেন, তিনি খুব সম্ভব ঐতিহাসিক ও লেখকরূপেই স্মরণীয় হইয়া থাকিতেন। কিন্তু ইতোমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসিয়া পড়িল, চার্চিলের অনন্যসাধারণ প্রতিভা এমনই একটি অসামান্য উপলক্ষ্যের প্রতীক্ষায় যেন ছিল। দেশের দুরূহতম দুঃসময়কে তিনি বাগ্মিতায় ও চারিত্র্যে দেশের '**finest hour**'-এ পরিণত করিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অগ্ন্যুচ্ছ্বাস চার্চিলকে সবলে উন্নীত করিয়া দিয়াছে, ব্যক্তি চার্চিল এখন সাহিত্যিক চার্চিলের উপরে স্থান লাভ করিয়াছে। কৃতজ্ঞ ইংলণ্ডবাসী ইতোমধ্যেই তাঁহার অমরত্বের দাবী স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

চার্চিল চরিত্রের প্রধান দোষ পাশ্চাত্য জগতের বহির্ভূত অংশকে তিনি বুঝিতে পারেন না। 'জগৎ' বলিতে তিনি বোঝেন পাশ্চাত্য জগৎ, 'সভ্যতা' বলিতে বোঝেন পাশ্চাত্য সভ্যতা, 'ধর্ম' বলিতে বোঝেন খ্রীষ্টধর্ম। এ দৃষ্টি এ যুগে চলিবার নয়, এলিজাবেথের যুগে চলিতে পারিত। এই দৃষ্টি-বিভ্রাটের

ফলে রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি অনেক ভ্রম করিয়াছেন, ভারতের স্বাধীনতার দাবী অস্বীকার তন্মধ্যে একটি প্রধান। তিনি কখনো মনেপ্রাণে ভারতের গুণগ্রাহী হইতে পারেন নাই, অথচ তাঁহার গুণগ্রাহী লোকের অভাব ভারতে নাই, এখানেই ভারতীয় দৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব।

বয়সের চাপে চার্চিল প্রধান মন্ত্রিপদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অতি দীর্ঘকাল যিনি ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠান থাকেন, ক্ষমতার কেন্দ্র হইতে বিচ্যুত হইলে তিনি নিজেকে সুখী বোধ করেন না, খুব সম্ভব চার্চিলও সুখী নন্। অবশ্য তাঁহার অপর অস্ত্র কলম আছে, তুলি আছে, বাগ্মিতা আছে, কিন্তু একসঙ্গে সকল অস্ত্র চালনায় যিনি অভ্যস্ত একটার ব্যবহারেও তিনি অস্বস্তি বোধ করেন। আর সেটাই যে তাঁর কাছে প্রধান। মন্ত্রিসভা, অগণিত সেক্রেটারী, মুহুর্মুহু নূতন নূতন সংবাদ, ক্লান্তিকারী ঘটনার সঙ্গে তাল রক্ষা, ঘন ঘন দ্রুত সিদ্ধান্ত আর সর্বোপরি রুদ্ধশ্বাস সদস্য-পরিপূর্ণ পিন-পতন-শ্রুতি-যোগ্য নিস্তব্ধ পার্লামেণ্টে সহসা গাত্রোত্থান, অভাবিত সংবাদ প্রদান, 'হুড নিমজ্জিত', 'আক্রমণকারী বিসমার্ক নিমজ্জিত', 'ডানকার্ক অভিযান সমাপ্ত', 'নরম্যাণ্ডির উপকূলে মিত্রপক্ষের অবতরণ', আবার কখনো বা চার্চিলীয় রঙ্গব্যঙ্গে তুমুল হাসির হররা! এককালে এ সমস্তর অবসান ঘটিয়া গেল। এখন সহায় কেবল লেখনী আর তুলি। আর সহায় চিরসঙ্গী ধূমায়িত চুরুট। ঐ ধূম দেখিয়া লোকে বুঝিবে চার্চিলের চুরুট নেভে নাই। মিঃ চার্চিলের চুরুট শীঘ্র না নিভুক।

২৬

শারদীয়

পূজার ছুটিতে কেন বাহিরে ছুটিয়া আসি লোককে ভালো বুঝাইতে পারি না। কেহ মনে করে স্বাস্থ্যান্বেষণে, কেহ মনে করে দেশ ভ্রমণে, কেহ আর কিছু—এ সমস্তই আংশিক সত্য। আসল কথা ভিন্ন। দীর্ঘকাল নাগরিক জীবনযাপন করিলে ভিতরে ভিতরে যে অপূরণীয় ক্ষতি হইতে থাকে নিতান্ত অভ্যস্ত না হইয়া গেলে তাহা না বুঝিবার মতো নয়। বাংলা দেশে ষড় ঋতুর

মেখলা খুব সম্পূর্ণ নয়, বসন্ত ও শীতের মূর্তি আবছায়া মাত্র। গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরৎ বাংলা দেশের প্রধান ঋতু। তার মধ্যে নাগরিক জীবনের কৃপায় শরৎকালের সৌন্দর্য লুপ্তপ্রায়। সত্য কথা বলিতে কি শরৎমাধুরী প্রত্যক্ষ করিবার আশাতেই পূজার ছুটিতে শহর হইতে ছুটিয়া চলিয়া আসি, যেখানে উদাস প্রান্তরের উপরে অসীম আকাশের নীলকান্ত পাত্রটা একেবারে উপুড় হইয়া পড়িয়া এক দিগন্তে মিলিয়া গিয়াছে।

এখানে বারান্দায় বসিয়া আছি—সম্মুখে আকাশ যে পট মেলিয়া ধরিয়াছে তাহার প্রান্তে "ধৌত শ্যামল আলো ঝলমল বনগিরি পর্বতে" একটি অলৌকিক আভা কম্পমান; তার নীচে শাল পিয়াল বনের একটি বিস্তৃত নীল পাড়; তার পরে সমতল ভূমিতে "ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায় লুকোচুরি খেলা"—আর সবশেষে প্রান্তরটা গড়াইয়া নামিয়া যেখানে অকস্মাৎ শেষ হইয়া গিয়াছে, সেখানে নদীগর্ভে জলে আর বালুকাতে সমান ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে—নদীর এপারে বন্ধুর ভূমির চূড়ায় আমার বাড়িটি। এ দৃশ্য কি দেখিবার মতো নয়? এ দৃশ্য কি বৃহৎ নগরে থাকিলে দেখিতে পাওয়া যায়? এ দৃশ্যের মাধুরী ও মূল্য যে সহজে না বুঝিবে, তাহাকে বুঝাইব এমন শক্তি নাই।

পাঠক সত্য কথা বলিতে কি ষড় ঋতু ষড় মাতৃকার মতো আমাকে লালন করিলেও শরতের মাতৃমূর্তির প্রতিই আমার টান কিছু অধিক। বর্ষা বিরহীর, বসন্ত কবির, শিশির ভোগীর, গ্রীষ্ম ও হেমন্ত কাহার জানি না, শরৎ বালকের প্রিয়। আমার বাল্যকালে সেই যে শরৎ তাহার দুই হাতের দশটি কোমল অঙ্গুলিতে আমাকে ধরিয়াছিল, আজও সেই বন্ধন সমান অটুট আছে। পূজাবকাশ, শেফালি ফুল, কাশ কুসুম, শিশির, কচিধানের ক্ষেত, নীল নির্মল আকাশ এবং ভরানদীর ধারা মিলিয়া একদা যে জাদুমন্ত্র পড়িয়া দিয়াছিল—আজও, এতকাল পরেও, তাহার একটি অক্ষরও নিরর্থক হইয়া যায় নাই। এখানকার অবাধ প্রান্তরে আসিয়া পৌছিলে সেই চিরকালের বালকটা আর একবার খেলা করিবার সুযোগ পাইয়া ধন্য হয়।

রবীন্দ্রনাথের শারদোৎসব নাটিকা আমার শারদীয় মেঘদূত কাব্য। কালিদাসের মেঘদূতের একটা লক্ষ্য ছিল, এ মেঘদূত একেবারেই লক্ষ্যহীন, নিজেকে লইয়া অকারণে মাতামাতি করাই ইহার লক্ষ্য—যদিচ ইহাকে লক্ষ্য বলা যায় কিনা সন্দেহ। শরৎ ঋতু ছুটির কাল, শারদোৎসব ছুটির কাব্য।

ইহার রাজারও ছুটি, মেঘেরও ছুটি, বালক দলেরও ছুটি, উত্তরে হাওয়াটাও ছুটি-পাওয়া; এমন কি কৃপণ লক্ষেশ্বরও বাণিজ্যযাত্রার অজুহাতে ছুটি উপভোগের কল্পনা করিয়া থাকে, কেবল সকলের দায়িত্ব একা ঘাড়ে বহন করিয়া বালক উপানন্দ কাজে মগ্ন—সে যেন ছুটির জাহাজের জল মাপিবার খালাসী, সকলের ছুটির পথ সুগম করিয়া তুলিবার আশাতেই সে বেচারী কাজে মগ্ন।

এই অপূর্ব রচনাটির প্রত্যেকটি শব্দ নিঙড়াইলে শুভ্র শীতল শিশিরকণা ঝরিয়া পড়িতে থাকে; ইহার বাক্যগুলিতে কাশবনের হিল্লোল; ইহার গান-গুলি নির্মল নদীজলে শুভ্র মেঘের ছায়ার মতো ভাসমান, আর সেই গানের সুরে রহিয়া রহিয়া প্রথম শীতপবনস্খলিত শেফালি ও মালতীকুসুম ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ে। শারদশ্রীর এমন বিকাশ আর কোথায় দেখিয়াছি।

"ঝরা মালতীর ফুলে
আসন বিছানো নিভৃতকুঞ্জে
ভরা গঙ্গার কূলে
ফিরিছে মরাল ডানা পাতিবারে
তোমার চরণ-মূলে।"

এমন সার্থক চিত্র আর কোথাও আছে কি? প্রত্যেকটি শব্দের জন্য হাজারখানা মোহর গুনিয়া দিলেও ইহার ইহার যথার্থ মূল্য হয় কি! কাল নিরবধি এবং পৃথিবী বিপুলা কাজেই কোথাও তুলনা থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু আমার চোখে তো পড়ে নাই। এমন কাব্যকে যদি বাল্যকালের মেঘদূত বলি তবে অন্যায় করিয়াছি কি! আর সেই মেঘদূতের লীলাভূমি দেখিবার আশায় যদি শহর হইতে দূরে আসিয়া থাকি, তবে কি খুবই অন্যায় করিয়াছি! সংসারে যে-সব কথা না বলিলেও বুঝা যায় আর বলিয়াও বোঝানো যায় না—এটি তেমনি একটি কথা।

২৭

কমলাকান্তের দিল্লী দর্শন

ইতিহাস যদি কোথাও প্রত্যক্ষ মূর্তিতে বিরাজ করে তবে তাহা দিল্লীতে দিল্লী সহরে ইতিহাস প্রকট। এখানকার হর্ম্যে, অট্টালিকায়, মসজিদে মন্দিরে, মিনারে, স্তম্ভে অতিপ্রচুর ধ্বংসাবশেষে ভারতবর্ষের সুদীর্ঘকালের ইতিহাস ইষ্টক প্রস্তরের স্বরব্যঞ্জনে লিখিত হইয়া আছে। ওয়াটার্লুর যুদ্ধ-ক্ষেত্রের বর্ণনা উপলক্ষ্যে বায়রণ লিখিয়াছেন যে, সেখানে সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ নিহিত। ওটা কবিত্বমাত্র। দিল্লীর সম্বন্ধে কথাটা সম্পূর্ণ সত্য। হাজার বছর ধরিয়া মানুষে যত সাম্রাজ্যকীর্তি স্থাপন করিয়াছে, যে-সব পাষাণে আপন দম্ভ ও মহিমা স্তম্ভিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছে, সে-সব বক্ষে ধারণ করিয়া দিল্লী অপরূপ এবং অপূর্ব। এখানকার দীনতম ব্যক্তির কুটীরখানিও দীন নয়, হয়তো কোন ওমরাহের, হয়তো কোন সুলতান কি বাদশাহের প্রাসাদ তাহার ভিত্তি। এখানে মানুষ অজ্ঞাতসারে প্রাচীন ঐশ্বর্যের উপরে পদক্ষেপ করিয়া বিচরণ করিতেছে। যে-ইতিহাস কালের অতলে নিঃশেষে তলাইয়া গিয়াছে দিল্লী সহর তাহারি নেপথ্য, আর সতত সঞ্চরমাণ ধূলার পর্দা ক্ষণে ক্ষণে তাহার উপরে যবনিকা টানিয়া দিতেছে, এ ধূলা বালুকণামাত্র নয়, বিস্মৃতির উপাদানে তাহা ধূসর।

দিল্লী সহরের একটি চারতলা বাড়ীর ছাদে উঠিয়া দিগন্ত অনুসরণ করিয়া চোখ ঘুরাইয়া লইলাম। লাল কেল্লা, জুম্মা মসজিদ্, হুমায়ুনের কবর, রাষ্ট্রপতি ভবন, ইণ্ডিয়া গেট, পার্লামেণ্ট ভবন, বিড়লা মন্দির, সিপাহী বিদ্রোহের স্মৃতিস্তম্ভ সমস্ত দৃশ্যমান; একটু নিরিখ করিয়া দেখিলে কুতুব মিনার এবং সূক্ষ্ম রেখাপ্রায় অশোকস্তম্ভটাও দেখিতে পাওয়া যায়।

হিন্দু যুগ, পাঠান যুগ, মুঘল যুগ, বৃটিশ যুগ এবং অত্যাধুনিক যুগ যেন সারি সারি, হাতে হাতে ধরিয়া দণ্ডায়মান। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্ব এমন কোথায় আর সুপ্রকট? এ যেন ইতিহাসের নীরব শোভাযাত্রা। দিল্লী সহর ভারত ইতিহাসের প্রশস্ততম, শ্রেষ্ঠতম এবং সবচেয়ে প্রত্যক্ষ **text book.**

পৌরাণিক কাল, ঐতিহাসিক কাল এবং আধুনিক কালের ত্রিবেণী-সঙ্গমে প্রতিষ্ঠিত দিল্লী নগরের ব্যক্তিত্ব বিরাট ও বিচিত্র ভারতবর্ষের যেন প্রতীক। ভারতবর্ষে আরও সুন্দর, প্রাচীন ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নগর নগরী আছে সত্য, কিন্তু বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সাকুল্য ভারতেতিহাসের প্রতিনিধিত্ব করিবার দাবী দিল্লীর যেমন এমন আর কাহারো নয়। ইউরোপে রোম, ভারতে দিল্লী। এ দুই সহর ইতিহাসপ্রবাহের গোমুখী কন্দর। ইহাদের প্রবাহ চিরন্তন। কান পাতিয়া শুনিলে, এখানকার হীনতম প্রস্তরখণ্ডে, শঙ্খে সমুদ্র-স্বননের ন্যায় ইতিহাসের গুঞ্জন শুনিতে পাওয়া যায়। সমুদ্রসৈকতশায়ী শুক্তির মতো এখানকার পথে ঘাটে বিনিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড ইতিহাসের বিচিত্র লীলায় রঞ্জিত। ইতিহাসের উপল সংগ্রহের এমন স্থান আর নাই।

কুতুব দেখিয়া আসিলাম। ছবিতে দেখিয়া স্তম্ভটাকে জীর্ণ মনে হয়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নয়। লালপাথরে নির্মিত মিনারটি আশ্চর্যরকম নূতন, সবে যেন বাঁশের ভারা সরাইয়া লওয়া হইয়াছে। কুতুব মিনার কাহার তৈয়ারি, কেন তৈয়ারি, একজনের না অনেকের তৈয়ারি, পৃথ্বীরাজ গড়িয়াছিলেন কিনা এ-সব বিষয়ে মতভেদের অন্ত নাই। কিন্তু ইহার শালপ্রাংশু বলিষ্ঠ সুষম সৌন্দর্য সম্বন্ধে সকলেই একমত।

এখানে এক বুড়া মুসলমান ছিল। যাত্রীদের সুবিধার জন্য সে উত্তম cutlet প্রস্তুত করিয়া দিত। লোকে cutlet হুকুম করিয়া কুতুবে উঠিত এবং নামিয়া আসিয়া সেই cutlet খাইয়া আরোহণ অবরোহণের ক্লান্তি দূর করিত। কুতুবের সেই cutlet নাকি কুতুবের মতোই বিখ্যাত ছিল। লোকটা পালাইয়াছে। এখনো অবশ্য cutlet পাওয়া যায়, কিন্তু তেমনটি নাকি আর হয় না। দিল্লীতে মিনার অনেক আছে কিন্তু কুতুবের মতো আর হইল না; দিল্লীতে cutlet-এর অভাব নাই, কিন্তু সেই বুড়ার cutlet-এর মতো আর কেহ তৈয়ারি করিতে পারে না। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাচীন শিল্প সকল ক্রমে লোপ পাইতেছে। হায় কুতুব, হায় কাটলেট, তোমরা দু'জনেই দেখিতেছি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া রহিলে।

কুতুব-মিনারের পাশেই একটি লোহার স্তম্ভ আছে। গোড়ায় খুব সম্ভব ইহা এখানে ছিল না। তারপরে আর কেহ আনিয়াছে, স্তম্ভটি একটি পাথরের পাদপীঠে প্রোথিত। স্তম্ভটি লোহার, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এতকাল

পরেও ইহাতে এতটুকু মরিচা পড়ে নাই। স্তম্ভটি কত প্রাচীন কেহ জানে না; উহার গায়ে যে লিপি আছে, তাহাতে জানা যায় চন্দ্র নামে কোন রাজা নিজের কীর্তির অবিস্মরণীয় চিহ্নরূপে তাহা নির্মাণ করিয়াছিলেন, বোধ করি দুই হাজার বছর আগে। অধিকাংশ অবিস্মরণীয় কীর্তির যাহা পরিণাম হয়, এক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই, রাজা চন্দ্র ও তাঁহার কীর্তি এখন বিস্মরণের অগাধ জলে গিয়া পড়িয়াছে, সুধীবর গবেষকগণও জাল ফেলিয়া বিশেষ কিছু উদ্ধার করিতে পারেন না।

এই স্তম্ভটি সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী আছে। কোন ব্যক্তি স্তম্ভটি মাটি হইতে খুঁড়িয়া তুলিলে তাঁহার রাজ্য নষ্ট হইবে। কোন এক হিন্দু রাজা এই অপরাধ করায় তাঁহার রাজ্য নাকি হস্তচ্যুত হইয়াছিল। যাই হোক, এইরূপ হঠকারিতা করিয়া রাজ্য হারাইবার ইচ্ছা আমার ছিল না, কাজেই স্তম্ভটি যেমন খাড়া ছিল, তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল।

স্তম্ভটি সম্বন্ধে আরও প্রবাদ এই যে, মাটির বন্ধন হইতে উহাকে আল্‌গা বা ঢিল করিবার কিম্বদন্তী হইতেই স্থানটির নাম ঢিল্লী বা দিল্লী হইয়াছে।

আমার নিজের ধারণা দিল্লী শব্দের মূলে সংস্কৃত 'দেহলী' শব্দ। দেহলী হইতে বাঙলা 'দেউড়ি' শব্দের উৎপত্তি। পাঞ্জাব হইতে হিন্দুস্থানে প্রবেশের দেউড়ি বা প্রবেশদ্বার এই অঞ্চলটি। কিন্তু কমলাকান্তের এই গবেষণায় পণ্ডিতগণ হাসিবেন এবং অপরে বিস্মিত হইবে, অতএব থাক।

কুতুব-মিনারের কাছেই আর একটি কীর্তি-স্তম্ভের অসমাপ্ত একটি ভ্রূণ আছে। কুতুবের উচ্চতাকে জয় করিবার উদ্দেশ্যে কোন এক সুলতান একটি উচ্চতর মিনার প্রস্তুত করিতে লাগিয়াছিলেন, তাহার প্রাথমিক অংশটা বর্তমান। লোকে বলে ইহা নাকি আলাউদ্দিন খিলজির কাজ। উক্ত সুলতানের রাজনীতি অবশ্যই মাথাভারি ছিল। কিন্তু মহম্মদ তোগলক হইলেই মানাইত ভালো। তাঁহার হয়তো ইচ্ছা ছিল নিজের কীর্তির উচ্চতর মিনারের উপরে অধিষ্ঠিত হইয়া কুতুবের দিকে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন। কিন্তু অবস্থাচক্রে নূতন মিনার কুতুবের জানু ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই।

এই অঞ্চলে ফিরোজ তোগলক কর্তৃক নির্মিত একটি বিদ্যায়তনের ধ্বংসাবশেষ আছে। ফিরোজ নিজে পণ্ডিত ছিলেন, তাই বিদ্যার মূল্য জানিতেন। যখন অন্য সব সুলতান মিনার, মসজিদ, বিলাসভবন বা নিজের

কবর প্রস্তুত করিতেন, তখন তাঁহাদেরই একজনের পক্ষে বিদ্যায়তন নির্মাণ, বিস্ময়ের বিষয়। এই বিদ্যায়তনেরই এক প্রান্তে ফিরোজের কবর।

এই বিদ্যায়তনের নিকটে একটি প্রকাণ্ড দীঘি আছে, বর্তমানে সম্পূর্ণ শুষ্ক। দেখিলাম উহার তলদেশে চাষ হয়, এখন শস্যশূন্য, গোরু চরিতেছে। তৈমুর জল পাইবার আশায় ইহার তীরে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। দীঘিটি এত বড় যে, বাবরের মতো সুদক্ষ তীরন্দাজও তীর ছুঁড়িয়া এপার-ওপার করিতে পারেন নাই।

হুমায়ুনের কবর বোধ করি দিল্লীর সবচেয়ে গম্ভীর অট্টালিকা। ইহাতে তাজের বিষাদ আছে, কিন্তু তাজের কোমলতা নাই; ইহাতে তাজের বিশালতা আছে, কিন্তু তাজের বিলাস নাই; হুমায়ুনের কবরে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত মুঘল সাম্রাজ্যের উদ্যম ও বীর্য, আর তাজে মুঘল সাম্রাজ্যের আসন্ন অবসানের সৌন্দর্য ও করুণা; হুমায়ুনের কবর আশা, তাজ দীর্ঘশ্বাস; তাজ লিরিক, হুমায়ুনের কবর মহাকাব্য; স্থাপত্যনীতির বিচারে তাজের প্রথম খসড়া হুমায়ুনের কবর।

হুমায়ুনের কবরে আরোহণ করিয়া বাদশাহগণ যমুনা দেখিতেন, আমরাও দেখিলাম, আমাদের বাদশাহী ঐটুকু। যমুনা দেখিয়া মনে পড়িল—'যমুনে, এই কি তুমি সেই যমুনা-প্রবাহিনী?'

শাজাহানের প্রিয় কন্যা জাহানারার কবর দেখিয়া আসিলাম, খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়, এমনি দীন অবস্থায় আছে। তবে বাদশাজাদীর একটি ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, তাঁহার কবরের উপরে যেন শ্যামল তৃণ গজায়। সত্যই তাঁহার কবর তৃণে আচ্ছাদিত। আমরা তৃণের উপরে ফুল ছড়াইয়া দিলাম, ফুল হাতে লইয়া গিয়াছিলাম।

২৮

"শিলঙ নামক পর্ব্বতে"

অবশেষে ডিগবয় হইতে শিলঙ আসিয়া পৌছিলাম, দেখি যে ডিগবয়ের বৃষ্টি আগেই শিলঙে আসিয়াছে। এখানকার রোদও ভালো, শীতও ভালো ; কিন্তু বৃষ্টি কিছু নয়, মাঘ মাস ও শ্রাবণ মাস একত্র হইলে যেমন হয় অনেকটা তেমনি। নকূড় মামার কথা মনে পড়ে, কেন হে এখানে সব আসে ? ঠাণ্ডা চাই ? তা বরফের চাঙড়ের উপরে অয়েল ক্লথ পেতে বসলেই হয়। কিন্তু শুধু বসিলে চলিবে না, গায়ে বর্ষাতি থাকা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু গিরিদেব একেবারে অপ্রসন্ন ছিলেন না, তাই দেখিলাম যে বৃষ্টিরও দয়ামায়া আছে, সকাল বেলায় বৃষ্টি, বিকালে পরিষ্কার আকাশ .মেঘ-নিকানো তক্‌তকে। তখন মনে হয় বাংলা দেশের শরৎকালের ভূত পাহাড়ের ঘাড়ে চাপিয়াছে।

শিলঙের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহার পরে কলম চালনা প্রায় অসম্ভব, বড় জোর টীকা ভাষ্য মাত্র করা চলে। সহরের কতকটা অংশে বাড়ীঘর দোকান পাট গঞ্জ বাজার বেশ হাত পা ছড়াইয়া বসিয়াছে, কিন্তু দু'চার পা দূরে গেলেই নগাধিরাজের রাজত্ব, সেখানে শ্যামল প্রান্তর, চঞ্চল ঝরণা, পাইন বন, হাজার ফুল ও পাখীর ডাক। গল্‌ফ খেলার মাঠের দিকে নামিয়া আসিলে শিলঙ গিরি ও সহরকে চিত্রার্পিতবৎ দেখায়—সন্ধ্যা হইবামাত্র উচ্চাবচ ভূখণ্ডে নিত্য দীপালির লক্ষ বাতি জলিয়া ওঠে। ওখানে গিয়া আমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকি। মনটা কখন শকুন্তলার অঙ্গুরীয়ের মতন খসিয়া গিয়া চুপ করিয়া অতলে তলাইয়া যায়।

দার্জিলিঙ ও শিলঙ দুই-ই দেখিয়াছি। কোন্‌টি ভালো কোন্‌টি মন্দ বলা কঠিন, কারণ দুয়ের রস ভিন্ন। দার্জিলিঙ সৌন্দর্যের epic, শিলঙ সৌন্দর্যের lyric ; দার্জিলিঙের মহৎ বিস্ময় মনকে মুগ্ধ করিয়া দেয়, শিলঙের মুগ্ধ সৌন্দর্যে মন চঞ্চল হইয়া ওঠে, দার্জিলিঙে ভাষা মূক, শিলঙে মূক ভাষা পায়, দার্জিলিঙ হিমবাহ (glacier), শিলঙ ঝরণা, দার্জিলিঙের গিরিমালা সকল

বিভূতি সম্পন্না পর্বতকন্যা পার্বতী, সেখানে চপলতার স্থান নাই, শিলঙের পাইনবল্লভা গিরিশ্রেণী অরণ্যচারিণী চিত্রাঙ্গদা, অর্জুনের চিত্ত উতলা করাই যাহার ব্রত ; শিলঙের শোভা সমুদ্রে চন্দ্রোদয়, সমুদ্রকে চঞ্চল করিয়া তোলে। দার্জিলিঙের শোভা সমুদ্রে সূর্যোদয়, সমুদ্র এমনি অভিভূত হয় যে চঞ্চল হইবার কথা তাহার মনেও পড়ে না, দার্জিলিঙ বাল্মীকির মহাকাব্য, শিলঙ রবীন্দ্র-নাথের মহতী কবিতা।

পাঠকের বোধ হয় এসব কবিত্ব ও উপমা বড় ভালো লাগিতেছে না, কিন্তু কি করিব, সে সৌন্দর্য উপমা ছাড়া বোঝানো কঠিন, উপমাযোগেও বোঝানো যায় কিনা সন্দেহ, তার উপরে আবার রবীন্দ্রনাথ 'শিলঙের চিঠি' লিখিয়া সঙ্কীর্ণ সুযোগটুকুও বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাই এই ব্যর্থ টীকাভাষ্যের প্রচেষ্টা। কবিত্ব ছাড়া বলিতে গেলে বলিতে হয়—"মোটের উপর শিলঙ ভালোই যাই না বলুক নিন্দুকে।" কিন্তু শিলঙের কেহ নিন্দুক আছে কি ? তবে বুঝি কমলাকান্তেরও নিন্দুক সম্ভব !

২৯

যার পরে আর রেল নাই

রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে তেলের সহর ডিগবয়ে আসিয়াছি—ডিগবয় আসামের তথা ভারতের পূর্বতম প্রান্তে অবস্থিত। এদিকে আগে কখনো আসি নাই—যাতায়াত দুঃসাধ্য বলিয়া নিতান্ত দায়ে না পড়িলে কেহ এদিকে বড় আসে না। কলিকাতা হইতে রেলপথে তিন রাত দুই দিনের পথ। বিমানযোগে অবশ্য এক দিনের মধ্যেই আসা যায়, কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি পাখী ছাড়া যে সব বস্তু আকাশে বিচরণ করে তাহার প্রতি আমার তেমন আস্থা নাই, তাহারা অনেক সময়েই গন্তব্যস্থানের চেয়ে অনেক বেশি দূরে লইয়া যাইতে অভ্যস্ত। তা ছাড়া, বিমানে দেখিবার কিছুই নাই, বৈচিত্র্যহীন আকাশ সর্বত্রই সমান। আর আমার পথের শেষটাই যে লক্ষ্য তা নয়, 'পথের দু'দিকে আছে মোর দেবালয়।' গৌহাটি হইতে ডিগবয় পর্যন্ত পথের

দুদিকের অরণ্যে ভীষণ, পাহাড়ে দুর্গম পথ এমন সুন্দর যে, না দেখিলে সে 'লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি।'

এখানে বিশ্বাস পরিবারের গৃহে আমি অতিথি—তিনি এখানকার একজন অফিসার। একদিন তাঁহার সঙ্গে মোটরে ভ্রমণে বাহির হইলাম, বলিলাম ভারতের শেষ রেল ষ্টেশন দেখিব। মোটর সেই দিকেই চলিল। ডিগবয়ের পরে মার্ঘেরিটা নামে এক রেল ষ্টেশন—এটি ব্যবসার স্থান। ডিহিং নদী পার হইয়া মোটর চলিল, লিডো ভারতের শেষ রেল ষ্টেশন। লিডোর পরে খানিকটা রেলপথ আছে। কিন্তু কোন ষ্টেশন নাই, কয়লা খনির মাল বহনের জন্য রেলপথটুকু আছে। ক্রমে সেটুকুও শেষ হইয়া গেল—যার পরে আর রেল নাই। এবারে সেই বহুবিশ্রুত ষ্টীলওয়েল সড়ক আরম্ভ হইল। এক স্থানে একটি বড় sign board-এ ষ্টীলওয়েল পথের সূচনা বিজ্ঞাপিত। প্রথম ঘাটি জয়রামপুর ১৫ মাইল দূরে, শেষ ঘাটি চীনের কুনমিং সহর হাজার মাইলের অধিক। ষ্টীলওয়েল পথ ধরিয়া চলিয়াছি, দক্ষিণে পাটকাই গিরিশ্রেণী—অরণ্যে দুরূহ। আরো দুটি গিরিশ্রেণীর পরে ব্রহ্মদেশের সীমান্ত, একেবারে ঠিক সীমান্ত নয়, দুই দেশের মাঝখানে খানিকটা বেওয়ারিশ ভূখণ্ড বা no man's land আছে। পথের মাঝে মাঝে তল্লাসী করিবার আড্ডা, এ পথে বিদেশ হইতে আফিং, সোনা প্রভৃতি চোরাই আমদানী হয় বলিয়া এই ব্যবস্থা। টিরাপ নামে একটি নদী পার হইলাম, নদীটির নামে পূর্বদিকের অংশটার নাম Tirap Frontier Division—এটা NEFA বা নর্থ ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার এজেন্সির একটা অংশ। জয়রামপুর আর পাঁচ মাইল সাইনবোর্ড ঘোষণা করিল, ঐ পর্যন্ত বিনা অনুমতিতে যাওয়া চলে; তারপরে নানা রকম বিধিনিষেধ।

দশ গজ চওড়া ষ্টীলওয়েল পথের বামে অরণ্য, দক্ষিণে পাটকাই গিরিমালা, মাঝে মাঝে দুরন্ত সব পাহাড়ী নদী। এই পথটাই সভ্যতার একমাত্র চিহ্ন ও বাহন, তা ছাড়া আছে সব সর্পিল গিরিপথ, তাহাতে মানুষের ও শ্বাপদের, বিশেষভাবে হাতীর সমান অধিকার। এদিকের সবচেয়ে ভীষণ প্রাণী শঙ্খচূড় সাপ ও হাতী, বাঘও যথেষ্ট, তবে তাহারা নাকি নরঘাতক নয়। কথাটির সত্যতা যাচাই করিবার ইচ্ছা ছিল না তাই সন্ধ্যার আগেই ফিরিলাম। যাহা দেখিবার সাধ ছিল দেখিলাম, ভারতের শেষ রেল ষ্টেশন

দেখিলাম, যারপরে আর রেল নাই। আর দেখিলাম প্রকৃতির রুদ্র সৌন্দর্য, এখানকার প্রকৃতি যেন বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা, কাপালিকের পালিতা, তাই সমস্ত ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটি ভয়াল রহস্যময়তা বহন করিতেছে। বাংলা দেশের নবকুমারকে সহজেই মুগ্ধ করিয়া ফেলে।

ডিগবয় তেলের সহর নামে বিখ্যাত। কিন্তু এমন তরুঘন, পুষ্পবহুল, শ্যামল, পরিচ্ছন্ন সহর অল্পই দেখিয়াছি। বাংলোর বারান্দায় বসিয়া আছি, ক্ষণে বৃষ্টি ক্ষণে রোদ, পাখীর ডাকাডাকি, বাতাসের মাতামাতি—আর বাগানের ম্যাগনোলিয়ার গন্ধ। কে বলিবে পেট্রলিয়ামের সহর। সহরের মাঝখানে অবশ্য প্রকাণ্ড তেলের কারখানা, কিন্তু তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করি নাই। গিরিমালা ও অরণ্যবেষ্টিত সহরটির উঁচু নীচু টিলার উপরে অবস্থিত বাংলোগুলি সহজেই সমতলবাসী আমার মনোহরণ করিয়াছে।

ডিগবয় ইণ্ডিয়ান ক্লাব রবীন্দ্র জন্মোৎসবের উদ্যোক্তা। তাঁহাদের আহ্বানেই আসিয়াছি। নৃত্যগীত অভিনয় বক্তৃতাদিযোগে চারদিন ধরিয়া সকলে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন, আমিও ভক্তির একটি ক্ষুদ্র ঝরণা যোগ করিয়া দিলাম। দিল্লী হইতে ডিগবয় কত স্থানেই না এই উপলক্ষ্যে ঘুরিয়াছি—রবীন্দ্র সাহিত্যের গুণে বাঁধা পড়িয়া অসহায় নৌকার মতো। রবীন্দ্র সাহিত্য কত দেশের সহিত, কত সমাজের সহিত না আমাকে মিলিত করিল। "কত অজানারে জানাইলে তুমি, কত ঘরে দিলে ঠাঁই, দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই।" রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠের ইহা একটি শ্রেষ্ঠ পুরস্কার, যেখানে কখনো যাইবার কথা নয়, যাহাদের কখনো জানিবার কথা নয়, সেখানে গেলাম, তাহাদের জানিলাম, মানুষের সহিত মানুষকে মিলিত করাই যদি সাহিত্যের লক্ষ্য হয়, তবে রবীন্দ্র-সাহিত্যের সূত্র ধরিয়া তাহা কতক উপলব্ধি করিলাম। "এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম জন্মান্তর।"

৩০

চোখ গেল চোখ গেল

খুব ভোরে জাগিবামাত্র আলো অন্ধকারের আবছায়া ভেদ করিয়া কানে ঢুকিল 'চোখ গেল' রব। অস্পষ্ট মিশ্র কাকলির মধ্যে ঐ তীব্র তীক্ষ্ণ ব্যাকুল ধ্বনি সুপ্ত আকাশের মনটাকে যেন খোঁচা মারিয়া জাগাইবার চেষ্টা করিতেছে, 'চোখ গেল, 'চোখ গেল'। অনেক দিন আগে পল্লী ভবনে গমনের পথ যখন অনবরুদ্ধ ছিল তখন এমনি ভোরের প্রদোষান্ধকারে রেল ষ্টেশনে নামিবামাত্র চারিদিকে গাছপালার মধ্য হইতে অস্পষ্ট কাকলি কানে আসিত, আর সমস্ত ছাপাইয়া উঠিয়া কানে আসিত ঐ আকুল ব্যাকুল মর্মভেদী 'চোখ গেল, চোখ গেল' ধ্বনি। আজ এত দিন পরে এত দূরে বসিয়া সেই পরিচিত স্বর শুনিয়া সমস্ত মনটা বিকল হইয়া গেল।

বাংলা দেশে তো কত পাখীই আছে, আছে কত পাখীর কণ্ঠ। তন্দ্রাচ্ছন্ন দুপুর:বেলায় কাকের গম্ভীর কা কা ধ্বনি, বউ কথা কও-র করুণ মিনতি, কোকিল দম্পতির কুহু ধ্বনির মাকু নিক্ষেপ, জ্যোৎস্না রাত্রির পাপিয়ার অন্তহীন প্রশ্ন, কতোই তো আছে। কিন্তু চোখ গেল রব যেমন মনকে বিকল-ব্যাকুল উদাস করিয়া দেয় এমন আর কিছুতেই নয়।

বেচারার চক্ষু দুটির এই দুরবস্থার কারণ কেহ জানে কি? আর এত দিনেও যে বেদনার উপশম হইল না তাহারই বা কি কারণ? বেচারা কি কোন পাশ-করা ডাক্তারের হাতে পড়িয়াছিল? কিম্বা কোন 'শান্তিপূর্ণ' ধর্মঘটে নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রখণ্ডই এই বেদনার হেতু? কিম্বা কোন কল মিল মনুমেন্ট সমন্বিত আধুনিক শহরের বীভৎস কুৎসিত দৃশ্য নিরন্তর তাহার চক্ষুঃপীড়া ঘটাইতেছে? কিম্বা খুব সম্ভব এ সব কিছুই নয়, কোনো সুন্দরী তাহার মনটির সঙ্গে চোখের দৃষ্টিটুকুও হরণ করিয়াছে, মন ফিরিয়া পাইবার আকাঙ্ক্ষা না থাকায় অপহৃত দৃষ্টির জন্যই নিরন্তর করুণ প্রার্থনা জানাইয়া কাঁদিয়া মরিতেছে—'চোখ গেল, চোখ গেল।'

আশঙ্কা করিতেছি পাঠক বলিবেন কমলাকান্ত তোমার এ কি হইল? তুমি নিত্য রাজনীতি ক্ষেত্রে মহা মহা রথী নিহত করিয়া কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ঘটাইতেছ, বিশ্ব সমস্যার সমুদ্রে ডুব দিয়া অভিনব সমাধান আহরণ করিতেছ, সমাজ দেহের ক্ষত নিরাকরণ ছলে তাহা আরো গুরুতর করিয়া তুলিতেছ! সে সমস্ত এক রকম সহ্য হইয়া গিয়াছে, হঠাৎ এই কবিত্বের ভূত মাথায় চাপিল কেন? আনাড়ির হাতে কবিত্ব আনাড়ির মুখে বাঁশীর চেয়েও মর্মান্তিক।

সত্য কথা বলিতে কি পাঠকের এই আশঙ্কা একেবারে অমূলক নয়। কিন্তু ততোধিক সত্য কথা এই যে, কবিত্ব-ব্যাধি চাপা ব্রঙ্কাইটিসের মতো—একবার বক্ষঃস্থল অধিকার করিয়া বসিলে সহজে নড়িতে চায় না। কমলাকান্ত চাপা ব্রঙ্কাইটিস রূপ কবিত্ব ব্যাধিতে বাল্যকাল হইতে আক্রান্ত। একটু সুযোগ পাইলেই রোগটা মাথা তুলিয়া অস্তিত্ব জানাইয়া দেয়। ভোরের চোখ গেল ধ্বনি হঠাৎ সেই সুযোগ আনিয়া দিয়াছে। সমস্ত মনটা বিকল হইয়া গিয়াছে, কলমটাও। বেচারা কি বলিতে কি বকিতেছে নিজেই জানে না।

আসল কথা এ-যুগের আমরা সকলেই ঐ চোখ গেল পাখীর মতো। কেন চোখ গেল, কি তাহার প্রতিকার দুই-ই সমান রহস্যময়। সমস্যা ও সমাধানের মধ্যে এমন বিস্তর ব্যবধান আর কোন যুগে ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ। যে সমস্যার সমাধান আছে তাহা তো সমস্যাই নয়। এ-যুগের সমস্যার সমাধান নাই, অন্ততঃ কাহারো জানা নাই। তাই যুগকণ্ঠ ভাষান্তরে চোখ গেল ধ্বনি হাঁকিতেছে। কেবল সরকার-বিরোধী পক্ষের ধারণা সমস্ত সমাধান তাঁহাদের করতলগত। কিন্তু শাসনকার্যের জোয়াল তাঁহাদের কাঁধে চাপিলেই ঐ একই রব তাঁহাদের কণ্ঠেও ধ্বনিত হইতে শোনা যাইবে—'চোখ গেল, চোখ গেল।'

যুগ-বেদনার নকীব ঐ পাখীটা এখনো সেই ধ্বনি হাঁকিয়া মরিতেছে আর আমার মন বেদনার অন্ধকার খিলান পথে ক্রমে গভীরতর অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াইয়া মরিতেছে—সমাধান নাই, সমাধান নাই, 'চোখ গেল, চোখ গেল।'

৩১

সেক্সপীয়ার

বান্দুং সম্মেলনের উগ্র মুখরতায় একটি স্মরণীয় তারিখ ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। আজ পত্রান্তরে একখানি ছবি দেখিয়া মনে পড়িল যে ইতোমধ্যে ২৩শে এপ্রিল কখন্ চলিয়া গিয়াছে, বিশ্বকবি শেক্সপীয়রের জন্মদিন। এখন মনে পড়িতেছে যে বাঙ্গালী শেক্সপীয়র-রসিক গুণিজন তারিখটা ভোলেন নাই, তাঁহারা শ্রদ্ধার্ঘ্য বহন করিয়া রাজভবনে সমবেত হইয়াছিলেন। আর ছবিখানি দেখিয়া মনে পড়িল যে আণবিক ধ্বংসের আসন্ন আশঙ্কার মধ্যেও বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ শেক্সপীয়রের জন্মনগরী ষ্ট্রাটফোর্ড-অন-আভন-এ সমবেত হইয়াছিলেন। শুভ সংবাদ বটে।

মানুষ বিচিত্র জীব। তাহার এক হাতে আণবিক বোমা, অপর হাতে শেক্সপীয়রের কাব্য, এক হাতে দুর্মদ মারণাস্ত্র, অপর হাতে সেবাব্রতী রেডক্রশ বাহিনী; তাহার এক হাত নিত্য নূতন শক্তিশেলের সন্ধানে নিযুক্ত, অপর হাত সন্ধান করিতেছে বিশল্যকরণী; একাধারে তাহার মনে গরল ও অমৃত, করুণা ও হিংসা, যাদুকর Prospero-র মতো Caliban ও Ariel দুই-ই তাহার বশীভূত! কেন এমন হইল সে রহস্যের সংবাদ Prospero, Caliban ও Ariel-এর স্রষ্টা বিশ্বকবিই হয়তো দিলে দিতে পারেন। শেক্সপীয়রের কাব্যের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে এই দুর্জ্ঞেয় রহস্যের বার্তা, মানবচরিত্রের নৃসিংহ মূর্তির প্রতিবিম্ব; তিনি মানুষের উৎসব-ব্যসনের সঙ্গী: রাষ্ট্রক্ষেত্রে যাহারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী তাহারাও আজ কবিক্ষেত্রে একলক্ষ্যে উপনীত; গত বিশ্বযুদ্ধের সর্বব্যাপী বোমা বিক্ষেপের মধ্যেও ষ্ট্রাটফোর্ড-অন-আভন অক্ষত থাকিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, বিশ্বযুদ্ধের চেয়ে বিশ্বকবির প্রভাব অধিক। কোন দূরকালে পৃথিবী যে একাত্মক হইতে পারে শেক্সপীয়রের মতো বিশ্বকবিই তাহার একমাত্র প্রমাণ। এমন কি ধর্ম লইয়াও মানুষে হানাহানি কম করে নাই কিন্তু শেক্সপীয়রের অঙ্গন এত উদার যে সেখানে সকল ধর্ম, সকল সম্প্রদায়, সকল জাতি ও সকল রাষ্ট্রেরই স্থান হয়।

কবি ইয়েট্স একবার বলিয়াছিলেন যে ইংলণ্ডই একমাত্র দেশ যাহার উপরে রাগ করা সম্ভব নয়। ইয়েট্সের মুখে একথা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। আয়ারল্যাণ্ড দীর্ঘকাল ইংরাজের অধীন ছিল, ইয়েট্স আইরিশ। তৎসত্ত্বেও তিনি যে ইংলণ্ডের উপর রাগ করিতে পারেন নাই তার কারণ শেক্সপীয়র ও তাঁহার সমগোত্র কবিগণ। আমরাও দীর্ঘকাল ইংরাজের অধীন ছিলাম; সেই ক্ষতেরও বিশল্যকরণী ছিল ইংরাজী কাব্যে। বরঞ্চ ইংলণ্ডের সঙ্গে স্বার্থের যোগ ছিন্ন হইয়া যাওয়াতে ভাবের ক্ষেত্রে আরও যেন কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছি। ইংরাজের ভারত সাম্রাজ্য গিয়াছে, কিন্তু তাহার এক সাম্রাজ্য আছে যাহা কখনো যাইবার নয়, তাহার অধীশ্বর উইলিয়াম শেক্সপীয়র।

সাম্প্রতিক সংবাদ এই যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইংরাজী ভাষার প্রসার বাড়িতেছে। এই সময়ে এ দেশে যাঁহারা ইংরাজী ভাষার মূলোচ্ছেদ করিতে উদ্যত তাঁহারা ভাবের ক্ষেত্রে এ দেশকে একঘরে করিবার আয়োজন করিতেছেন। এক সময়ে ইংরাজী সাহিত্যের চর্চা করিতে গিয়াই আমরা মাতৃকোষে রতনের রাজির সন্ধান পাইয়াছিলাম। দেশীয় ভাষায় উন্নতির উপায় ইংরাজী বর্জন বা ইংরাজী সাহিত্যের সহিত অসহযোগ নয়, দেশীয় ভাষার প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধাবান্ হওয়া। ইংরাজী বর্জন না করিয়া কি দেশীয় ভাষার অনুশীলন সম্ভব নয়? এ দুয়ে সাম্যরক্ষার উপায় আবিষ্কার করিতে হইবে, নতুবা ইংরাজীও ভুলিব, দেশী ভাষাও শিখিব না; শেক্সপীয়রের ভাষাও ভুলিব, রবীন্দ্রনাথের ভাষাও শিখিব না। এমন দুর্বুদ্ধি যেন আমাদের না হয়।

মহাকবিরাই দেশের বিধানকর্তা, জনগণ-মন-অধিনায়ক; ইংলণ্ডে শেক্সপীয়র, ইটালীতে দান্তে, জার্মাণীতে গ্যেটে, নব্যভারতে রবীন্দ্রনাথ। ইঁহাদের নিছক ভাববিলাসী বলিয়া একদিকে সরাইয়া না রাখিলে মানুষের বোধকরি আজ এমন দুর্দশা হইত না। যাহা কিছু ক্ষণিক, তৎস্থানিক ও তৎকালিক তাহার প্রতি ভরসা বাড়িলেই স্বার্থ বড় হইয়া ওঠে, আর 'স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে।' মহাকবিগণ সর্বদা সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, কিন্তু মানুষে শোনে নাই, কারণ তাহাদের একটা অদ্ভুত ধারণা—কবিরা কল্পনা-বিলাসী। কবিরা উত্তর দিতে পারেন যে তোমাদের বাস্তববাদের এই যদি পরিণাম হয়, তবে কল্পনাবিলাসে দোষ কি! না হয় মনের মধ্যে

একটুখানি কল্পনার মিশাল থাকিল, তাহাতে অনেক ফাঁকি ধরা পড়িবে, ক্ষণিকে ও চিরন্তনে প্রভেদ করিতে শিখিবে, হাউইবাজীকে সূর্য বলিয়া ভুল করিবে না, শ্লোগানকে সত্য বলিয়া মনে হইবে না, রাষ্ট্রদেবতাকে কখনো বিশ্বদেবতার মর্যাদা দান করিবে না, আর বুঝিতে পারিবে যে মনুষ্য জীবনের চরম সম্পদ ব্যক্তিত্ব আর চরম লক্ষ্য মুক্তি। এ সব কথা শেক্সপীয়রের চেয়ে বিশ্বস্তরূপে আর কে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন!

৩২
সাহিত্যের বাজার

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের আগ্রা অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীহরপ্রসাদ বাগচী মহাশয় নিজের অভিভাষণে বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে একটি গুরুতর সমস্যার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্যের সহিত কমলাকান্ত সম্পূর্ণ একমত। আসরে অনেকবার বিষয়টির আলোচনা করিয়াছি আর পাঠকচিত্তে তাহার প্রতিক্রিয়ার ফলে বুঝিয়াছি যে, বহু লোকে বাগচী মহাশয়ের মতোই চিন্তা করেন। পুনরায় বিষয়টি আলোচনা করিবার আগে বাগচী মহাশয়ের বক্তব্য উদ্ধার করিয়া দিতেছি।

বাগচী মহাশয় বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"অনেক ভালো ভালো মৌলিক ও অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া যে বহু বাজে বই ছাপা হইতেছে না, তাহা নহে। কিন্তু আজকালকার কর্মব্যস্ত জীবনে বাছিয়া ভালো বই বাহির করিবার অবসর কই? আমরা বিশিষ্ট মাসিক পত্রিকাগুলির সম্পাদকদের নিকট প্রকাশিত পুস্তকসমূহের নিরপেক্ষ ও যথাযথ আলোচনা আশা করিয়া থাকি। কিন্তু তাহা সব সময় পাই কোথায়? আমাদের মত সাধারণ পাঠকের কি অবস্থা ভাবিয়া দেখুন। এমন অবস্থায় আমাদের সহজেই বিভ্রান্ত হইয়া পড়া কি আশ্চর্য? আমরা সেই দিনের অপেক্ষায় আছি, যেদিন 'টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেণ্টের' ন্যায় একখানি পত্রিকা নিয়মিতরূপে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে নূতন সাহিত্য ও অন্যান্য জ্ঞানগর্ভ পুস্তক সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে যথাযথ সংবাদ দিবে।

আগ্রা হইতে 'সাহিত্য রত্ন ভাণ্ডার' এইরূপ হিন্দিতে প্রকাশিত পুস্তকগুলির পরিচয় দিয়া 'সাহিত্য সন্দেশ' নামক একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিয়া থাকেন। বাংলা দেশ হইতে অনুরূপ একখানি মাসিক বা ত্রৈমাসিক পত্র প্রকাশ করা এতই দুরূহ?

"আমরা প্রবাসী বাঙ্গালীরা বাংলা বুঝিও না, বাংলা ভাষায় জ্ঞানও আমাদের অতি সামান্য; সুতরাং আমরা চাই যে, আমাদের অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কোন্‌টি ভাল লেখা ও কোন্‌টি মন্দ লেখা, তাহা বুঝিবার কষ্টিপাথর দেখাইয়া দিবেন।"

বাগচী মহাশয় যে সমাধান আশা করেন, অচিরে তাহা সম্ভব হইবে মনে হয় না—বরঞ্চ অবস্থা উত্তরোত্তর সঙ্কটজনক হইয়া উঠিবে বলিয়াই আশঙ্কা। কেন এমন মনে করি, বিস্তারিত বলিবার আগে একটা অবশ্যস্মরণীয় কথা মনে করাইয়া দিই। এখনো আমরা পূর্ব সংস্কারবশে 'সাহিত্য সাধনা' 'সাহিত্য সাধক' প্রভৃতি শব্দ যদিচ ব্যবহার করিয়া থাকি, কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, সাধনার সঙ্গে সাহিত্যের আজ আর কোন সম্পর্ক নাই—সাহিত্য এখন পুরাপুরি ব্যবসায়। সাহিত্য সদাগর, সাহিত্য বণিক, সাহিত্য পণ্য প্রভৃতি শব্দ এখন ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যক। আর অন্য ব্যবসায়ের সঙ্গে প্রভেদ এই যে —সাহিত্যের ব্যবসা নতুন বলিয়া ইহাতে এখনো কোন 'ব্যবসায়িক নীতি' গড়িয়া ওঠে নাই, ফলে ব্যবসায়িগণের মধ্যে যে 'সততা' দেখা যায়, সাহিত্য বণিকগণের মধ্যে সেটুকুরও অভাব। 'আমার ঔষধ সেবনে বাত হইতে বন্ধ্যাত্ব পর্যন্ত সব রোগ দূর হয়'-মনোভাব সাহিত্যের বাজারে এখন সমস্ত কাণ্ডজ্ঞান ও শালীনতা লঙ্ঘন করিয়া দেখা দিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন 'সাহিত্যের বড়বাজার', এখন জীবিত থাকিলে তিনি সাহিত্যের চোরা-বাজার, ফাটকাবাজার প্রভৃতি দেখিতে পাইতেন। এখন এই অভিমত স্বীকার করিয়া লইলে পুস্তকের নিরপেক্ষ সমালোচনা কেন সম্ভব নয়, সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

নিম্নলিখিত কারণগুলির ফলে 'সাহিত্যের বড়বাজার' সাহিত্যের চোরা-বাজার ও ফাটকাবাজারে পরিণত হইয়াছে।

(১) রাজনৈতিক দলের অবাঞ্ছিত প্রভাব। সংস্কৃতি প্রচারের অজুহাতে নিজ নিজ দলের ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত সাহিত্যিককে ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া রবীন্দ্র

সমতুল্য ও ক্রমে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় করিয়া তোলার চেষ্টা অত্যন্ত সক্রিয়। অন্যদিকে, অপর দলভুক্ত বা কোন দলভুক্ত নয়, এমন সাহিত্যিককে নিন্দা করা বা তাঁহার সম্বন্ধে মৌন অবলম্বন করার নীতিও সমান সক্রিয়। সাহিত্য বিচারের প্রধান মাপকাঠি এখন রাজনৈতিক মতবাদ। যে দলের গলা উচ্চ, তাহার কবি-সাহিত্যিকগণও তত প্রখ্যাত। 'যে ব্যক্তি আমার দলে নয়, সে আমার বিপক্ষে' এই শকুনিনীতি সাহিত্য সম্বন্ধেও এখন প্রযোজ্য।

(২) আরও একটি কারণে সাহিত্যের মেছোহাটা বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যিকগণকে উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার কয়েকটি পুরস্কাররূপ "সোনার আপেল" নিক্ষেপ করিয়াছেন। ফলে নির্বাচনে কংগ্রেস টিকিট পাইবার জন্য যেমন কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়, এক্ষেত্রেও তেমনি ঘটিয়াছে। ইহার পরিণাম কি? রসবোধ, সাহিত্য বিচার, নিরপেক্ষতা মাথায় উঠিয়াছে। আর দাঁড়াইয়াছে—survival of the quickest! অমুক পুরস্কারপ্রাপ্ত বই হইলেই যে শ্রেষ্ঠ হইবে এমন নয়, তবে সত্যের খাতিরে বলিতে হয় যে, কখনো কখনো শ্রেষ্ঠ পুস্তকও পুরস্কৃত হইয়া থাকে। তবে শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌভাগ্য কাকতালীয় ন্যায়ে সংযুক্ত মাত্র।

(৩) উদ্যোগী প্রকাশকগণের উদ্যম। প্রকাশক তাঁহার পুস্তককে শ্রেষ্ঠ বলিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। ছানাপটির সব দোকানের ছানাই সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু আজকাল কোন কোন প্রকাশক বিজ্ঞাপনের পুরাতন নীতিতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া এমন সব সূক্ষ্ম নীতি অবলম্বন করিতেছেন, যাহা সমালোচনার ক্ষেত্রে অবৈধ প্রবেশ ছাড়া কিছু নয়। একটা কাল্পনিক দৃষ্টান্ত দিতেছি। মনে করুন, এক প্রকাশক পাড়ার কোন ক্লাব বা সভার হাতে কিছু টাকা দিয়া সেই ক্লাব বা সভার নামে পুস্তকখানাকে পুরস্কৃত করিলেন, হয়তো একেবারে খোদ রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির সহিত যুক্ত করিয়া দিলেন। অমনি ঢোলের সহিত কাঁসি ও শানাইয়ের মতো দুইজন "নিরপেক্ষ সমালোচক" বইখানার গুণপনার ব্যাখ্যায় লাগিয়া গেলেন। আর সমস্ত ব্যাপারটাই যখন সংস্কৃতির উন্নতি (সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নামটা উপরি) অমনি সংবাদপত্রে ফলাও করিয়া সচিত্র সংবাদ বাহির হইল। বাগচী মহাশয়ের মতো কর্মব্যস্ত রসপিপাসুগণ ভাবিলেন এ একখানা পড়িবার মতো বই। কিন্তু বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে উদ্যোগী প্রকাশকের উদার হস্ত তলে তলে বর্তমান। প্রকাশক যখন তাঁহার

প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য ঘোষণা করে, তখন পাঠকে এক রকম করিয়া তাহার অর্থবোধ করে। কিন্তু সেই প্রকাশক যদি বিজ্ঞাপনের স্থূল রাস্তা ছাড়িয়া উপরোক্ত পন্থা অবলম্বন করে—তখন সে সমালোচকের আসন অধিকার করে না কি? আর তাহার ফলে বিশ্বাসী পাঠককে প্রবঞ্চনা করা হয় না কি? লোভের এই নির্লজ্জ অরাজকতায় নবীন লেখকগণের অবস্থাটাই সবচেয়ে সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

(৪) সিনেমার অবাঞ্ছিত প্রভাবে পুস্তকের মূল্য নিরূপণে বড় গোলযোগ ঘটে। সিনেমাতে ছবি চলিবার কালে সিনেমায়িত পুস্তকখানি সাময়িকভাবে একটা গুরুত্ব লাভ করে। ভালো বইয়ের পক্ষে এইরূপ গুরুত্ব লাভ অন্যায় নয়, বরঞ্চ বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সিনেমায় অনেক সময় বাজে বই গ্রহণ করা হইয়া থাকে, তারপরে বিজ্ঞাপনের ঢাক-ঢোল পিটাইয়া বইখানার কল্পিত গুণাবলীর ব্যাখ্যা হয়। নিরীহ পাঠক বইখানা কেনে, পড়ে, তারপরে তাহার মনের অবস্থা কল্পনা করিয়া লওয়া কঠিন নহে। আরও আছে। অনেক সময়ে প্রযোজকের নির্দেশে অসহায় লেখক বইয়ের অদল বদল করিতেছেন, ট্রাজেডি কমেডি হইতেছে, কমেডি ট্রাজেডি হইতেছে, শিবঠাকুর বানরে রূপান্তর লাভ করিতেছে। আজ-কাল অনেক লেখক আবার সিনেমার সম্ভাবনার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বই লেখেন, ফলে বই শিল্পকর্ম না হইয়া অপকর্ম হইয়া পড়ে। এ ক্ষেত্রে প্রধান দায়িত্ব অবশ্য লেখকের। সাহিত্যিক উৎকর্ষের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার অবসর বা প্রয়োজন সাহিত্যিকেরও নাই, সমালোচকেরও নাই, প্রকাশকেরও নাই, সম্পাদকেরও নাই। তবে সে দায়িত্ব কাহার?

(৫) কিন্তু সবচেয়ে গুরুতর হইতেছে প্রকাশক—সম্পাদক—রিভিউয়ার (Reviewer) Axis স্থাপন। একটি কাল্পনিক দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। মনে করুন, 'ক' প্রকাশক, 'খ' সম্পাদক, 'চ' 'ছ' 'জ' তাহার কাগজের Reviewer এখন 'ক' 'প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন, সেবয়া'—'খ'-র সন্তুষ্টি বিধান করিলেন আর সেই সঙ্গে 'চ' 'ছ' ও 'জ' প্রভৃতির সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন, হয়তো তাহাদের দু'একখানা বই ছাপিয়া দিলেন। ব্যস্, তারপর 'ক'-র পথ সুগম হইয়া গেল। তাঁহার প্রকাশিত বইয়ের বিস্তারিত ও প্রশংসামূলক আলোচনা দ্রুত বাহির হইতে লাগিল। স্থান সঙ্কীর্ণ বলিয়া অন্য প্রকাশকের বই বড় আমল পাইল না, হয়তো দু' বছর পরে দু' লাইনে মুষ্টিভিক্ষা পাইল। এমন

দৃষ্টান্ত বিরল নয় যে, অতি প্রসিদ্ধ বইয়ের চার লাইন সমালোচনার ঠিক পাশেই অতি অসার পুস্তকের সুদীর্ঘ সমালোচনা! পাঠক ভাবিল নূতন লেখককে 'chance' দেওয়া হইতেছে, কিন্তু Axis প্রতিষ্ঠার ইতিহাস তো সকলে জানিল না। বলা বাহুল্য, ইহা নিছক কাল্পনিক দৃষ্টান্ত। এখন প্রশ্ন উঠিবে যে কেন, ইংরাজি সাহিত্যের বাজারে এর চেয়ে অনেক বেশি ব্যবসাদারি চলে। কিন্তু মনে রাখা আবশ্যক, ইংরাজি সাহিত্য মহাসমুদ্র, ব্যবসাদারি সত্বেও সাহিত্যের রাজদণ্ড সেখানে 'বণিকের মানদণ্ড' হইয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের পল্বলে এক বিন্দু বিষই যে যথেষ্ট। বাংলা সাহিত্যের প্রসারের মুখে ব্যবসাদারিটাই যদি একমাত্র মানদণ্ড হইয়া ওঠে তবে ভবিষ্যৎ ভয়াবহ। কথাটায় হয়তো সকলেই সানুমোদনে ঘাড় নাড়িবেন—কিন্তু কেহই যেন দায়িত্ব লইতে রাজি নয়। সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন তো আগাছা নয় যে, মাঠে ঘাটে আপনি গজাইয়া উঠিবে—তার জন্য কিছু শ্রম স্বীকার, ত্যাগ স্বীকার করা আবশ্যক। সেটুকু না করিলে 'কর্মব্যস্ত' পাঠককে অবশ্যই ঠকিতে হইবে।

এ বিষয়ে সমূহ দায়িত্ব আছে ব্যক্তিগতভাবে বিশিষ্ট সমালোচক ও প্রধান সাহিত্যিকগণের উপরে। কিন্তু সেখানেও বড় বেশি আশা ভরসা নাই, কেন নাই তাহা আলোচনা সাপেক্ষ।

৩৩

রাষ্ট্রভাষা নির্বাচন

ভাষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পরে কয়েকজন বিখ্যাত বাঙালী সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও অধ্যাপকের একখানি পত্র পত্রান্তরে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারা সরাসরি হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণের অপকারিতা বর্ণনা করিয়া সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। তাঁহাদের বিকল্প প্রস্তাব এই যে, হিন্দিকে যদি রাষ্ট্রভাষারূপে রাখিতেই হয়, তবে সেই সঙ্গে ইংরাজী ভাষাকেও রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান আবশ্যক। তাঁহাদের মতে হিন্দি ও ইংরাজি দুটি ভাষা স্বীকৃত হইলে একযোগে নানা সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব।

বুধবারের সংবাদপত্রে দেখিলাম যে প্রায় পঞ্চাশজন লোকসভার সদস্য নেহরু বরাবর এক আবেদন করিয়া জানাইয়াছেন যে, হিন্দির রাষ্ট্রভাষারূপে চালু হইবার শেষ সীমা ১৯৬৫ সাল হইতে পিছাইয়া ১৯৯০ সালে ধার্য করা আবশ্যক। এ বিষয়ে তাঁহারা যে-সব যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা সর্বজনবিদিত; আর সে-সব সর্বজনস্বীকৃত না হইলেও বহুজনস্বীকৃত যে সন্দেহ নাই।

হিন্দি যখন সংবিধানে রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃত হইয়াছিল, তার পরে অনেক অভিজ্ঞতা অতিক্রম করিয়াছে দেশ—এবং দুঃখের বিষয় এই যে, তাহার অনেকটাই তিক্ত। তাহা ছাড়া এই কয় বছরে আংশিকভাবে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষারূপে ব্যবহার করিতে গিয়া অনেক অনিবার্য অসুবিধা দেখা গিয়াছে। সর্বোপরি আছে রাজ্য পুনর্গঠনের দুঃসহ অভিজ্ঞতা। সে অভিজ্ঞতার ঢেউ এখনো থামে নাই। বোম্বাই গুজরাট উত্তর প্রদেশ এবং পাঞ্জাবে ভিন্ন আকারে এখনো সে ঢেউ চলিতেছে। ইহার উপরে হিন্দি সর্বভারতের উপরে চালাইতে গেলে লোকে প্রসন্ন মনে মানিয়া লইবে না। খুব সম্ভব এমন বিষম আন্দোলন শুরু হইবে, যাহাতে সর্বভারতীয়তাবোধের গ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়িবে। এমন অবস্থায় রাষ্ট্রনায়কগণের খুব ধীরভাবে চলা উচিত।

সাহিত্যিকদের পত্রে ও লোকসভার সদস্যগণের প্রস্তাবে সেই ধীরতার ইঙ্গিত আছে। হিন্দি ও ইংরাজি দুটিই রাষ্ট্রভাষা স্বীকৃত হইলে বহুলাংশে লোকের আশঙ্কা দূর হইবার সম্ভাবনা। কালের নিয়মে ও ভাষার নিয়মে হিন্দি সর্বকার্যক্ষম হইয়া উঠিলে অবশ্যই লোকমত হিন্দির অনুকূল হইবে। আর তাহা যদি না-ই হয়, তবু উদ্বেগের কারণ থাকিবে না, ইংরাজি তো থাকিলই। কিন্তু ইহার চেয়েও ধীর গতি লোকসভার প্রস্তাবে। হিন্দিকে সাকুল্যে গ্রহণ করিবার সময় পঁচিশ বছর পিছাইয়া দিলে অনেক উদ্বেগ ও অনেক অশান্তির আশঙ্কা এখনকার মতো চাপা পড়িয়া যাইবে। পঁচিশ বছরে লোকের মন সুস্থ হইলে, দেশের অবস্থা সচ্ছল হইলে, প্রাদেশিকতাবোধ দূরীভূত হইলে এবং ইতোমধ্যে স্বাভাবিকভাবে হিন্দির অধিকতর প্রসার ঘটিলে—তখন হয়তো কোন একটা ভাষাকে সর্বভারতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করিতে প্রবল আপত্তি উঠিবে না। সমস্ত সমস্যা আমি বা আমরা সমাধান করিয়া যাইব, এ একপ্রকার অহমিকাবোধ। ইহা ক্ষতিকর। কাজেই এই প্রকার অহমিকাবোধমুক্ত

হইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, পঁচিশ বছর কাল পিছাইয়া দেওয়া কাণ্ডজ্ঞানসম্মত। আর যদি এমনই হয় যে—এখনই রাষ্ট্রভাষা চূড়ান্তরূপে স্থির করা আবশ্যক, তবে হিন্দি ও ইংরাজি দুটিকেই স্বীকার করিয়া লওয়া আবশ্যক। এই ব্যবস্থায় হিন্দিভাষী ও অহিন্দিভাষী কাহারও অপ্রসন্নতার বা অসুবিধার কারণ আছে মনে হয় না, অন্ততঃ মনে হওয়া উচিত নয়।

ইংরাজি ভাষাকে অন্যতর বা অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণের একটি প্রধান অন্তরায়, অনেকের মতে, এই যে ইহা ভারতীয় ভাষা নয়। কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে কথাটি যুক্তিসহ নয়। ভারত রাষ্ট্রের নাগরিক আছেন এংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়। ইংরাজি ইহাদের মাতৃভাষা, শিক্ষার ভাষা ও ধর্মের ভাষা। কাজেই সেই সূত্রে ইংরাজিকে ভারতের অন্যতম ভাষারূপে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। অবশ্য এ কথা সত্য যে উক্ত সম্প্রদায় আকারে ক্ষুদ্র। কিন্তু সেই সঙ্গে ইংরাজি ভাষার পৃথিবীব্যাপী প্রসার যদি স্মরণ করা যায়, তবে ইহার গুরুত্ব অনেক বাড়িয়া যায়। আবার একথাও সত্য যে কেবল এই একটি যুক্তির বলে ইংরাজিকে অন্যতম বা অন্যতর রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করা উচিত নয়। কিন্তু অন্য নানাবিধ যুক্তিও যে ইংরাজি ভাষার পক্ষে বর্তমান। ইংরাজ আমলে প্রধানতঃ ইংরাজি ভাষাকেই অবলম্বন করিয়া সর্বভারতীয়তাবোধ দানা বাঁধিয়া স্পষ্ট হইয়া ওঠে। ইংরাজি ভাষার সর্বভারতীয় আবেদন না থাকিলে ইংরাজের ভারতব্যাপী শাসনের ভূমিকা সর্বভারতীয়তাবোধের উদ্বোধন করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। মুঘল শাসনের ভারতব্যাপী (বা প্রায় সর্বভারতব্যাপী) ভূমিকা তো পারে নাই। এখন পর্যন্ত ভারতবোধের প্রধানতম বাহন ইংরাজি ভাষা। কোনো সুদূর কালে অন্য কোন ভাষা সে ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারিবে এমন সম্ভাবনা দেখি না। বরঞ্চ হিন্দি বা অন্য একটিমাত্র ভারতীয় ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার পদবী দান করিলে মানসিক নৈরাজ্য সৃষ্টি হইয়া ভারতবোধ খণ্ডিত হইতে পারে এমন অশুভ আশঙ্কা বর্তমান। তার উপরে ইংরাজি ভাষার পৃথিবীব্যাপী ভূমিকা, তাহার সাহিত্যের ঐশ্বর্য, শব্দাবলীর প্রাচুর্য, নিত্যনূতন শব্দসৃষ্টির ক্ষমতা ও আমাদের সঙ্গে দীর্ঘ কালের পরিচয় প্রভৃতি স্মরণ করিলে ইংরাজিকে অন্যতর বা অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকার করা অনিবার্য হইয়া পড়ে। সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবোধের প্রেরণায় ইংরাজিকে অস্বীকার করিলে চিত্তের দীনতাকে

প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। আর শুধু তাহাই বা কেন, কোন একটিমাত্র ভারতীয় ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা বলিয়া স্বীকার করিলে সেই ভাষাধিকারের বহির্ভূত দেশের সুবৃহৎ অংশ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে। ব্যবহারিক অসুবিধা তো আছেই। এই সঙ্কটের ব্যূহ হইতে নিষ্ক্রমণের উপায় হইতেছে বহুপ্রচলিত কোন ভারতীয় ভাষার সঙ্গে (এ ক্ষেত্রে হিন্দি) ইংরাজিকেও প্রসন্ন মনে রাষ্ট্রভাষা বলিয়া গ্রহণ করা। ইংরাজিকে রাষ্ট্রভাষার পদবীদানমাত্র আমরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চক্ষে হীন প্রতিপন্ন হইব এমন আশঙ্কা অমূলক। কারণ বর্তমান পৃথিবীর সর্বত্র ইংরাজি ভাষার আদর বাড়িতেছে, সমস্ত দেশেই ইংরাজি শিক্ষায় ঝোঁক পড়িতেছে। এমন কি ভারত রাষ্ট্র ইংরাজিকে অন্যতর রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকার করিলে অন্যান্য অনেক দেশেও সেই আদর্শ অনুসরণ করিতে পারে—এমন সম্ভাবনাও যে নাই তাহা নয়। আবার ইংরাজি রাষ্ট্রভাষা হইলে ইংরাজিভাষী সম্প্রদায় একটা ভিন্ন শ্রেণী হইয়া উঠিবে বলিয়া অনেকে যে আশঙ্কা পোষণ করেন তাহা অমূলক। ইংরাজি শিক্ষিত সম্প্রদায় একটা ভিন্ন শ্রেণী গঠনের প্রবণতা দেখাইয়াছে সত্য। তাহার দুইটি কারণ। ইংরাজি শাসক জাতির ভাষা ছিল আর ইংরাজি শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়। ইংরাজহীন ইংরাজি কুলকৌলীন্যবর্জিত আর শিক্ষার প্রসার বহুব্যাপক হইলে ভিন্ন সম্প্রদায় সৃষ্টির আশঙ্কাই বা কেমন করিয়া সম্ভব! ইংরাজি ভাষার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে দোষগুণ তৌল করিলে গুণের গুরুত্বই সমধিক হইবে। এক্ষেত্রে ইংরাজি গ্রহণে বাধা থাকা উচিত নয়। তবে এক মৌলিক বাধা (সত্য নয়) যে ইংরাজি অভারতীয় ভাষা! কিন্তু তাহা নয়। ইংরাজি ভারত রাষ্ট্রের একটি সম্প্রদায়ের মুখের, শিক্ষার ও ধর্মের ভাষা। বাধা কোথায়?

৩৪

"... বহুধা বদন্তি"

পত্রান্তরে কয়েকজন বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকের অঙ্কিত ছবির নমুনা প্রকাশিত হইয়াছে, টলস্টয়, গ্যেটে, বদলেয়ারের অঙ্কিত ছবি। আরও কয়েকজন বিখ্যাত সাহিত্যিকের নাম দেখিলাম, পুশকিন, কিপলিং, হ্যান্স এণ্ডারসন, মার্ক টোয়েন—ইহারাও নাকি ছবি আঁকিতেন। ঐ সঙ্গে ভিক্তর হুগো, চেষ্টারটন প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। এ যুগে সাহিত্যিক-চিত্রকরের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম রবীন্দ্রনাথের। গ্যেটে কেবল ছবি আঁকিতেন না, মূর্তি গড়িবার চেষ্টা করিতেন—তাছাড়া বিজ্ঞানের নানা শাখাতেও মনশ্চালনা করিয়া গিয়াছেন। অপর পক্ষে বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর মাইকেল এঞ্জেলো কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যিকের চিত্রকর্মের চেয়ে তাঁহার কবিকর্মের মূল্য কম নয়। আবার রসেটির তুলি ও কলম সমান চলিত, নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন কোন্‌টি তাঁহার প্রধান অবলম্বন। কাজেই রসেটিকে বোধকরি ঠিক এই পর্যায়ে ফেলা যায় না। তাহা হইলে প্রশ্নটা দাঁড়ায় এই, কলম যাঁহাদের আত্মপ্রকাশে প্রধান বাহন, তাঁহারা মাঝে মাঝে তুলি ধরিতে যান কেন, বিপরীতটাই বা ঘটে কেন? ইহা কেবলি একটা শখ বা 'অব্যাপারেষু ব্যাপার' করিয়া বাহাদুরি দেখাইবার ইচ্ছা? না নিগূঢ়তর আর কোন মানসিক রহস্য ইহার মধ্যে আছে? সঠিক উত্তর বাহির করিতে পারিলে মনোরাজ্যের অন্ধিসন্ধির গোপন বিবরণ পাইবার সম্ভাবনা।

আগে রবীন্দ্রনাথের কথাই ধরা যাক। অল্প বয়স হইতেই ছবি আঁকিবার দিকে তাঁহার ঝোঁক ছিল কিন্তু পরিণত বয়সেই তিনি চিত্রশিল্পিরূপে প্রকট হইলেন। হঠাৎ এমন হইতে গেল কেন? সারাজীবন কাব্যে, কবিতায় ও অন্যান্যরূপের বাহকতায় আত্মপ্রকাশ করিয়াও এমন কতকগুলি নূতন উপলব্ধি বা অভিজ্ঞতা মনে সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল, ঐ ছবিগুলিই খুব সম্ভব তাহাদের একমাত্র প্রকাশের বাহন। তাঁহার জীবনের শেষ কয়েক বৎসরের কবিতার

ভাষা, ছন্দ, বিষয় ও অভিজ্ঞতার সহিত তাঁহার ছবিগুলি তুলনীয়। দুটি শিল্পই যেন একই ছাঁচে ঢালাই করা। দার্ঢ্য, তীক্ষ্ণতা, পরুষ ভাব রেখা ও লেখা দুয়েরই ধর্ম। তাঁহার কবিতার ও অন্যান্য রচনার ইহা স্বভাবসিদ্ধ নয়। দুয়ে অর্থাৎ একেবারে শেষ বয়সের কবিতায় ও তৎপূর্ববর্তী কবিতায় একটা মৌলিক ভেদ আছে। ছবির সঙ্গেও সেই একই প্রভেদ পূর্বজীবনের কবিতার। আমার বক্তব্য এই যে সারাজীবন আত্মপ্রকাশ করিবার পরেও এমন কিছু তাঁহার হাতে বাকি ছিল যাহার যোগ্য বাহন পূর্বতন কাব্যরীতি নহে। সেইজন্যই নূতন কাব্যরীতি সৃষ্টি করিয়া লইতে হইয়াছে শেষ বয়সে। এই নূতন কাব্যরীতির অপরার্ধ বা counter part তাঁহার চিত্রকলা। কাজেই সবগুলি মিলাইয়া লইলে তবেই রবীন্দ্রমনের সাকুল্য আভাস পাওয়া যায়। ইহা সত্য হইলে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ছবি আঁকা শখ বা বিলাস বা মতিভ্রান্তি নয়—তাঁহার ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ প্রকাশের জন্য ইহার একান্ত প্রয়োজন ছিল।

গ্যেটের সর্বতোমুখী প্রতিভা স্বভাবতই বহু ও বিচিত্র শিল্পের বাহন সন্ধান করিয়াছে। সাহিত্যের সমস্ত শাখা যখন তাঁহার সৃষ্টিক্ষমতাকে নিঃশেষ করিতে পারে নাই তখন তিনি চিত্রকলা, মূর্তিকলা, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ও রাজ্যের মন্ত্রিপদের দায়িত্বকে স্বীকার করিয়াছেন। এতগুলি বিচিত্র সৃষ্টিপ্রবাহও তাঁহার ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতে পারে নাই। খুব সম্ভব তাঁহার ব্যক্তিত্বের অনেকটা অংশই অপ্রকাশিত রহিয়া গিয়াছে।

অনেক লেখক ক্লান্ত লেখনীকে অভ্যস্ত পথ হইতে বিশ্রাম দিবার ইচ্ছায় মাঝে মাঝে ছবি আঁকিয়া থাকেন। ইহা আর কিছুই নয় তাঁহার প্রতিভার পূজাবকাশ যাপন। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের বেলায় কি? তাঁহার সাহিত্যকীর্তি যে-কোন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিককে অমরত্ব দান করিতে পারিত। তাঁহার দ্বৈত সত্তা, চিত্রী ও লেখক, অনেকটা ইংরাজ কবি রসেটির মতো। রসেটির মতোই তাঁহার চিত্রে ও লেখায় আন্তরিক মিল, দুই-ই যেন এক সুরে সাধা। রবীন্দ্রনাথের ছবি ও লেখা যেমন একে অপরের পরিপূরক, অবনীন্দ্রনাথের বেলায় তেমন নয়, তাঁহার লেখা যমজ সৃষ্টি। কাজেই দেখা যাইতেছে যে সাহিত্যিকের চিত্র এবং চিত্রীর লেখা সব সময়ে এক নিয়ম অনুসরণ করিয়া দেখা দেয় না—বিচিত্র মনের ক্ষেত্রে বিচিত্র নিয়ম। কিন্তু এ কথায় সন্দেহ

নাই যে, ঐরূপ বিপরীত সৃষ্টি শখ বা তাক লাগাইবার জন্য কেহ করে না। ইহা পাঁচ ঠ্যাংওয়ালা গোরুর মতো অস্বাভাবিক নয়, বামনের তৃতীয় চরণের মতো দিব্য ব্যাপার।

৩৫

"প্রাক্-আস্বাদনী নমুনা"

শোনা যায় যে, কোন ব্যক্তির ভাষা-জ্ঞানের বহর দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন,—"তুই ইংরাজিও শিখলিনে, বাংলাও ভুললি।" আজ আমাদের অনেকেরই সেই দশা হইতে চলিয়াছে ইংরাজীও শিখিলাম না, বাংলাও ভুলিলাম। ইংরাজ গুরু মহাশয়ের প্রস্থানের পরে অনেকেরই ধারণা হইয়াছে যে, এখন স্বচ্ছন্দে ইংরাজি সরস্বতীকে কদলী প্রদর্শন করা যাইতে পারে। তাঁহারা ইংরাজী বর্জনের পক্ষে! অপর দল মাতৃভাষা শিক্ষার উপরে ঝোঁক দেন। স্পষ্ট না বলিলেও তাঁহারাও ইংরাজি শিক্ষার বিরুদ্ধে। 'ইংরাজি শিখিও না' কথাটিই তাঁহারা উল্টাইয়া বলেন, 'মাতৃভাষা শেখো।' এই দলটিই আবার সংস্কৃত শিক্ষা বিষয়েও বিমুখ, স্কুল ফাইন্যাল ও অন্যান্য পরীক্ষা হইতে সংস্কৃত ভাষাকে দূর করিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হন। তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইলে সংস্কৃত ও ইংরাজির প্রভাব লোপ পাইবে, থাকিবে কেবল মাতৃভাষা। "যে-ব্যক্তি নিজের ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা জানে না সে নিজের ভাষাও জানে না!" গত দেড়শ বছরের মধ্যে আমরা যে বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখকে পাইয়াছি তাহা সংস্কৃত ও ইংরাজীর কল্যাণে। বাংলা ভাষার সঙ্গে এই দুই ভাষার শুভ যোগাযোগ না ঘটিলে আজও বাংলা ভাষায় শনির পাঁচালী, শিবায়ন ও দাশরথির আমল চলিত। কথাটা এত সহজ ও স্বতঃসিদ্ধ যে, কোন মতলবের প্ররোচনা না থাকিলে না বুঝিবার মতো নয়। মতলব কি হইতে পারে জানি না। বহির্বিশ্ব ও প্রাচীন ঐতিহ্যের যোগ ছিন্ন করিয়া বাঙালীর চিত্তকে একঘরে ফেলাই কি উদ্দেশ্য? কি লাভ হইবে? রাজনীতিকগণের মতি গতি "দেবাঃ ন জানন্তি

কুতো মনুষ্যাঃ।" বিদ্যাসাগরের সময় হইতে এ পর্যন্ত এমন কোন উল্লেখযোগ্য বাঙালী সাহিত্যিক দেখা যাইবে না যিনি ইংরাজি কিছু না কিছু জানিতেন। ইংরাজি ভাষার খাতে বহিতেছে যুগরস—সে জোগান হইতে যে বঞ্চিত নিতান্তই হতভাগ্য সে। ভালো বাংলা শিখিবার উপায় ভালো করিয়া ইংরাজী শেখা। কিন্তু না তাহা হইবার নয়, একদল লোক হঠাৎ মাতৃভাষার সনদ বুকে পিঠে আঁটিয়া মনের আনন্দে উল্টারথের পালায় নামিয়া পড়িয়াছেন—ইহার অপর নাম প্রগতি। কতকগুলি ভাঙা হাঁড়ি কুঁড়ি, ছেঁড়া কাঁথা, জীর্ণ পট, অখাদ্য ছড়া-পাঁচালী—এই সবই নাকি শিল্পের সেরা, লোক-সংস্কৃতিই নাকি শিল্পযাত্রীর চরমতীর্থ। একবার এইগুলার মধ্যে যথোচিত মাত্রায় local patriotism বা স্থান-মাহাত্ম্য ও রাজনীতি ঢুকাইয়া দিয়া এগুলার মহিমা বাড়াইয়া তুলিতে পারিলে প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের মহৎ দৃষ্টান্তগুলি সম্বন্ধে মানুষের মনকে উদাসীন করিয়া তোলা কঠিন নয়—মাথা হইতে দেবতা নামিলে তবেই ভূত প্রেতের ভর করা সহজসাধ্য হইয়া ওঠে। তারপরেই মার হাম্বা! দলীয় রাজনীতির জয় জয়কার। ইংরাজিও শেখা হইল না, বাংলাও ভোলা হইল—বিশুদ্ধ মাতৃভাষাগত প্রাণটি তখন রাজনীতির ময়দানে ফুটবলের মতো অসহায়ভাবে তাড়িত বিতাড়িত হইয়া কৃপামিশ্রিত করুণা জাগাইতে সমর্থ হইবে।

একদিন প্রাতঃকালে স্বনিকেতনে বসিয়া এই সব চিন্তা করিতেছি এমন সময়ে ইংরাজি সাহিতের এক অধ্যাপক বন্ধু বিষণ্ণ মুখে দেখা দিলেন

ব্যাপার কি ?

তিনি একখানি মুদ্রিত প্রশ্নপত্র আমার হাতে দিলেন। কলিকাতার কোন প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ইতিহাসের প্রশ্নপত্র।

তা আমি কি করবো ?

পড়ে দেখুন না।

দেখিলাম প্রথমেই মুদ্রিত রহিয়াছে "প্রাক্-আস্বাদনী পরীক্ষা।"

কিছু বুঝিলেন ?

কমলাকান্তের ইংরাজিজ্ঞান 'টুটাফুটা' রকমের তাই বলিলাম—আপনিই বলুন, আপনি ইংরাজির অধ্যাপক।

তিনি বলিলেন, ইংরাজি কথাটা "Pre-Test" কিন্তু "Test" আর

"Taste" শব্দ দুটায় গোলমাল হয়ে যাওয়ায় ঐ অদ্ভুত বাংলা দাঁড়িয়েছে। আমি বলিলাম, যা খুঁজছিলাম পেলাম। একাধারে পেলাম ইংরাজী না শেখা ও বাংলা ভোলার উদাহরণ। কিন্তু এমন তো হতে পারে যে, ছাপার ভুল।

তা নয়, কেন না, প্রশ্নকর্তাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন ভুল হয়নি যেমন হওয়া উচিত তা-ই হয়েছে।

আমি বলিলাম—কথা ঠিক। ইংরাজি না শিখলে ও বাংলা ভুললে যেমন হওয়া উচিত তেমনি হয়েছে। ঐরূপ অবস্থার "প্রাক্-আস্বাদনী" নমুনা হাতে হাতে পাইয়া মনটা অকারণে খুশী হইয়া উঠিল।

৩৬

সাহিত্যে নিয়ন্ত্রণ

বরোদাতে পি ই এন প্রতিষ্ঠানের আহ্বানে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলনে পণ্ডিত নেহরু ও ডাঃ রাধাকৃষ্ণন ভারতীয় লেখক ও বৈজ্ঞানিকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের রচনা ও কাজের ভিতর দিয়া আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও শুভেচ্ছার বাণী যেন প্রচারিত হয়। এখন এই কথাটা শুনিতে অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের ও মহৎ মনে হইলেও বিচারে নামিলে দেখা যাইবে যে, বস্তুতঃ ইহা বৃহৎ অনিষ্টের সম্ভাবনায় পূর্ণ। ব্যাপারটা তলাইয়া বুঝিবার জন্য আগাইয়া বোঝা আবশ্যক। এ যুগের লেখক, বৈজ্ঞানিক ও মনীষিগণের সম্মুখে সবচেয়ে বড় সমস্যা হইতেছে—বর্তমান সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণের সমাজে লেখক, বৈজ্ঞানিক ও মনীষিগণ সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণের ছোঁয়াচ এড়াইয়া চলিতে পারেন কি না। কিম্বা কতখানি পারেন, কিম্বা আদৌ পারেন না। এই সমস্যার সমাধানের উপরে অন্যান্য আনুষঙ্গিক গৌণ সমস্যার নির্ভর। আজ কোথায় নিয়ন্ত্রণ নাই? অশনে বসনে ভূষণে আহারে বিহারে শিক্ষায় ক্রীড়ায়, এমন কি, জন্মে ও মৃত্যুতে অবধি নিয়ন্ত্রণ শুধু তা-ই নয়, নিয়ন্ত্রণের সূক্ষ্ম হস্ত মানুষের মস্তিষ্ক ও মনের মধ্যেও নিপুণ অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে।

এখন বাকি শুধু মানুষের স্বপ্নটা। ঐ স্বপ্ন হইতেছে লেখকগণের মূলধন। এখন সেই স্বপ্নলোক নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলেই মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে কায়মনোবাক্যে বাঁধিয়া ফেলা যায়। আর ইতিমধ্যেই সোভিয়েৎ সাম্রাজ্যে বহুল পরিমাণে ইহা সম্ভবপর করিয়া তোলা হইয়াছে। রাষ্ট্র সেখানে বল্লালসেন সাজিয়া লেখক সমাজে কৌলীন্য নির্ধারণ করিয়া দিতেছে। সেখানকার লেখকদেরই স্বীকৃতি হইতেছে যে, তাঁহারা 'Dead Souls' 'নহুষের প্রেতাত্মা।' যে-লেখক সেখানে রাষ্ট্রের তর্জনী সঙ্কেতে লেখনী চালনা করেন, তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও বিত্তের অভাব থাকে না—আর যে হতভাগ্য তাহা পারে না, তাহার বিড়ম্বনার অন্ত থাকে না। এ সমস্ত আজ সর্বজনবিদিত তথ্য। কিন্তু সোভিয়েৎ সাম্রাজ্যের বাহিরেও আজ এই দূষিত প্রভাব ধীরে ধীরে বিস্তারিত হইতেছে। এক সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে laissez faire নীতি ছিল, এখন আর নাই। সত্য কথা বলিতে কি, রাষ্ট্রের বিশ্বরূপ ধারণের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি হইতেও ক্রমশঃ এবং অতিদ্রুত laissez faire নীতি অন্তর্হিত হইতেছে। এইভাবে চলিলে কিছুকালের মধ্যেই সমস্ত দেশে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম হইবে—তখন আর সোভিয়েৎ সাম্রাজ্যে ও অন্য রাজ্যে তফাৎ থাকিবে না। সোভিয়েৎবিরোধিগণও রূপান্তরে সোভিয়েৎ নীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবে। তখন ব্যস্, সব একাকার। তখন পি ই এন সভায় প্রধান মন্ত্রী নেহরুকে আর বক্তৃতা করিতে হইবে না, রাষ্ট্রের 'সাংস্কৃতিক মুন্সীখানা' হইতে গোপনে যে হুকুমনামা আসিবে, তাহাই সভার কর্মসূচী নির্ধারিত করিয়া দিবে। ইহা অলীক কল্পনা নয়, বহু দেশে অনুষ্ঠিত বাস্তব অবস্থা। আমার বক্তব্য এই যে, সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণের যুগে সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণের ছোঁয়াচ এড়াইয়া চলা সম্ভব নয়। (বিজ্ঞানের কথাই ওঠে না, বৈজ্ঞানিকগণ মুখে যাহাই বলুন, সর্বাগ্রে তাঁহারাই 'দাসনামা' লিখিয়া দিয়াছেন)। কেন সম্ভব নয়? কেহ টাকার লোভে, কেহ প্রতিষ্ঠার লোভে, কেহ রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত পারিতোষিক বা পদক পদবীর লোভে, আর কেহ কেহ বা ভ্রান্ত আদর্শবাদের প্রেরণায়, লেখকগণ একে একে রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব মানিয়া লইবে। যাঁহারা মানিবেন না তাঁহারা ভাগাড়ে মরিবেন, তাঁহাদের বই কেহ ছাপিবে না, কিনিবে না, পড়িবে না। ইহাই হইতে যাইতেছে। ছায়া পূর্বগামিনী, সে ছায়া বাংলা সাহিত্যে পড়িয়াছে,

চোখ থাকিলে দেখা যায়, সাহস থাকিলে বলা যায়, কিন্তু এযুগে ওসব বালাই না থাকাই ভালো।

ইহার প্রতিকার কি? প্রতিকার নাই, তবে প্রতিষেধক আছে। রোগী বাঁচিবে না, তবে আরো ঘণ্টা কয়েক জীবিত থাকিবে—ইহাই লাভ। প্রধান মন্ত্রীর বা রাষ্ট্রপতির বা উপ-রাষ্ট্রপতি প্রভৃতি অত্যুচ্চ কর্তৃপক্ষের কখনো কোন সাহিত্যসভায় (যেমন PEN সভা) বক্তৃতা করা উচিত নয়। তাঁহারা উদার মনোভাব লইয়া যাহাই বলুন না কেন, তাহাতে শাসন, অনুশাসন ও নিয়ন্ত্রণের ছায়া আপনি আসিয়া পড়ে, পড়িতে বাধ্য। মানুষের মনের গড়নই এরূপ। নেহরু ও রাধাকৃষ্ণন বলিলেন, লেখক ও বৈজ্ঞানিকগণ যে আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্র প্রচার করেন ইহার গুরুত্ব কেবল উপদেশের গুরুত্ব নয়—রাষ্ট্র ইঙ্গিতের গুরুত্ব। ইহাই নিয়ন্ত্রণের সূত্রপাত। লেখকের মন যদি সৌভ্রাত্র প্রচার করিতে চায়, করিবে, না চাহিলে না করিবে, উদাসীন থাকিতে চাহিলে উদাসীন থাকিবে, এমন কি, বিদ্বেষ প্রচার করিতে চাহিলে করিবে (যদি রাষ্ট্র সে সুযোগ দেয়)। সংক্ষেপে একমাত্র নিজের সাহিত্যবুদ্ধি ছাড়া অন্য কাহারো শাসন বা ইঙ্গিত লেখক মানিবে না। আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্র খুব ভালো—কিন্তু তাহাও সাহিত্যিকগণের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া উচিত নয়। সাহিত্যকে বাঁচাইতে হইলে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করিবার জন্য লেখকগণকে প্রস্তুত হইতে হইবে। ইহাই P. E. N-এর যথার্থ কাজ হওয়া উচিত। কিন্তু হইতেছে ঠিক উল্টা। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা কাজটি সহজ নয়—তবু আজ উহাই একমাত্র পথ—

"যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ
সুখ আছে সেই মরণে।"

৩৭

সাহিত্যে পুরস্কার

সাহিত্যে কৃতিত্বের জন্য পুরস্কারদানের আমি বিরোধী, অনেকবার এই মর্মে লিখিয়াছি। সাহিত্যিককে দান করা ভালো, কিন্তু পুরস্কার দান করা কিছু নয়। দানে সাহিত্যিকের উপকার হয়—পুরস্কার দানে সাহিত্যের উপকার হয় কি না সন্দেহ। বিক্রমাদিত্য কালিদাসকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, খুব সম্ভব বাড়ীঘর, জোত-জমি ও বৃত্তি দিয়াছিলেন। কিন্তু মেঘদূত কাব্যের জন্য সহস্র স্বর্ণমুদ্রা বা পদক দিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। অর্থাৎ কালিদাস বৈষয়িক ক্ষেত্রে রাজাধীন থাকিয়াও কল্পনার ক্ষেত্রে স্বাধীন ছিলেন। এখনকার রীতি ঠিক উল্টা। এখন সাহিত্যিকের খোঁজ কেহ লয় না, কিন্তু লোকটা কোন ভালো পুস্তক লিখিয়া ফেলিলে রাষ্ট্র বা বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান তাহার উপরে কৌলীন্য-চিহ্ন দাগিয়া দেয়। ভাবটা এই যে, হে সাহিত্যিক তুমি চরিয়া খাও, কিন্তু ঘটনাক্রমে যদি উত্তম কিছু লিখিয়া ফেলো, তবে তাহার কৃতিত্বে আমি ভাগ বসাইব।

দান ও পুরস্কারদানে পার্থক্য এই যে, কোন সাহিত্যিক শেষ বয়সে অভাবে পড়িলে বা কঠিন রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িলে রাষ্ট্রের কর্তব্য তাঁহার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া, না করিলে অন্যায় হইবে। কিন্তু কোন সাহিত্যিক ভালো বই লিখিলে রাষ্ট্রের পক্ষে তাহা চিহ্নিত করিয়া দেওয়া উচিত নয়। তবে, সে কাজ কে করিবে? যাহাদের জন্য বইখানা লিখিত, তাহারা করিবে, হাজার হাজার বিক্রয়; যশ, প্রতিষ্ঠা, মাল্যচন্দন এই তো যথার্থ সম্মান—সে সম্মান আসুক পাঠক-সমাজের হাত হইতে; আজকাল তাহারাই যে বিক্রমাদিত্য; গণতন্ত্রের যুগে রাষ্ট্রের পক্ষে বিক্রমাদিত্যের ভূমিকা গ্রহণ করা অশোভন। এখন, রাষ্ট্র সে ভূমিকা গ্রহণ করিলে সাহিত্যিক রাষ্ট্র মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতে বাধ্য—ইহাও নিয়ন্ত্রণ। দানে নিয়ন্ত্রণের কথা ওঠে না, কারণ তখন তো সাহিত্যিকের কলম অচল হইয়া পড়িয়াছে;

বড়জোর সে কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতে পারে; কলমের পরাধীন হইবার ভয় থাকে না। পুরস্কার দানে বিপরীত ফল। বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে সেই ফল ফলিতে সুরু করিয়াছে। আকাদামি ও রবীন্দ্র পুরস্কার কমিটি প্রভৃতির প্রীতিভাজন হইবার জন্য লেখকগণের মধ্যে যে বিপুল তদ্বির চলে, তাহা আইনসভার নির্বাচন প্রার্থীর শিক্ষার স্থল। সাহিত্যের পক্ষে ইহা স্বাস্থ্যকর নয়। অন্য দেশে পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে বলিয়া আশ্বস্ত হইবার কারণ নাই—অন্য দেশেও সাহিত্যের অবস্থা মন্দা। তাছাড়া সেসব দেশে সাহিত্য অনেকদিন ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে, ব্যবসায়ের নীতি অনুসারে সেখানকার সাহিত্যের বাজার চলে। আমাদের দেশে সবে শখ হইতে ব্যবসায়ে পরিণত হইতে চলিয়াছে সাহিত্য; পাঠকের সংখ্যা প্রতিবৎসর বন্যার জলের মতো বাড়িয়া যাইতেছে—এহেন সময়ে, কঠিন সঙ্কটের মুখে কতকগুলি পুরস্কারের সোনার আপেল নিক্ষিপ্ত হইল সরস্বতীর আঙিনায়—মুহূর্তে আঙিনা ফাটকা বাজারে পরিণত হইয়া গেল। শুনিলাম সেদিন কোন সাহিত্যিক স্বপ্ন দেখিয়াছেন যে, তিনি আগামী বছরে রবীন্দ্র পুরস্কার পাইবেন—এ বছরে পাইবেন অপর একজন। স্বপ্নাদ্য পুরস্কার লইয়া সাহিত্যিকগণের আসর খুব সরগরম। তবেই বুঝুন ব্যাপারটা কি! সরকার কেবল আমাদের টাকার থলিতে নয়, স্বপ্নের থলিতে অবধি হাত চালাইয়া দিয়াছেন। ইহাও কি নিয়ন্ত্রণ নয়? কিন্তু ইহা বোধকরি কলির সন্ধ্যা। দেশের মধ্যে সর্বাঙ্গীণ নিয়ন্ত্রণের নাগপাশ যত আঁটিয়া বসিবে, সাহিত্যের প্রাণ ততই ওষ্ঠাগত হইতে থাকিবে এবং অবশেষে একদিন সাহিত্য সাধনোচিত পরিণাম লাভ করিবে। তখন তার মৃতদেহটাকেই পাঠকে জীবন্ত সাহিত্য মনে করিবে, বলিবে মরে নাই, বেশ নড়াচড়া করিতেছে, প্রাণশক্তিতে নয়, সরকারী হুকুমের বৈদ্যুৎ প্রেরণায়। "এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন, এসেছে সেদিন এসেছে"—অন্য দেশে।

৩৮

সমাজতন্ত্র ও সাহিত্য

সাহিত্যে নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে অনেক কয়খানি পত্র হস্তগত হইয়াছে, পত্রপ্রেরকগণ জানিতে চাহিয়াছেন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিল্প ও সাহিত্যের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে। প্রশ্নটি দুরূহ, উত্তর জটিল, যথাসাধ্য মীমাংসার চেষ্টা করিব। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিতে বুঝি, যে রাষ্ট্রে জীবন ও সমাজ পূর্বনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে নিয়ন্ত্রিত। বর্তমানে সমস্ত রাষ্ট্রই অল্পবিস্তর নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে, নামে না হইলেও কাজে সমস্ত রাষ্ট্রই সমাজতান্ত্রিক, তবে কম আর বেশি। যখন নিয়ন্ত্রণ চরমে পৌছায় তখন রাষ্ট্রকে বলি Totalitarian রাষ্ট্র, যেমন ধরুন সোবিয়েৎ রাশিয়া; ইংলণ্ড অন্যপ্রান্তে দণ্ডায়মান; মাঝখানে ভারত; এখানে পাশাপাশি নিয়ন্ত্রণ ও আধানিয়ন্ত্রণ Public Sector ও Private Sector নামে চলিতেছে। তবে ঝোঁকটা ক্রমশঃ নিয়ন্ত্রণের দিকেই। অন্যান্য রাষ্ট্রকে এই তিনের মধ্যে যে-কোন ফাঁকে ফেলা যাইতে পারে। তবেই দেখা যাইতেছে যে নিয়ন্ত্রণ-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র আজ নাই বা না থাকিবার মতোই, আরও মনে হয় পৃথিবীময় ঝোঁকটা ক্রমশঃ নিয়ন্ত্রণের দিকে চলিয়াছে। এখন, এহেন অবস্থায় শিল্প ও সাহিত্যের পরিণাম চিন্তা করিতে হইবে। আগে বলিয়াছি যে সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণের ছোঁয়াচ এড়াইয়া চলা শিল্প সাহিত্যের পক্ষে সম্ভব নয়। Totalitarian রাষ্ট্রে ঐ দুই বস্তু রাষ্ট্রনায়কগণের কবলগত, অন্য দেশে কবলগত না হইলেও পকেটগত, আবার কোন কোন রাষ্ট্রে ঐ দুই বস্তু অপেক্ষাকৃত স্বাধীন হইলেও আঠার শতকের ফরাসী এনসাইক্লোপিডিষ্টগণের ন্যায় সরকারবিরোধী নয়, বেশ একটু পোষমানা, মানে অধীনে স্বাধীন গোছের।

আজকার দিনে পৃথিবীময় সাহিত্য ও শিল্পের অবনমন দেখিতে পাই। তাহার সঙ্গে পূর্ববর্ণিত অবস্থার কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে কিনা বিচার্য বিষয়।

আমার ধারণা এ দু'য়ে যোগাযোগ কার্যকারণগত ও ঘনিষ্ঠ। যে-সব কারণে সাহিত্যের আজ এমন হেনস্তা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ তন্মধ্যে প্রধান। অন্য দুটি কারণ: অবকাশভোগী যে সম্প্রদায় সর্বদেশে এ পর্যন্ত সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে তাহার ক্রমিক লোপ এবং যন্ত্রবহুলতার ফলে চিকিৎসকগণ কর্তৃক কথিত "Stress" নামে মানুষের দৈহিক ও মানসিক পীড়া। এখন এই তিনে মিলিয়া—এই তিনও আবার কার্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ, এমন মানসিক ও আধ্যাত্মিক অরাজকতার সৃষ্টি করিয়াছে, যাহাতে সাহিত্য শিল্প প্রভৃতির সৃষ্টি অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে আর অবস্থা উত্তরোত্তর অধিকতর অবনতির দিকে চলিয়াছে। যে রাশিয়ায় এক সময়ে পুশকিন, গোগল, টলস্টয় প্রভৃতির জন্ম সম্ভব হইয়াছে এখন সেখানে তাঁহাদের সমকক্ষ কেহ আছে কি? অনেকে বলিবেন অবশ্যই আছে, অমুক, অমুক আছেন। রুচির ব্যাপারে তর্ক বৃথা। অমুককে যে টলস্টয়ের মতো মনে হইতেছে তাহার দুটি কারণ, ইতিমধ্যে পাঠকের রুচিও হীনমান হইয়া পড়িয়াছে, যেমন হইয়াছে ইতিমধ্যে লেখকের কলম হীনবীর্য, তা ছাড়া সঙ্গে আছে রাষ্ট্রের ইঙ্গিত। অমুক বড় লেখক বলিলে তাহার বড়ত্ব স্বীকার করিতেই হইবে।

পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাস পড়িলে দেখা যাইবে যে তাহার উদ্ভবের পরিবেশ বড় বিচিত্র, দেখা যাইবে যে রাজতন্ত্র, সাম্রাজ্যতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, গণতন্ত্র কিছুই মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির প্রতিকূল নয়। রাণী এলিজাবেথের যুগে সেক্সপীয়র, রাজা চতুর্দশ লুইয়ের যুগে মলিয়ের, ফরাসী বিপ্লবের পূর্বাহ্নে ভলতেয়ার, খণ্ডিত জার্মাণীতে গ্যেটে, ইটালীর অরাজকতার যুগে দান্তে, বিক্রমাদিত্যের যুগে কালিদাস: বহুনিন্দিত রুশিয়ার জারদের আমলেই শ্রেষ্ঠ রুশ সাহিত্য, এমন কি রাজনৈতিক পরাধীনতাও শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টির অন্তরায় নয়, ইংরাজ আমলে মধুসূদন বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্য সৃষ্টির একমাত্র প্রতিকূল অবস্থা আষ্টেপৃষ্ঠে নিয়ন্ত্রিত সমাজ। সেকালের স্পার্টা সাহিত্যে বন্ধ্যা, এথেন্স নগরী জগৎপূজ্য কৃতী সাহিত্যিকগণের জননী। অনেকে বলিবেন যে এযুগে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ ছাড়া জীবনধারণ সম্ভব নয়। উত্তম। তবে কিনা জীবনধারণের জন্য কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইতে হইবে। সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধতা করা আমার উদ্দেশ্য নয়, কেবল সমাজতন্ত্রকে স্বীকার করিয়া লইলে যে-অবস্থা অবশ্যম্ভাবী তাহাই

বলিতেছি। তখন সেই সর্বতোভাবে সুনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রে সাহিত্যের স্থান গ্রহণ করিবে জর্ণালিজম্, আর্টের স্থান গ্রহণ করিবে ক্র্যাফ্‌ট, বিজ্ঞানের স্থান গ্রহণ করিবে টেক্‌নোলজি, ধর্মের স্থান গ্রহণ করিবে পার্টির প্রতি আনুগত্য, আর ভগবানের স্থান গ্রহণ করিবে রাষ্ট্র। সুনিপুণ প্রচার পূর্ব ঐতিহ্য ভুলাইয়া দিবে। কাজেই দুধের বদলে পিটুলিগোলাপায়ী বালক অশ্বত্থমার ট্রাজেডি বুঝিবার লোকেরও অভাব হইবে। রাষ্ট্র বলিবে "কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্জে কাঠায় কুড়বা কাঠায় দিজ্জে" সুমহৎ সাহিত্য, দেশশুদ্ধ লোক বলিবে এমনটি আর হয় না। সমাজতন্ত্র ধনবৈষম্য দূর করিতে পারিবে কি না জানি না, তবে রুচিবৈষম্য একপ্রকার ঘুচাইয়া দিয়াছে। এখনই পাঠকের রুচি দেখিলে বয়স ও বিদ্যার পার্থক্য বোঝা যায় না, কেবল অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে "রাজা কি রাখাল, ছিল কোন কাল, এখন মড়ার মাথার কপাল!"

৩৯

ইংরাজি কি ভারতীয় ভাষা?

'মাতৃভাষা সংরক্ষণ সঙ্ঘ' প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ইংরাজিকে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবহার্য ভাষারূপে রক্ষা করা হোক। প্রস্তাবটি অত্যন্ত সমীচীন ও পরিবেশের উপযোগী। এখন ইংরাজি ভাষাকে অন্যতম ভারতীয় ভাষারূপে স্বীকার করিয়া লইলে ইংরাজির দাবী কি আরো পাকা হয় না? ইংরাজি বিদেশী ভাষা বলিয়া অনেকে যে গ্লানি অনুভব করেন তাহার কি মূলোচ্ছেদ হয় না? 'মাতৃভাষা সংরক্ষণ সঙ্ঘ' ইংরাজিকে অন্যতম ভারতীয় ভাষারূপে গণ্য করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ দিলে কাজটি অনেক সহজ হইয়া আসিবে। বস্তুতঃ অন্যতম ভারতীয় ভাষারূপে গণ্য হইবার পক্ষে ইংরাজির যথেষ্ট দাবী আছে। সে দাবীর পক্ষে নানা জনে গুরুতর কারণ দর্শাইয়াছেন; ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে নেতৃস্থানীয়গণ সে দাবী বিবৃত করিয়াছেন; এই আসরেও অনেকবার আলোচনা হইয়াছে; আপাততঃ সে প্রসঙ্গ তুলিব না। কিন্তু মূল কথাটা এই যে, ইংরাজিকে রাষ্ট্রভাষা রাখিবার

পক্ষে প্রধান মানসিক অন্তরায় তাহার অভারতীয়ত্ব অপবাদ। এই অমূলক অপবাদ না থাকিলে খুব সম্ভব ইংরাজিই একমাত্র বা অন্যতর রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃত হইয়া যাইত। কাজেই ইংরাজি সত্যই অভারতীয় ভাষা কি না, ভারতীয় ভাষারূপে গণ্য হইবার তাহার অধিকার কতখানি বাস্তব সে বিষয়ে মাতৃভাষা সংরক্ষণ সঙ্ঘের মনঃস্থির করা আবশ্যক। নতুবা কেবল ইংরাজি কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবহার্য ভাষারূপে রক্ষিত হোক প্রস্তাবে উদ্দেশ্যসিদ্ধ হইবে না। এই সঙ্ঘের সদস্যগণের অধিকাংশই সাহিত্যিক ও শিক্ষাব্রতী, প্রত্যক্ষতঃ রাজনীতির সঙ্গে যোগ অনেকেরই নাই, কাজেই তাঁহাদের পক্ষে অন্যনিরপেক্ষ-ভাবে মনঃস্থির করা কঠিন নয়। সেইজন্যই তাঁহাদের অনুরোধ করিতেছি।

অনেকের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে ইংরাজির প্রাধান্য থাকিলে মাতৃভাষার গৌরব ও উন্নতি ব্যাহত হইবে। এরূপ মারাত্মক ভ্রান্তি সত্যই শোচনীয়। দেড় শ' বছর আগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অবস্থা কি ছিল! তখন বাংলা দেশে ইংরাজির অপ্রতিহত প্রতাপ, ঘরে বাইরে, স্কুলে কলেজে, সভা সমিতিতে, চিঠিপত্রে ও সাহিত্যে ইংরাজির চৌঘুড়ি চার পা তুলিয়া ছুটিয়াছে। কই, তার ফলে তো অসহায় বাংলা ভাষা পথে চাপা পড়িয়া মরে নাই। ইংরাজির মতো পরিণত ও রাজসহায় ভাষার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াই বর্তমান বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শ্রী ও শক্তি লাভ করিয়াছে। এক সময়ে উল্টো সম্ভাবনাও ছিল। ইংরাজির বদলে সংস্কৃত ও আরবি ফারশি অবশ্যপাঠ্য হইলে আজ দেশের কি অবস্থা হইত! খুব সম্ভব বাংলা সাহিত্য এখনো পাঁচালী ও ধামালীর গোয়ালে জাবনা চিবাইয়া জন্ম সার্থক করিত। সাঁওতালী ও কোল ভীলের ভাষা ইংরাজির প্রভাবের মধ্যে পড়ে নাই, তাহাদের কি খুব উন্নতি হইয়াছে? ছোঁয়াচ এড়াইয়া জাতি রক্ষার কথা এযুগে বাতুলে ছাড়া আর কেহ চিন্তা করে না। শক্তিশালী ভাষার সংস্পর্শে আসিলে ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি জাগ্রত হইয়া ওঠে। গ্রীক সাহিত্যের সংস্পর্শে আধুনিক ইউরোপের ভাষা 'মানুষ' হইয়া উঠিয়াছে। ইংরাজি সাহিত্যের সংস্পর্শেই বাংলা সাহিত্যের নবজীবন লাভ। এখন যদি উল্টা সরস্বতী আমাদের মাথায় ভর করে তবে বুঝিতে হইবে যে বাংলা ভাষার তথা অন্যান্য ভারতীয় ভাষার দুর্দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। সর্বজনীন ভাবে ইংরাজি বর্জন না করিবার পক্ষে ইহা অন্যতম কারণ। সত্য কথা এই যে, যদি কোন ভারতীয় ভাষা

৬

এখনো অপরিণত থাকে, তবে তার কারণ ইংরাজির স্পর্শদোষ নয়, ইংরাজির স্পর্শদোষের অভাব। কাজেই ঐ অমূলক ভয়টা গোড়ায় ত্যাগ করিয়া কাজে নামা আবশ্যক। নতুবা পদে পদে জাত বাঁচাইতে গিয়া কৃপার পাত্রে পরিণত হইতে হইবে।

৪০

আফিঙ ও অমৃত

কোন বিদেশী যদি কলিকাতার পথেঘাটে ঘুরিয়া বেড়ায়, আমাদের দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকাগুলি পড়ে (অবশ্য তাহাকে বাংলা ভাষাটা জানিতে হইবে, তবে তাহার ধারণা হইবে কালচার বা সংস্কৃতির প্রতি এমন আগ্রহ পৃথিবীর আর কোথাও নাই। পথেঘাটে স্তম্ভে প্রাচীরে "সাংস্কৃতিক" সভা-সমিতি সম্মেলনের কত বিজ্ঞাপন, কত বিবরণ। দৈনিক পত্রিকাগুলিতে পূর্ববর্তী ঘোষণা ও পরবর্তী রিপোর্ট। আর সাময়িক পত্রিকাসমূহের অনেক-গুলির উহাই একমাত্র উপজীব্য—তা ছাড়া এমন সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা অল্প নয়, কালাজ্বরের রোগীর প্লীহাভরা পেটের মতো যাহাদের সবটাই সংস্কৃতিতে পূর্ণ। মোটকথা উক্ত বিদেশীর মনে হইবে যে বাংলাদেশের সমস্তটা সংস্কৃতি-বামনের দুই পায়ে আচ্ছন্ন, তৃতীয় পাখানা তিনি কোথায় স্থাপন করিবেন চিন্তা করিতেছেন, খুব সম্ভব বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজ উহা মস্তকে ধারণ করিয়া রসাতলে যাইবার জন্য উদ্যত।

কিন্তু সেই সঙ্গে উক্ত বিদেশী এই "সংস্কৃতিসম্পন্ন" নগরের হালচাল দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া হতভম্ব হইবে, দেখিবে যে আমাদের পথঘাট নিতান্ত নোংরা, ঘরবাড়ীর চেহারা ও পরিবেশ কুৎসিত (ধনীদের ঘরবাড়ীর কথাই বলিতেছি), ট্রামে বাসে উঠিতে ঠেলাঠেলি করিয়া, জনতাকে জনযুদ্ধে পরিণত করি, পোষাকআশাকে এমন প্রমাদজনক বৈচিত্র্য যেন একটা চলন্ত Fancy Fair, শুনিবে আমাদের শিক্ষিত জনের মুখেও প্রকাশ্যে প্রাকৃত ভাষা, তারস্বরে ঘোষিত ইতর বোম্বাই মার্কা হিন্দি গান শিক্ষিত বাঙালী সানন্দে শুনিতেছে (বাঙালী আজি গানের রাজা), শুনিবে যে একটা ফুটবল প্রতিযোগিতা আমরা

লাঠালাঠি না করিয়া সাঙ্গ করিতে পারি না, শুনিবে যে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতার কোন শাসন নাই, নানাপ্রকার অনাচারের বিরুদ্ধে কেহ যদি কখনো প্রতিবাদ করে তবে আমরা তাহা শুনি না, আর সেই "কেহ" যদি বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমা বহির্ভূত ব্যক্তি হয় তবে অনধিকার চর্চার জন্য তাহাকে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি করিয়া গালি পাড়িয়া তুলো ধুনিয়া দিই, তখন দিন কয়েকের জন্য সেই গালিদাতা আমাদের পূজ্য বীর হইয়া দাঁড়ায়, কিন্তু বেশিদিন নয় দুদিন বাদে তাহাকেও টানিয়া নামাইয়া স্বস্থানে স্থাপন করি; আর সেই বিদেশী যদি আমাদের সাহিত্যের পরিচয় লাভ করে তবে দেখিতে পাইবে যে বাংলা সমাদৃত পুস্তকগুলি রঙীন মলাটে মোড়া হাতে-গরম নরমাংসের সিংগাড়া! উক্ত বিদেশী স্তম্ভিত হইয়া যাইবে। একদিকে সংস্কৃতির প্রতি এই উৎকট আগ্রহ, আর একদিকে জীবনের এই বিচিত্র রূপ। দু'য়ের সমন্বয় করিতে সক্ষম না হইয়া পাছে তাহার মধ্যেও অবাঞ্ছনীয় পরিবর্তন দেখা দেয় ভয়ে অচিরে সে এদেশ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে বলিয়া মনে হয়।

পাঠক, আমি যে কাল্পনিক বিদেশীর চিন্তাসূত্রের কথা পাড়িলাম তাহা কি সত্যই কাল্পনিক, তাহার কালিমা কি সত্যই বাস্তবের চেয়ে গাঢ়তর; সত্যই কি আমি বাস্তবকে বহুদূর লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছি? পাঠক, একাকী বসিয়া চিন্তা করিয়া উত্তর দাও, এই উত্তরের উপরে বহুল পরিমাণে বাঙালী সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। অনেকে বলিবেন, কমলাকান্ত তোমার এত মাথা-ব্যথা কেন, যেমন চলিতেছে চলুক না, দেশতো তোমার একার নয়, মাঝে থেকে খামোকা প্রতিবাদ করিয়া লোকের অপ্রীতিভাজন হইতে যাও কেন? উপদেশটা নিতান্ত ভুল নয় এবং তাহা যথাসাধ্য পালন করিতেও চেষ্টা করি। মাসের মধ্যে উনত্রিশ দিন চুপ করিয়া থাকিয়া ভালোমানুষ বলিয়া যে সুনাম অর্জন করি একদিনের চীৎকারে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। দেশ কাহার? যে নিজের মনে করে তাহার।

হায়, সংস্কৃতির নামে এ আফিঙ আমাদের কে ধরাইল! নিজে আফিঙ-খোর বলিয়া তাহার দুর্গতি জানি, জানি যে তাহার কল্পনা আকাশ-কুসুমের মতো অবাস্তব, জানি যে আফিঙখোরের লক্ষ মুদ্রার স্বপ্নবিলাসের চেয়ে ভিক্ষুকের তণ্ডুল মুষ্টির মূল্য অধিক, জানি বলিয়াই বলিতেছি এ সংস্কৃতি নয়, এ আফিঙের নেশা, জানি বলিয়াই বলিতেছি এ চরিতার্থতার পথ নয়, আত্ম-

৬

হত্যার অন্ধকূপ। জানি বলিয়াই বলিতেছি বাঙ্গালীকে যখনি এই নেশায় পাইয়াছে তখনি তাহার সর্বনাশ হইয়াছে। এমন একবার হইয়াছিল লক্ষ্মণ সেনের সময়ে আর একবার হইয়াছিল কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে; একবার মুসলমান বিজয়, একবার ইংরেজ বিজয়! আবার না জানি কপালে কি আছে, অপরং কি ভবিষ্যতি।

সংস্কৃতি আফিঙ নয়, সংস্কৃতি অমৃত। সে বস্তু যে পান করে তাহার সাকুল্য পরিবর্তন ঘটে, বাহ্য রূপে ও জীবনে তাহার এমন হেরফের থাকে না। আর সে বস্তু অমৃত বলিয়াই তাহা দুর্লভ, হাটে মাঠে যত্রতত্র "সাংস্কৃতিক মুখপাত্রের" কাগজের ঠোঙায় তাহা বিকায় না, তাহা সাধনলভ্য। কোথায় আজ সেই সাধনা! 'বিষয়ামৃতমগ্ন্যুতে'। দুগ্ধের বদলে পিটুলিগোলা জল পান করিলে এমন অপূরণীয় ক্ষতি হয় না, কারণ পিটুলি দুধ না হইলেও চাউলের মূল্য হইতে বঞ্চিত নয়। কিন্তু অমৃতের বদলে আফিঙ অচল। একটা জীবনের হাঁ-এর দিক, একটা না-এর দিক। হাঁ-এ না-এ মেলে না। অমৃতের বিকল্প নাই। সংস্কৃতিরও বিকল্প সম্ভব নয়।

৪১

সাহিত্যিকগণের জীবনবীমা

বাংলা সাহিত্যের একটি প্রধান সমস্যা পরিণত বয়সে সাহিত্যকগণের আর্থিক দুরবস্থা। পরিণত বয়সের ক্ষয়িত শক্তিতে অনেক সাহিত্যিককে সরকারের কাছে হাত পাতিতে হয়, অনেককে পরাশ্রয়ী হইয়া থাকিতে হয়, অধিকতর দুর্দশার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। ইহার কোন প্রতিকার আছে কি? সরকারের এমন সাধ্য আছে কি যে সকলকে সাহায্য করেন? আর থাকিলেই বা সরকারী সাহায্যকে অনুকূলে টানিয়া আনা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। সাহিত্যে পেন্সন নাই, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড নাই, বোনাস নাই, গ্র্যাচুইটি নাই, আছে নিন্দা, প্রশংসা বা উদাসীনতা, আর আছে কিছু কিছু টাকা। সে টাকাও আবার ক্ষণিক। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র বা শরৎচন্দ্রের গ্রন্থের কথা

স্বতন্ত্র, কিন্তু অপরের লিখিত বাংলা বইয়ের পরমায়ু কত? এমন জনপ্রিয় পুস্তকের সংখ্যা আঙুলে গোনা যায় যাহার পরমায়ু কুড়ি বছরের বেশি। মোটের উপর বলা যায়, ব্যতিক্রম বাদ দিয়া যে, বাঙালী গ্রন্থকারের আয়ু বাংলা গ্রন্থের আয়ুর চেয়ে অধিক। বিপদ সেখানেই। দু-চারখানি জনপ্রিয় গ্রন্থ লিখিয়া তাহার আয়ে চিরকাল সংসার চালাইবার সৌভাগ্য অল্প লেখকের ভাগ্যেই ঘটে। অধিকাংশ লেখক দিন-আনে-দিন-খায়, দিন-লেখে-দিন-খায়, Pen to Mouth জীবন কাটাইতে বাধ্য হয়। তারপরে পরিণত বয়সে কিম্বা রোগের দরুণ কলম অচল হইয়া পড়িলে তাহাদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। অবস্থাকে আরও জটিল করে সাহিত্যিকদের বৈষয়িক বিষয়ে অজ্ঞতা বা উদাসীনতা (এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম বর্জনীয়)। ফলে সাহিত্যিকগণের পরিণত বয়স বড়ই শোচনীয়। প্রত্যেক ব্যাপারে ভিক্ষাপাত্র হাতে সরকারের কাছে উপস্থিতি আমি পছন্দ করি না। ভিক্ষা যে-নামেই আসুক গ্লানিকর। তবে উপায় কি?

বৈষয়িক বুদ্ধিতে কমলাকান্তের খ্যাতি নাই। বিষয়ী সাহিত্যিকগণ, সাহিত্যবিষয়িগণ ও সাহিত্য ব্যবসায়িগণের চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। নিখিল ভারত সাহিত্য সম্মেলনের কর্মকর্তাগণের এবিষয়ে অবহিত হওয়া আবশ্যক। বিষয়টি তাঁহারা যদি কর্মসূচীর অন্তর্গত করিয়া লইয়া, কোন একটা উপায় আবিষ্কার করিতে পারেন, তবে তাঁহারা সাহিত্যজগতের মহোপকার করিবেন। আশা করি আমার প্রবন্ধ তাঁহাদের চোখে পড়িবে ও মনে পৌঁছিবে।

যাই হোক এবিষয়ে আমার অনভিজ্ঞ চিন্তার ফল নিবেদন করিতেছি, কোন সম্ভাবনা থাকিলে বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে। সাহিত্যিকগণের জন্য কোন একপ্রকার জীবনবীমার পরিকল্পনা করা সম্ভব কি না? বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত "হিন্দু ফ্যামিলি এনুইটি ফাণ্ড" নামে একটি জীবনবীমা সংস্থা আছে। সাহিত্যিকদের জন্য ঐরূপ কিছু করা অসম্ভব কেন হইবে? সাহিত্যিকগণ মাসে মাসে কিছু কিছু প্রিমিয়াম বা চাঁদা দিয়া যাইবেন, নির্দিষ্ট সময় অন্তে বা অশক্ত হইয়া পড়িলে উক্ত সংস্থা সাহিত্যিকগণকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মাসে মাসে নির্দিষ্ট অর্থ দিয়া যাইবে। বর্তমান মুহূর্তে আমার ধারণা ইহার চেয়ে স্পষ্ট নয়। কিন্তু ইহার ব্যবসায়িক সম্ভাবনা আছে বলিয়াই মনে হয়। এরূপ

কিছু করা সম্ভব হইলে সাহিত্যিককে দুর্দশা হইতে এবং সাহিত্যকে অবাঞ্ছিত প্রভাব হইতে রক্ষা করা যাইবে। যাঁহাদের ব্যবসা বুদ্ধি আছে তাঁহারা যদি এবিষয়ে একটু চিন্তা করেন এবং চিন্তার ফল সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশ করেন, তবে বিষয়টা স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে আশা করা যায়।

৪২

যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়

সেদিন ধাপার মাঠের দিকে বেড়াইতে গিয়াছি, দেখি যে খালের ধারে একজন লোক মাছধরা উপলক্ষ্যে আত্মচিন্তায় নিমগ্ন। বাস্তবিক আত্মচিন্তার প্রকৃষ্ট অবসর মাছধরার উপলক্ষ্য। কাছে গিয়া চমকিয়া উঠিলাম, এ কি এ-যে একজন হাফ-বিখ্যাত সাহিত্যিক। কিন্তু বড়শি কোথায়? তবে তো মাছ ধরা নয়, ব্যাপার কি? দেখিলাম তাঁহার ভাবটা যেমন উদ্বিগ্ন, তেমনি শঙ্কিত। শুধাইলাম খবর কি?

তিনি বলিলেন, বড়ই দুঃসংবাদ, চারদিক হইতে চাপিয়া ধরিবার চেষ্টা চলিতেছে। কণ্ঠস্বর নীচু করিয়া শুধাইলাম, পাওনাদার নাকি?

ঠিক উল্টা, দেন্দার।

তবে তো আনন্দের কথা। এখানে আসিয়া পালাইয়া থাকিবার কারণ কি? তিনি বলিলেন, ভায়া দেন্দার অনেক রকম, এ-রকমটা ঠিক আমার পছন্দ নয়। দেখিলাম যে, রহস্য ক্রমেই গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছে, বলিলাম, দাদা, আমি সাহিত্যিক নই, সরলভাবে বুঝাইয়া বলুন।

সাহিত্যিক যে নও তাহা তো দেখিতেই পাইতেছি, সাহিত্যিক হইলে নিশ্চয়ই আমার মতো পালাইতে। যাক্‌, ব্যাপার বুঝাইয়া বলিতেছি।

এই বলিয়া তিনি আরম্ভ করিলেন। আকাদামি ও রবীন্দ্র পুরস্কার লইয়া বাংলা সাহিত্যের জন্য ১৪।১৫টা পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছে এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে বৃদ্ধ হইতে তরুণতম পর্যন্ত প্রায় সমস্ত সাহিত্যিকই একটি না একটি একবার না একবার পুরস্কার পাইয়াছেন। এখন একজন সাহিত্যিকের

পক্ষে একাধিকবার একই পুরস্কার লাভ আইনসম্মত না হওয়ায় এবং প্রায় সমস্ত সাহিত্যিক পুরস্কার লাভ করায় এক জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। সমস্যার গুরুত্ব বুঝিতে পারিবে যদি ভাবিয়া দেখো যে, আমার মতো হাফ-বিখ্যাত সাহিত্যিকেরও পুরস্কার গ্রহণের জন্য তলব পড়িয়াছে। আমার লিখিত পুস্তকের নাম কেহ জানে না, আমার নামও তথৈবচ, এমত অবস্থায় হঠাৎ যখন অমুক পুরস্কারের এজেন্ট আমার ঘরে উপস্থিত হইয়া পুরস্কার গ্রহণের জন্য কাকুতি-মিনতি আরম্ভ করিল তখন কি মনে হইল জানো? আমাকে নীরব দেখিয়া তিনি নিজেই উত্তর দিলেন, অনূঢ়া কুলীন কন্যার (বৃদ্ধার) পাণি-গ্রহণের জন্য ডাকসাইটে কুলীনকে যেন অনুরোধ করা হইতেছে। তার পরে তিনি একটু থামিয়া বলিলেন, না, ঠিক হইল না, সেকালে একজন কুলীন একশ নারীর পাণি-গ্রহণ করিতে পারিত, পুরস্কার ব্যাপারে তাহা অচল। আর একদিনের কথা শোনো, লালদীঘির লাল বাড়ীটার সামনে দিয়া যাইতেছি, হঠাৎ সোরগোল শুনিয়া পিছনে তাকাইয়া দেখি জন দুই মন্ত্রী ও জনকয়েক শান্ত্রী আমার দিকেই ছুটিয়া আসিতেছে—ধর্ ধর্ রব। একজন আসিয়া হাত ধরিতেই বলিলাম আমি তো চোর নই। সে লোকটা বলিল, তা কি আর জানি না! চোর এমন অসহায়ভাবে পথে ঘুরিয়া বেড়ায় না, তাহারা কোন-না-কোন অফিসে ডাইনে বা বাঁয়ে কোন না কোন দিকে হেলিয়া দিব্য বসিয়া থাকে। তা যদি জানো তবে আমাকে কেন? আরে তুমি যে সাহিত্যিক, তোমাকে পুরস্কার গ্রহণ করিতে হইবে। কেন, সাহিত্যিকের অভাব কিসের?

সকলে পাইয়া গিয়াছে। সাপ্লাই ও ডিম্যাণ্ড নীতির মধ্যে এক্ষেত্রে ডিম্যাণ্ড ফেল পড়িবার মতো।

আমি বলিলাম দু' চার বছর না দিলেই হয়। তখন সেই মন্ত্রী বা শান্ত্রী (চেহারার প্রভেদ বুঝিলাম না) বলিল, আ রে পুরস্কারযোগ্য লোক না জুটিলে অন্য প্রদেশের লোকে যে হাসিবে। কোনরকমে তাহার হাত ছাড়াইয়া পালাইয়া আসিলাম। আর একটা ঘটনা বলি, এ আমার দেখা নয়, শোনা। একজন সাহিত্যিকের উপর অনেকদিন হইতে কর্তাদের নজর ছিল, কিন্তু কিছুতেই লোকটা ধরা দেয় না। অবশেষে পুরস্কারদাতাদের সৌভাগ্যবশতঃ লোকটা গাড়ী চাপা পড়িয়া হাসপাতালে গেল, আর

৮

পালাইবার উপায় রহিল না। আর কি, তখন তাহার বুকে পদকটা আঁটিয়া দেওয়া হইল। সত্য কথা বলিতে কি, পাছে বেঘোরে পুরস্কৃত হইয়া পড়ি তাই লোকালয় ছাড়িয়া ধাপার মাঠে আশ্রয় লইয়াছি।

আমি শুধাইলাম, পুরস্কৃত হইলে ভয়টা কি? পুরস্কার না লইবার পক্ষে আপনার নীতিটা শুনিতে পাই কি? তিনি বলিলেন, পুরস্কার না লইবার পক্ষে কোন নীতি থাকিতেও পারে আবার না থাকিতেও পারে—কিন্তু যে নীতিতে বর্তমানে পুরস্কার প্রদত্ত হয় তাহা আমার পছন্দ নয়। সত্য কথা বলিতে কি......কিন্তু সত্য কথা বলিবার আর অবকাশ ঘটিল না। হঠাৎ তিনি প্রাণপণে ছুটিতে লাগিলেন। চীৎকারে শুধাইলাম, পালান কেন? তিনি ইঙ্গিতে অদূরবর্তী একটা লোককে দেখাইয়া দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। লোকটা কাছে আসিয়া পড়িলে শুধাইলাম, আপনি কে?

আমি পুরস্কারের জন্য সাহিত্যিক সন্ধানী এজেণ্ট। তারপর হতাশ হইয়া বলিলেন, লোকটার প্রতি অনেকদিন হইতে নজর আছে। কিছুতেই ধরিতে পারিতেছি না, আজো পালাইল। তারপরে শুধাইল, আপনি কে?

আমি কমলাকান্ত। সে তখন নথী ঘাটিয়া বলিল, হতাশ হইবেন না, আপনার turn-ও আসিতেছে। আনন্দে সেই শীতের অপরাহ্নে ঘামিয়া উঠিলাম।

৪৩

বাংলা সাহিত্য কি অবসাদগ্রস্ত?

কয়েক দিন আগে এক সাহিত্যিক সম্মেলনে যোগদানের সৌভাগ্য কমলাকান্তের ঘটিয়াছিল। কমলাকান্ত স্বয়ং সাহিত্যিক না হইলেও সাহিত্যিকগণের সঙ্গে ওঠাবসা করে, খুব সম্ভব সেই কারণেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। সভায় গণ্যমান্য প্রবীণ নবীন অনেক সাহিত্যিক আসিয়াছিলেন—এরকম নিছক সাহিত্যিক সম্মেলন অনেক কাল হয় নাই, সভার উদ্যোক্তাগণ বিশেষ প্রশংসার পাত্র।

সভায় দু'জন মনীষী সাহিত্যিক দুটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধ দুটিতে অনেক ভাবিবার কথা ও জানিবার কথা ছিল। কিন্তু কোন কোন মন্তব্য প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করার যোগ্য নয়। সবিনয়ে ও সশ্রদ্ধভাবে প্রতিবাদ করা কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি।

প্রধান বক্তা চিন্তাশীল সাহিত্যিক শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন—

"লোকে আশা করেছিল দেশ স্বাধীন হলে নতুন যুগ আসবে জীবনের সবক'টা বিভাগে। অতএব সাহিত্যেও। সাত বছর পরে দেখছে সে আশা পূর্ণ হয়নি। নতুন যুগ আসেনি জীবনের কোনো বিভাগেই। সাহিত্যেও না। ভাবছে কারণটা কী? দোষ দিচ্ছে একে তাকে ওকে, স্বাধীনতাকেও সন্দেহ করছে।"

স্বাধীনতার পরে জীবনের কোন বিভাগে উদ্দীপনা আসে নাই—সাহিত্যেও নয়—এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিলাম না। সাহিত্যে সত্যই যদি নূতন উদ্দীপনা না আসিয়া থাকে, তবে সে দোষ স্বাধীনতার নয়, সাহিত্যিকগণের। কিন্তু সাহিত্যিকগণকেও আমি দোষী করিতে চাই না, কারণ বর্তমান মুহূর্তে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যত নূতন পরীক্ষা, নূতন পথের সন্ধান চলিতেছে, এমন আর কোন পর্বে ঘটে নাই। তবে যদি আমরা আর একজন রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র বা মধুসূদন প্রত্যাশা করিয়া থাকি, সে দোষ স্বাধীনতার নয়, সাহিত্যিকগণেরও নয়, সে দোষ ঐ প্রত্যাশার। বীরবলের ভাষায় এ যুগ বহুশক্তিমান স্বল্পসংখ্যক লেখকের নয়, স্বল্পশক্তিমান বহুসংখ্যক লেখকের এই যুগ। ঠিক আজকার দিনে সাহিত্যের নানা বিভাগে যতগুলি শক্তিমান লেখক আছেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর ও নূতন উদ্দীপনার লক্ষণ।

কিন্তু যদি ধরিয়াই লই যে, সাহিত্যে সত্যই কোন নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার হয় নাই, তাহাতেই বা কি! সাহিত্য জাতীয় চিত্তবিকাশের অন্যতম পথ, একমাত্র পথ নয়। স্বাধীনতার পর হইতে ভারতীয় প্রাণশক্তি প্রধানতঃ বৈষয়িক উন্নতির খাতে আপনার সার্থকতা সন্ধান করিতেছে, কাজেই সাহিত্যের পথে গতি মন্দা হওয়া অসম্ভব নয়। লেখক ফরাসী বিপ্লবের উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ বিপ্লবের ফলে ফরাসী সাহিত্যে সত্ব সত্ব নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছিল কি? ফরাসী সাহিত্যের অন্যান্য পর্বের তুলনায় ১৭৮৯

হইতে ১৮২০ পর্যন্ত পর্বটি সাহিত্যিক উৎকর্ষে দীন নয় কি? কারণ আর কিছুই নয়, ঐ সময়ে ফরাসী জাতীয় প্রাণশক্তি ব্যাপকভাবে অন্য কার্যে নিযুক্ত ছিল, অস্ত্রের দ্বারা ফরাসী বিপ্লবের নীতিকে ইউরোপে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা তন্মধ্যে প্রধান।

আসল কথা বৃটিশ শাসন আমাদের বৈষয়িক উন্নতির পথ যে-ভাবে রুদ্ধ করিয়াছিল, মানসিক উন্নতির পথ সে-ভাবে রুদ্ধ করে নাই। কাজেই বৃটিশ শাসনকালে এদেশে নূতন সাহিত্য ও শিল্পের বিস্ময়জনক প্রগতি ঘটিয়া গিয়াছে, অথচ বৈষয়িক ক্ষেত্রে আমরা অনেক পিছনে পড়িয়া আছি। এ একটি ঐতিহাসিক অসাম্য। স্বাধীনতার পরে স্বভাবতই জাতীয় চিত্ত এই অসাম্য দূর করিবার জন্য উদ্যত। কালক্রমে এই অসাম্য বা ব্যবধান ঘুচিয়া আসিলে জাতি তখন আবার সুস্থভাবে সমানভাবে দুই পায়ে ভর দিয়া চলিতে থাকিবে। সাহিত্যে নূতন উদ্দীপনা নাই এ সিদ্ধান্ত স্বীকার না করিয়াও বলিতে চাই যে, এখন উদ্দীপনা বৈষয়িক উন্নতির খাতেই প্রবলতর। কোথাও কিছু আশার লক্ষণ নাই এমন নৈরাশ্যের বাণী গ্রহণ করিতে পারি না।

সভার সভাপতি সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রবীণ ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকার মন্তব্য করিয়াছেন—

"অর্থাৎ গত অর্ধ শতাব্দীর শেষ ৩০ বৎসরে রবীন্দ্রের প্রতিভায় ভাঁটা লাগার পর হইতে আমাদের বঙ্গ ভাষায় কাব্য ও উপন্যাস স্থায়ী মূল্যের একেবারে কিছুই সৃষ্টি হয় নাই। এক পুরুষ কালের অর্থাৎ ৩০ বৎসরেরও অধিক প্রতিভার বৃষ্টি বন্ধ, ফসলের অজন্মার অভিশাপ চলিয়াছে।"

সর্বনাশ! এই ঢালাও ফাঁসির হুকুম শুনিয়া সমবেত সাহিত্যিকগণ কি মনে করিয়াছিলেন জানি না, কিন্তু কমলাকান্ত বড়ই কৌতুক অনুভব করিয়াছিল। কেন তাই বলি। ৩০ বছর ধরিলে পূর্বতারিখ দাঁড়ায় ১৯২৫ সাল। ঐ সালের পরে রবীন্দ্রলেখনী ১৬ বছর সচল ছিল, ঐ সময়ে তাঁহার অনেক কাব্য ও উপন্যাস লিখিত হইয়াছে। সে সমস্তই নশ্বর! তাহাদের "স্থায়ী মূল্য" কিছুই নাই? এই ত্রিশ বছরের মধ্যে শরৎচন্দ্রের অনেক উপন্যাস, বিভূতিভূষণের সমস্ত উপন্যাস লিখিত হইয়াছে। সে সমস্তই অস্থায়ী? জীবিত সাহিত্যিকগণের উল্লেখ করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম, কারণ মৃতেরই যখন এ হেন দশা, জীবিতের কি আশা থাকিতে পারে? ভারতীয়

শিক্ষিত সমাজে আচার্য যদুনাথের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন, তৎসত্ত্বেও হতভাগ্য (হতভাগ্য আর কাহাকে বলে! ফাঁসির হুকুম হইয়া গিয়াছে যে) বাঙালী সাহিত্যিকগণের হইয়া দু'চারটা প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছি। গত ত্রিশ বছরে স্থায়ী যদি কিছুই রচিত না হইয়া থাকে, তবে ৫।৭ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত কোন কোন গ্রন্থকে তিনি যে 'মহাগ্রন্থ' বলিয়াছিলেন, তাহা কি? প্রতি বৎসর রবীন্দ্র-পুরস্কার সমিতির বিচারকরূপে তিনি যে পুরস্কার ঘোষণা করিতেছেন, তাহা কি তবে শ্মশানযাত্রী মুমূর্ষু কুলীন বরের গলায় অরক্ষণীয়া কুলীন কন্যার মাল্য সমর্পণ! আরও একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা কিন্তু সাহস পাইতেছি না। বাংলা ভাষায় প্রতি বৎসর রাশি রাশি বই প্রকাশিত হইতেছে, তাহাদের কতগুলি পড়িবার সুযোগ তাঁহার হইয়া থাকে? তাহা ছাড়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে নশ্বরতা ও অমরতার দাবী ও ইতিহাস বড় বিচিত্র। সে বিষয়ে এতটা নিঃসংশয় হওয়া কি উচিত না সম্ভব? ঘুটেকুড়োনীর ছেলে রাজপদে বসিতেছে এমন নজির সাহিত্যের ইতিহাসে সুপ্রচুর। সমালোচকের পথ ও ঐতিহাসিকের পথ এক নয়। ঐতিহাসিক যেখানে সিদ্ধান্ত করেন, সমালোচক সেখানে appreciation করেন। এ দু'য়ে মিলিয়া গেলে সব সময়ে সুফল হয় না। সাহিত্যবিচারে মনের মধ্যে একটু সংশয় থাকা মন্দ নয়।

আচার্য যদুনাথ প্রবীণ ও কৃতী পুরুষ। কোথায় তিনি বর্ষারম্ভে সাহিত্যিক সমাজকে উৎসাহ ও আশীর্বাদ দিবেন, না, একেবারে ঢালাও রায় দিলেন, তোমাদের জীবনের গত ত্রিশ বছর অফলা, কি না Waste Land! কমলাকান্ত জন্ম প্রবীণ হইলেও ঘোরতর অকৃতী, তাই অকৃতিত্বের নৈরাশ্য যে কি তাহা বোঝে। তাই বাধ্য হইয়া শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিকদ্বয়ের মন্তব্যের প্রতিবাদ করিতে সে বাধ্য হইল। কমলাকান্তের ধারণা এই যে, মধুসূদনের আত্ম-প্রত্যয়, বঙ্কিমের মনীষা বা রবীন্দ্রনাথের গভীর অন্তর্দৃষ্টি আর শীঘ্র ফিরিবে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যের দ্রুত বিস্তার ঘটিতেছে, গভীরতার অভাব ব্যাপ্তির দ্বারা, অন্তর্দৃষ্টির অভাব অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যের দ্বারা এবং form-এর perfection-এর অভাব form-এর অভিনবত্বের দ্বারা পোষাইয়া লইতেছে বাংলা সাহিত্য। নৈরাশ্যের কারণ তো নাই-ই, বরঞ্চ অনেক নৈরাশ্যের মধ্যে ইহাই একমাত্র আশার কারণ।

৪৪

সাংস্কৃতিক মাকু

সংবাদপত্রে একটি সংবাদ পড়িয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছি। আজকাল সংবাদপত্রে এমন সংবাদ প্রায়ই থাকে। সে-সব খবর পড়িলে কখনো মাথায় হাত দিতে হয় রোমাঞ্চ হইল কি না, কখনো চোখে হাত দিতে হয়, জাগ্রত না স্বপ্ন, আবার কখনো বা বুকে হাত দিতে হয় হৃৎপিণ্ড সচল না ইতোমধ্যে অচল হইয়া গিয়াছে!

খবর এমন কিছু নূতন নয়। পুরাতন এ পৃথিবীতে নূতন কি-ই বা সম্ভব। ভারত সরকারের অনুপ্রেরণায় একটি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল চীন দেশে প্রেরিত হইবে। চীন দেশ হইতে গত শীতকালে যে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিগণ আসিয়াছিলেন—ইহা তাহারই প্রত্যুত্তর। কাজেই দেখা যাইতেছে খবর পুরাতন—দেশে বিদেশে আজকাল সাংস্কৃতিক প্রতিনিধির মাকু চালাচালি হইতেছে—এবং তাহার ফলে চীনাংশুক বস্ত্র বয়ন হইয়া উঠিতেছে। অনেকে বলিবেন তাহা নয়, চীনাংশুকের চেয়ে এ বস্ত্র মূল্যবান, এ বস্ত্র হইতেছে রূপকথার রাজার অভিনব পোষাক।

বর্তমান দলটিতে সাতচল্লিশ জন প্রতিনিধি থাকিবেন। তাঁহারা ভারতীয় সংস্কৃতির এক একটি কলাকে প্রকাশ করিবেন—আরো সতেরো জন হইলেই যোগ্য হইত, কারণ ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্র মতে চৌষট্টি কলা। তবে খুব সম্ভব কোন কোন প্রতিনিধির প্রতিভা বহুমুখী, তাই চৌষট্টিতে উঠিতে হয় নাই—সাতচল্লিশেই কুলাইয়াছে। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় মাত্র তিনজনের নাম প্রকাশ পাইয়াছে—বাকি চুয়াল্লিশ জন ডুব সাঁতারে আছেন, উপর হইতে দেখা যায় না। তিনজনের মধ্যে একজন ভারতনাট্যম্, একজন কথাকলি ও অপরজন রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতিনিধিত্ব করিবেন। বাকি চুয়াল্লিশ জন কোন্ কোন্ কলা প্রদর্শন করিবেন জানিলে আনন্দের অবধি থাকিত না। তবে পূর্ব নজীর অনুসারে ধরিয়া লইতেছি যে, বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়, সাঁতারু,

গায়ক, বাদক, ব্যবসায়ী, ডিগবাজি বিশারদ, মেঠো বক্তা, গেঁয়ো যোগী প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিগণ থাকিবেন। আহা-হা ভারতীয় সংস্কৃতির কোন দিকটিই বাদ পড়িবে না। আমাদের কি সৌভাগ্য! মাতঃ ভারতি! তোমার কপালে এত সুখও ছিল!

জিজ্ঞাসা করিব না ইহারা ভারতীয় সংস্কৃতির কে? জিজ্ঞাসা করিব না কোন্ মাপকাঠিতে ইহাদের নির্বাচন কার্য সমাধা হইল! জিজ্ঞাসা করিব না কোন্ বিশ্ব-পণ্ডিতের দল ইহাদের নির্বাচন করিলেন। কেন জিজ্ঞাসা করিব—ইঁহারা যে ভারত সরকারের জানিত ব্যক্তি তাহাই কি যথেষ্ট নয়? যে ব্যক্তি বিশ্বের হাটে রূপ যাচাই করিয়া আসিয়াছেন, তিনি যদি ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিনিধি না হইবেন, তবে আর কে হইবে? এই সেদিন মাত্র নেহরু ভারতীয় নারীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন—তার পরে এই প্রমাণ! জিজ্ঞাসা করিব না এই দলে সংস্কৃতজ্ঞ ভারতীয় ও চীনা ভাষায় অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ কেহ থাকিবেন কি না! রবীন্দ্রনাথ যখন ১৯২৪ সালে চীনে গিয়াছিলেন, তখন এমন ঘটাপটা হয় নাই বটে, 'সাংস্কৃতিক' শব্দটাও তখন বাজারে ওঠে নাই, তখন তিনি সঙ্গে ভারত-বিখ্যাত চিত্রকর ও পণ্ডিতগণকে লইয়াছিলেন, নৃত্যগীত-পটীয়সীদের কথা তাঁহার মনে পড়ে নাই। কিন্তু নয়া চীন বোধ করি বুড়া পণ্ডিতদের দেখিয়া খুশী হইবে না, তাই নয়া প্রতিনিধিদের দ্বারা নৃত্যের মুদ্রা প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে। যদি কেহ বলেন যে, সমস্ত ব্যাপারটাই মুদ্রা ঘটিত বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন তাহাকে আমি নিন্দুক বলিব, বলিব ও-সব সেকেলে রসিকতা সিন্দুকে রাখিয়া দাও! এ যে সংস্কৃতির বিনিময়! এর উদ্যোক্তা ভারত সরকার! ইহার প্রতিবাদ যে করে তাহার মাথায় সরকারী অর্ডিন্যান্সের বজ্রাঘাত হোক। মোট কথা সরকার জানিত সাতচল্লিশ জন ব্যক্তি বিদেশ ভ্রমণে যাইতেছেন, রাহা খরচ ভারত সরকার দিতেছেন, তথাকার খরচ চীন সরকার দিবেন। দুই-ই সমাজতান্ত্রিক দেশ কি না—তাই সরাসরি বিদেশ ভ্রমণ না বলিয়া সংস্কৃতির বিনিময় বলা হইতেছে। আশা করি অধিকাংশ প্রতিনিধিই চীন দেশের ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য কিছুই জানেন না—জানেন শুধু বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মুদ্রা প্রদর্শন—এবং চীনা প্রতিনিধিদেরও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান তথৈবচ, এহেন অবস্থায় সংস্কৃতি বিনিময়ে আর কোন বাধা থাকিতেই পারে না! এক সময়ে ভারতীয় জ্ঞানের প্রতিনিধিরূপে বৌদ্ধাচার্যগণ

চীনে যাইতেন, এখন যায় ফুটবল খেলোয়াড়, সাঁতারু, সজারু, ঘোড়ারুগণ! মাতঃ ভারতি এত প্রগতিও তোমার ভাগ্যে ছিল! এই সেদিনও গিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল, আজ চলিয়াছে আগড়ুম, বাগড়ুম, ঘোড়াড়ুমের দল। জয় মা! এখন তোমার সন্তানগণ বহাল তবিয়তে ফিরিলেই আমরা ধন্য হইব।

৪৫

'মডার্ন' কাব্য

বর্তমান ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ওয়াল্টার ডি লা মেয়ারের তিরাশি বছর বয়সে সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। ডি লা মেয়ারকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলাতে অনেকেই বিচলিত হইতে পারেন, সর্বশ্রেষ্ঠ বলাই উচিত ছিল, কিছু হাতে রাখিয়া বলিয়াছি এই মাত্র। সরস্বতীর দরবারে কসরৎ দেখাইয়া ভিড় জমাইবার ইচ্ছা কবির ছিল না, আর যেহেতু অধিকাংশ পাঠক অপরের মুখে ঝাল খায়, ভিড়ের আধিক্য দেখিয়া গুণের বিচার করে, আর 'ইনটেলেকচুয়াল' রূপ গরম মশলা না থাকিলে কাব্যকে কাব্য মনে করে না, ডি লা মেয়ারের পাঠকসংখ্যা হয়তো তেমন ছিল না। কিন্তু মুষ্টিমেয় রসবেত্তার বিচারের যদি কোন মূল্য থাকে তবে তাঁহাকে বর্তমান কবিকুলের শীর্ষে স্থান দিতে হয়। পাঁচ ঠ্যাংঅলা গোরুতে বিস্ময়ের ভাব মনে আনিয়া দিতে পারিলেও কদাচিৎ দুধ দিতে পারে। আজকার দিনের পাউণ্ড, এলিয়ট, অডেন, স্পেণ্ডার প্রভৃতির পাঁচ ঠ্যাংঅলা গোরুরূপী কাব্য যতই বাহবা আদায় করুক উহারা প্রকৃতি সৃষ্ট স্বাভাবিক জীব নয়, উহাদের পিঠের উপরে পঞ্চম পা খানি মানুষের হাতে জুড়িয়া দেওয়া। পঞ্চম ঠ্যাঙের গৌরবই যাহাদের একমাত্র গুরুত্ব, অচির-পঞ্চত্বপ্রাপ্তি তাহাদের বিধিনির্দিষ্ট পরিণাম, মাঝখানে যে কয়দিন হাততালি জোটে। চোরের রাত্রিবাসটাই লাভ। ডি লা মেয়ার, এডওয়ার্ড টমাস, উইলিয়াম ডেভিস প্রভৃতির কাব্য অমরত্বের উপাদানে তৈয়ারি বলিয়া তাহারা অপেক্ষা করিতে পারে, তাহাদের ত্বরা নাই, টুরিষ্টের মতো তাহারা বিস্মৃতির রিটার্ন টিকিট করিয়া আসে নাই, মানুষের মনে চিরকাল বাস করিতে আসিয়াছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে অনুরূপ উপসর্গ বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রেও অনেককাল হইল দেখা দিয়াছে। ঘূর্ণিহাওয়ার ঘাড়ে চাপিয়া যেমন আঁধি আসে, আকাশের আলো আচ্ছন্ন করে, তেমনি মডার্ন কবিগণ উদ্যোগী প্রকাশকের স্কন্ধে ভর করিয়া আসেন, উদ্‌ভ্রান্ত শুকনো পাতা আকাশময় হাততালি দিতে থাকে, রবির দীপ্তি ম্লান হইয়া যায়, হঠাৎ প্রত্যয় জন্মায় এই নিশ্বাসরোধ-করা অন্ধকারটাই বুঝি প্রকৃতির বিধান। তারপরে ঐ সঙ্গে আর এক উপদ্রব দেখা দিয়াছে—পুরস্কার প্রদান। তাহাও আবার রবীন্দ্রনাথের নামে! দেখা যাইতেছে যে, মৃত্যুর পরেও মানুষের ঐহিক দুঃখ দুর্গতির অবসান ঘটে না, নতুবা কবিগুরুর এ হেনস্তা কেন? তিনি তো কোন অপরাধ করেন নাই, যথাসাধ্য দেশের কল্যাণ করিতেই চেষ্টা করিয়াছেন। তবে? অচল গাধা-বোট চালাইতে হইলে যে সচল জাহাজের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিতে হয় এ বুদ্ধি নিতান্ত বালকেরও আছে। কিন্তু এসব কবিতা নাকি 'মডার্ন', 'ইনটেলেকচুয়াল' আরও কত কি! ভালো বাপু, উত্তম গরম মশলা ও উৎকৃষ্ট ঘৃত দিয়া শুকনা কাঠের পাক করিলেই কি সুখাদ্য প্রস্তুত হয়? এই শ্রেণীর রচনা আর যাহাই হোক কবিতা নয় বা কোন অর্থেই সাহিত্য নয়। সাহিত্যের সংজ্ঞা স্থিতি-স্থাপক, তাহাকে যতই টানিয়া লম্বা করো না কেন ছাড়িয়া দিলেই পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যায়। তবে এসব রচনার সৃষ্টি কেন হইল? ইংরাজি ঐ শ্রেণীর রচনার উদ্ভব হইল কেন? কখন্ হইয়াছিল জানিলেই কেন হইয়াছিল জানা হইবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে যুদ্ধফেরৎ কবিরা প্রথম 'মডার্ন' কবিতা লিখিতে সুরু করে—তাহার একমাত্র বা প্রধান কারণ যুদ্ধকালীন Shell Shock! চীনের কোন রাণীর পা দু'খানি পঙ্গু ছিল, চীনা রমণীরা পাদু'খানি পঙ্গু করিয়া রাজ্ঞীসদৃশ রূপবতী হইতে সুরু করিল। এ-ও অনেকটা তেমনি, ও দেশে 'মডার্ন' হইল আমরাই কেন বা পিছাইয়া থাকিব। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, ও দেশে 'মডার্ন' কবিতার নেশা কাটিতে সুরু করিয়াছে, এ দেশেও। গত দশ বৎসরের মধ্যে বাংলা দেশে যত নূতন কবির অভ্যুদয় হইয়াছে তাঁহারা সকলেই বয়সে তরুণ কিন্তু কাব্যে 'মডার্ন' নয়। বাংলা কাব্য সম্বন্ধে এটি সবচেয়ে আশার কথা।

কিন্তু কবিগুরুর নামে কেন? এই সব উপদ্রবের হাত হইতে কবির স্মৃতিকে রক্ষা করিবার কি কোনই উপায় নাই? এক্ষেত্রে Protection of

Ancient Monuments Act-এর বিধান প্রয়োগ করা চলে না কি ? অনেক নিগূঢ় Intellectual আজকাল রবীন্দ্রনাথকে মডার্ন বলিয়াই স্বীকার করেন না, কিন্তু তৎসত্ত্বেও, বোধ করি তাঁহারাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, তাঁহার স্মৃতি এ দেশের অন্যতম বৃহৎ Ancient Monument !

৪৬

রাজ-সম্মানের অর্থ

এবারে স্বাধীনতা উৎসব উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস বাংলা দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট গুণীকে সম্বর্ধিত করিয়াছেন। সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্র, নাট্য, পাণ্ডিত্য, এডভেঞ্চার প্রভৃতি কীর্তিতে যাঁহারা বাঙ্গালী সমাজকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, রাজ্য কংগ্রেস তাঁহাদের সম্বর্ধিত করিয়া নিজেই গৌরবান্বিত হইয়াছেন। এবারের স্বাধীনতা উৎসবের এটি একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

প্রাচীনকালে রাজসভায় গুণিজনের প্রশস্ত আসন ছিল। ভারতের প্রসিদ্ধ হিন্দু ও মুসলমান সম্রাট ও রাজাগণ গুণীদের আদর করা কর্তব্য জ্ঞান করিতেন। ইংরাজ শাসকগণ যে এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন ছিলেন এমন বলিলে অন্যায় হইবে, কিন্তু তাঁহাদের মাপকাঠির সঙ্গে দেশবাসীর মাপ মিলিত না, তাহা ছাড়া অনেকক্ষেত্রেই রাজানুগত্য অপরিহার্য ছিল।

কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, দেশ স্বাধীন হইবার পরে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহের দৃষ্টি গুণিজনের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। সম্মান ও আর্থিক আনুকূল্য দ্বারা দেশের সরকার গুণিজনকে সম্মানিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং নিজেরাই সম্মানিত হইতেছেন। ইংলণ্ডের মতো দেশে যেখানে জনসাধারণ ব্যাপকভাবে শিক্ষিত ও সজাগচিত্ত সেখানে রাজসম্মান অপরিহার্য নয়, জনসাধারণই সে কাজ করিয়া থাকে। যদিচ এক সময়ে ইংলণ্ডেও প্রয়োজন ছিল, Poet Laureateship বা রাজকবিপদ তাহারই সাক্ষী। কিন্তু ভারতবর্ষের মতো দেশ, যেখানে শিক্ষা এখন পর্যন্ত সঙ্কুচিত, সেখানে সরকারের পথপ্রদর্শক হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার অগ্রণী হইয়াছেন সুখের বিষয়।

গুণিজনের দিকে সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণের আরো কিছু অতিরিক্ত কারণ আছে। বর্তমান সমাজে ব্যবসায়ী ও রাজনীতিকগণেরই সমধিক সম্মান ও প্রতিপত্তি। ব্যবসায়ও ভালো, রাজনীতিও ভালো, দুই-ই দেশের পক্ষে অত্যাবশ্যক, কিন্তু রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী সমাজদেহ বলশালী করিলেও সমাজের প্রকৃত প্রাণ ও চিত্ত সাহিত্যিক, শিল্পী ও পণ্ডিতগণেরই হাতে। দেশের গুণিসমাজের যোগ্যতা অনুসারেই সভ্যতার বিচার হয়, পাট ও ইস্পাত আমদানীর হিসাবের দ্বারা নয়। বস্তুতঃ ব্যবসায়, রাজনীতি, সুশাসন, ক্ষাত্রশক্তি সমস্তই পাদপীঠ মাত্র,—সেই পাদপীঠে স্থাপিত হয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি, যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রসঞ্চারী গুণিজনের সৃষ্টি, যাহাদের অধিকাংশই আবার জাগতিক ঐশ্বর্যে অকিঞ্চন। যে সরকার এই সব গুণিজনের সেবা করেন তাঁহারা সভ্যতার প্রকৃত অর্থবোদ্ধা। ভারত সরকারের এদিকে দৃষ্টিদান আশার বিষয়।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখা আবশ্যক যে, গুণীর বিচার গুণের মাপ-কাঠিতেই হওয়া আবশ্যক, সরকারের আনুগত্য বা রাজনীতির দাবী মাপ-কাঠিতে পরিণত হওয়া একান্ত অবিধেয়। আধুনিক কালে একনায়কতন্ত্রী কোন কোন দেশে এই অবাঞ্ছিত কাণ্ডটি ঘটিয়াছে। কোন্ বিষয়ে লিখিতে হইবে, কি ভাবে লিখিতে হইবে প্রভৃতি নির্দেশ দলীয় বকযন্ত্রে চোলাই হইয়া সাহিত্যিকগণের কাছে পৌছায়। সে সব নির্দেশের পান হইতে চুণ খসিলে সাহিত্যিকগণ অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়া গিয়াছেন এমন ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। শিল্পীর স্বাধীন চিত্তের উপরে শাসক দিগ্‌বারণের স্থূল হস্তাবলেপ শিল্পের পক্ষে মৃত্যুবাণতুল্য। একনায়কতন্ত্রী দেশে সাহিত্য ও শিল্পের দ্রুত অবনতি অবশ্যম্ভাবী।

অবশ্য একথা বলি না যে, এদেশে এমন ঘটিতেছে বা ঘটিবার আশঙ্কা আছে। এদেশে এখন পর্যন্ত গুণ-বিচারে রাজনীতির পরামর্শ লওয়া হয় না। কিন্তু আশঙ্কা সর্বদাই আছে, অন্ততঃ মাঝে মাঝে সে আশঙ্কার কথা মনে করাইয়া দেওয়া অন্যায় নয়। গুণিজন রাজ-সম্মানিত হইবেন কিন্তু গুণিজন রাজ-মুখাপেক্ষী হইবেন না,—ইহাই যথার্থ পন্থা। আর ইহা সরকার ও গুণিজন সকলেরই স্মরণ রাখা কর্তব্য। রাজহস্তের মালা নারদের বীণাচ্যুত পারিজাত মালার মতো, শিল্পলক্ষ্মী ইন্দুমতীর মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে।

স্বদেশের রাজমাল্য যে গুণী পান তিনি সত্যই সৌভাগ্যবান, কিন্তু কমলাকান্ত ব্যক্তিগতভাবে সেই গুণীকেই সম্মান করেন, যিনি মনে প্রাণে বলিতে পারেন,

"তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোক্‌গে এ বসুমতী যার খুসী তার।"

৪৭

সাহিত্যিক সংহতি

কয়েকদিন আগে ভারতীয় বেতারকেন্দ্রের উদ্যোগে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত একটি সাহিত্য সমারোহে যোগদানের সুযোগ হইয়াছিল। ভারতের প্রধান চোদ্দটি ভাষা ও সাহিত্যের অনেক মুখ্য লেখক আসিয়াছিলেন। আসাম হইতে গুজরাট, কাশ্মীর হইতে কামরূপ ভারতের বাণী-প্রতিনিধিগণের মিলন দৃশ্য সত্যই দেখিবার মতো দৃশ্য। এই জাতীয় সাহিত্যিক সম্মেলন এদেশে এই বোধহয় প্রথম। এতদিন যে সব সাহিত্যিককে নামে মাত্র জানিতাম এবারে তাঁহাদের অনেককেই চোখে দেখিলাম, তাঁহার স্বকণ্ঠের আবৃত্তি ও পাঠ শুনিলাম। বাংলা দেশের সাহিত্যিক-প্রতিনিধিগণের মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, সৈয়দ মুজতবা আলি প্রভৃতির ন্যায় বিখ্যাত ব্যক্তি সভায় যোগ দিয়াছিলেন। দুইদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে পাঠ, আবৃত্তি, বক্তৃতা ও আলোচনা হইল, ভূরিভোজ্য যদিচ নবরসের মধ্যে পড়ে না, তবু তাহারও অভাব ঘটে নাই।

এই অপূর্ব সাহিত্য সভায় যোগদানের ফলে ব্যক্তিগতভাবে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি তাহাই লিখিব। ভারতবর্ষ যে অতি বৃহৎ ও বিচিত্র দেশ ভূগোল ও ইতিহাসের কৃপায় তাহা অবগত ছিলাম, কিন্তু বৈচিত্র্য ও বিরাটত্ব বলিতে প্রত্যক্ষতঃ যে কি বোঝায় এবারে তাহা কতক বুঝিলাম। সমগ্র ইউরোপ মহাদেশে প্রধান সাহিত্যের সংখ্যা কয়টি? চোদ্দটি হইলেও ভারতের সাহিত্যিক-বৈচিত্র্যের চেয়ে অধিক নয়। অথচ ইউরোপ মহাদেশ, ভারতবর্ষ একটি মাত্র দেশ, কিন্তু বৈচিত্র্যের বিচারে তাহা কাহারো ন্যূন নয়। সাহিত্য

সমারোহ দেখিবার ফলে ভারতের বিরাটত্ব ও বৈচিত্র্য নূতনভাবে ও সত্যভাবে উপলব্ধি করিলাম। ইহা একটি পরম লাভ। দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা এই যে, রবীন্দ্র সাহিত্য ভারতের আধুনিক সাহিত্য-সমূহের মূলে যে সবচেয়ে প্রবল প্রেরণা জোগাইয়াছে, সাহিত্যিকগণের মুখে সেই স্বীকৃতি শুনিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বাঙালী সাহিত্যিকগণের তথা সমগ্র বাংলা সাহিত্যের প্রতি কি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার ভাষা শুনিলাম সাহিত্য সমারোহের প্রতিনিধিগণের মুখে। আজকাল যাঁহারা কথায় কথায় বাঙালীর প্রতি অপরের অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার ভাব দেখিতে পান, তাঁহাদের সঙ্গে আমি একমত হইতে পারিলাম না। অন্ততঃ সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহার তো কোন প্রমাণ পাইলাম না। জগৎ শুদ্ধ লোক অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা করিতেছে এইরূপ ধারণা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। বাংলাদেশে যে সব সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন, সভার সর্বক্ষেত্রে তাঁহারা প্রশস্ত আসন পাইয়াছেন, সভাপতিরূপে, প্রধান বক্তারূপে তাঁহারা আহূত হইয়াছেন, আর বলা বাহুল্য তাঁহাদের কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধাদি অপর কাহারো চেয়ে কম অভিনন্দিত হয় নাই। আরও দেখিলাম যে, উত্তর ভারতের বহুতর সাহিত্যিক ও শিক্ষিত ব্যক্তি বেশ বাংলা বলিতে ও বুঝিতে পারেন। আধুনিককালের বাঙালী সাহিত্যিকগণের অনেকেরই নাম ও রচনা সর্বত্র সুপরিজ্ঞাত।

শুনিলাম যে এখন হইতে মাঝে মাঝে বছরে অন্ততঃ একবার এই রকম সাহিত্যিক সমাবেশের আয়োজন হইবে। প্রস্তাবটি অভিনন্দনযোগ্য। বছরে একবার ২।৫ দিনের জন্য দেশের সাহিত্যিকগণ একত্র সমাবিষ্ট হইলে পরস্পরের সঙ্গে সামাজিক ও ভাবিক যোগাযোগ স্থাপন করিতে সক্ষম হইবেন, আর তাহার ফলে ভারতীয় সাহিত্যগুলি যে লাভবান হইবে তাহা নিঃসন্দেহ। আর এই আত্মিক ঘনিষ্ঠতার ফলশ্রুতি স্বরূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যেও সংহতি বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা—আজকার দিনে ইহার বড় আবশ্যক। ভাষার বাঁশে বাঁশী না গড়িয়া লাঠি গড়িবার জন্য অনেকেই উদ্যত। ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে কথা বলিবার অধিকার অবাঞ্ছিতরূপে রাজনীতিকগণের হাতে চলিয়া যাইতেছে। ইহা শুভসূচী নহে। ভারতের সাহিত্যিকগণ শুভবুদ্ধির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইলে সমগ্র দেশকে একটা মহা অনিষ্ট আশঙ্কার হাত হইতে রক্ষা করিতে পারেন।

৪৮

সরকারী ভাষা, না জাতীয় ভাষা, না রাষ্ট্রভাষা ?

'মাতৃভাষা সংরক্ষণ সঙ্ঘ' ভাষা সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে একটি সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন। সভায় সাম্প্রতিক ভাষা-সমস্যা সম্বন্ধে নানা বিতর্ক উঠে। একটা সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। নিখিল ভারত লেখক সম্মেলনে শ্রীনেহরু ভাষা সমস্যা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছেন। আশা করিতেছি তাহাতে বিষয়টি অনেকটা স্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। এখন এই প্রসঙ্গে দুই চারটা কথা বলিব, প্রায় সমস্তই পুরাতন, কাজেই সর্বজন-বিদিত।

গোলমাল বাধাইয়াছে "রাষ্ট্রভাষা' শব্দটা। হিন্দি কি রাষ্ট্রভাষা, না সরকারী ভাষা? আমরা ইংরাজিকে রাষ্ট্রভাষারূপে চাই, না সরকারী ভাষারূপে চাই? মাতৃভাষা সংরক্ষণ সঙ্ঘ আবার 'জাতীয়' শব্দটা আমদানী করিয়া বিষয়টাকে সরল করিবার বদলে জটিল করিয়া তুলিয়াছেন! 'রাষ্ট্রভাষা' 'সরকারী ভাষা' ও 'জাতীয় ভাষা' তিনে মিলিয়া এমন তাল-গোল পাকাইয়া গিয়াছে যে, সমস্যার আসল রূপ বুঝা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। দক্ষিণ ভারতের মুখপাত্র হিসাবে রাজাজি ইংরাজিকে 'সরকারী ভাষা'রূপে দেখিতে চান। আমার নিজের ধারণা ইংরাজির ঐ অভিধাটি যথার্থ। হিন্দির বদলে ইংরাজি সরকারী ভাষায় পরিগণিত হইলে অনেক সমস্যা মিটিয়া যায়, অনেক সুবিধা করায়ত্ত হয়। 'রাষ্ট্রভাষা' শব্দটি এক্ষেত্রে আপত্তিজনক। 'রাষ্ট্রভাষা'-র পরিধি সর্ব-ব্যাপক, সাহিত্য, শাসন ও শিক্ষা প্রায় সর্বক্ষেত্রকে স্পর্শ করে 'রাষ্ট্রভাষা' শব্দটি। ইংরাজি, হিন্দি বা অন্য কোন ভারতীয় ভাষা—কোনটি সম্বন্ধে এ শব্দ প্রয়োগ করা উচিত নয়। 'জাতীয় ভাষা' হিসাবে ইংরাজির সহিত পনেরটি ভাষাকে ঘোষণা করিবার দাবী জানাইয়াছেন 'মাতৃভাষা সংরক্ষণ সঙ্ঘ'। এই প্রসঙ্গে 'জাতীয় ভাষা' শব্দটি ভবিষ্যৎ ঘোরতর সঙ্কটের স্থল বলিয়া আমার ধারণা। ভারতীয় সংহতি যাঁহারা পছন্দ করেন না তাঁহারা সুযোগ মতো তর্ক তুলিবেন যে, দেশে যখন পনেরটি জাতীয় ভাষা তখন

অন্ততঃ পনেরটি জাতি এ দেশে আছে। এ যুক্তিটা হঠাৎ হাস্যকর মনে হইতে পারে, কিন্তু যে দেশে 'দুই জাতি তত্ত্বে'র মতো অসার বস্তু চলিয়াছে, সে দেশে সব কিছু চলা সম্ভবপর। অন্ততঃ আততায়ীর হাতের কাছে অস্ত্র জোগাইয়া দেওয়া বুদ্ধির কাজ নয়। কাজেই 'জাতীয়' শব্দটির ব্যবহার আপত্তিজনক। মাতৃভাষা সংরক্ষণ সঙ্ঘেরও চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। অতএব বাকি থাকিল 'সরকারী ভাষা'। ঐ শব্দটি ব্যবহার করিলে অনেক আপদ দূর হইয়া যায়। ইংরাজি 'সরকারী ভাষা'। ঐ শব্দটিতে উহার ব্যবহার ও সীমানা নির্ধারিত হইয়া যায়। সরকারী ভাষা কি না, কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবহারের ভাষা, কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত বিভিন্ন রাজ্যের অভিমত ও দলিলপত্র-বিনিময়ের ভাষা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীর জন্য পরীক্ষার্থীর ভাষা। একবার ইংরাজিকে সরকারী ভাষারূপে স্বীকার করিয়া লইলেই হিন্দির 'প্রতাপ' কমিবে, 'মাতৃভাষা সংরক্ষিত' হইবে এবং শিক্ষাজগৎ হইতে ইংরাজির নির্বাসন ভীতি দূর হইবে। আমার মনে হয়, ভাষা সমস্যার কুয়াশার মধ্যে তত্ত্বদর্শী রাজাজি সত্য দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তবে তাঁহার 'সংগ্রাম পরিষদ' গঠন আমার পছন্দসই নয়, সংগ্রাম-টংগ্রামকে কমলাকান্তের বড় ভয়, শব্দটা শুনিলেই কেমন মাথা ঘুরিতে থাকে।

সাহিত্য, শিক্ষা ও শাসন, তিনটি ভাষার ব্যবহারিক ক্ষেত্র। সাহিত্যের সহিত সরকারী ভাষার কোন সম্বন্ধ নাই, মাতৃভাষাই সাহিত্যের ধাত্রী। শিক্ষার সঙ্গে সাধারণতঃ সরকারী ভাষার সম্বন্ধ পরোক্ষ, কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ, কেন না, সকলেই শিক্ষায় ইংরাজির বিশেষ স্থানটি রক্ষার পক্ষপাতী, কুঞ্জরু কমিটিরও সেই অভিমত। সরকারী ভাষার যথার্থ স্থান শাসন—তাহাও আবার কেন্দ্রীয় সরকারের এবং বিভিন্ন রাজ্যসরকারের সঙ্গে যোগাযোগে। সমগ্র দেশের বিচিত্র ও ব্যাপক জীবনের তুলনায় তাহা কতটুকু? ইংরাজিকে যাঁহারা অপাঙ্‌ক্তেয় মনে করেন ঐ স্থানটুকু তাহাকে ছাড়িয়া দিলে আমাদের জাত যাইবে না, বরঞ্চ শক্তি বৃদ্ধি পাইবে এবং অনেক সঙ্কট অঙ্কুরে বিনষ্ট হইয়া জাতির ভবিষ্যৎকে নিরাপদ করিবে। সমগ্র বিষয়টিকে ধীরভাবে বিবেচনা করিবার জন্য 'মাতৃভাষা সংরক্ষণ সঙ্ঘ'কে ও সুধী সমাজকে অনুরোধ জানাইতেছি।

৪৯

সাহিত্যের মায়াদ্বীপ

২৩শে এপ্রিল শেক্সপীয়রের জন্মদিবস। এই উপলক্ষে সমস্ত জগৎ মহাকবিকে স্মরণ করিবে, বাংলাদেশেও স্মরণের আয়োজন হইয়াছে। আর একবার প্রমাণ হইল যে, বাংলাদেশ সৃষ্টি ছাড়া কিছু নয়, বিশ্বেরই অঙ্গ।

শেক্সপীয়র তাঁহার শেষ জীবনের একখানি নাটকে যাদুমন্ত্রময় একটি দ্বীপ রচনা করিয়া বাত্যাবিক্ষুব্ধ জীবননাবিকের পরম আশ্রয় সৃষ্টি করিয়াছেন। মহাসমুদ্রে বিভ্রান্ত ইউলিসিস এখানে একটি শান্ত বন্দর, নিভৃত গৃহকোণ, নিশ্চল প্রদীপ ও অটল হৃদয় পায়। তাহার এগুলির বড় প্রয়োজন। আমাদের সকলেরই বড় প্রয়োজন। আমরা সকলেই যে ইউলিসিস! ইলিয়াড রচনা সাঙ্গ করিয়া হোমার অডীসি লিখিয়াছেন, লীয়ার, ম্যাকবেথ রচনান্তে শেক্সপীয়র রচিয়াছেন টেম্পেষ্ট নাটক।

কিন্তু শুধু টেম্পেষ্ট নাটকখানাই নয়, শেক্সপীয়রের সমগ্র রচনা, কাব্য ও নাটক একটি মোহময় স্নেহময় মহনীয় দ্বীপ, জাতিধর্ম বর্ণনির্বিশেষে যে কেহ এখানে জিরাইবার স্থান পাইতে পারে। এ দ্বীপ জলোচ্ছ্বাসে ডুবিবে না, ঝড়ে ব্যাহত হইবে না, অগ্নিবন্যায় পুড়িবে না, মহাপ্রলয়ও বোধ করি নির্দিষ্ট মুহূর্তে এখানে পা টিপিয়া টিপিয়া আসিবে। এমন দ্বীপ মানস পারাবারে অধিক নাই, বৈচিত্র্যে, সৌন্দর্যে ও সর্বমনস্থতায় শেক্সপীয়র রচিত দ্বীপটিই সর্বোত্তম।

প্রগতি বায়ুগ্রস্ত অনেকে কাব্যকে জীবনের escape মনে করেন, কাব্যামোদী তাঁহাদের কাছে escapist! কিন্তু কোন মহৎ কাব্যই জীবন বিরতির উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়, কোন মহাকবিই জীবনকে অস্বীকার করেন নাই, কাব্য জীবনের অস্বীকৃতি নয়, কাব্য Consummation of Life, জীবনের পূর্ণতর সত্যতর রূপ। যাঁহারা জীবনের Realism কাব্যে সন্ধান করেন তাঁহাদের সংবাদপত্র পড়া উচিত, কাব্যপাঠের নিরাসক্ত অধিকার তাঁহারা অর্জন করেন নাই। সচরাচর লোকে যাহাকে Realism বা বাস্তবতা বলে তাহা সত্য নয়, সত্যের ছিবড়ে। সংসারে ছিবড়ের প্রয়োজনও আছে,

নতুবা নারকেলের রসি পাওয়া যাইত কিরূপে? কিন্তু কাব্যের প্রয়োজন স্বতন্ত্র, সে প্রয়োজন রসির নয়, রসের। এই সহজ কথাটা যাহারা বুঝিতে অক্ষম তাহারা কাব্যালোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া রাস্তা দুরমুশ করিলে মানুষের অনেক বেশি উপকার হইত।

শেক্সপীয়র কি জীবনকে অস্বীকার করিয়াছেন? তাঁহার মায়াদ্বীপে কী নাই? জাদুকর প্রস্পেরো আছে, অর্ধপশু অর্ধনর ক্যালিবান আছে, অর্ধনর অর্ধদেব এরিয়েল আছে। তবে আর বাকি থাকিল কি? পশু, মানব, দেবতা সবই তো রহিল। এ দ্বীপে বীভৎসতা আছে, সৌন্দর্য আছে, ঈর্ষা আছে, প্রেম আছে, প্রেমে পরীক্ষা, বিচ্ছেদ ও মিলন আছে। জীবনেই বা ইহার অধিক কি আছে! তবে জীবনের সত্যে ও কাব্যের সত্যে প্রভেদও আছে। জীবনের সত্য ভগ্ন খণ্ড মিশ্র, কাব্যে তাহার পূর্ণ প্রত্যয় রূপ, প্রভেদটা ঐ ছিবড়ে ও রসের।

বর্ত্তমানকালে মানুষের আর যাবতীয় আশ্রয়গুলিই ভাঙিয়া পড়িয়াছে বা ভাঙিয়া পড়িবার মুখে। সমাজ শতখণ্ড, রাষ্ট্র হয় আত্মদ্রোহী নয় কাব্যতন্ত্রী, ধর্ম আনুষ্ঠানিকতার শুষ্ক হাওয়ায় গতপ্রাণ, কোথাও বা ভাবালুতার কর্দমে গদ্‌গদ্, বাকি থাকিল কাব্য। কাব্যও যুগ-vandal-এর কলঙ্ক নিক্ষেপ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়, তাহাকেও যুগতন্ত্রী করিবার প্রয়াস হইয়াছে। কিন্তু রক্ষা এই যে, মহাকবিগণ এই ক্লিন্ন প্রচেষ্টার অতীত। তাঁহারাই এখন মানুষের শেষ ভরসা, শেক্সপীয়র তাঁহাদের অন্যতম, কমলাকান্তের কাছে শ্রেষ্ঠ।

মানুষ ক্রমেই বুঝিতে পারিতেছে যে, শেষ পর্যন্ত মহৎ কাব্যই মানুষের মহৎ আশ্রয়। এই বোধ আরও জাগ্রত হইলে, 'জগতের শতকোটি' কয়েকজন মহাকবিকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইতে থাকিবে। শেক্সপীয়রের জন্মদিবস সম্বন্ধে পৃথিবীর যাবতীয় দেশের ও রাষ্ট্রের আগ্রহে তাহারই সূচনা। ভাবী যুগের নবধর্ম মহাকাব্য। শেক্সপীয়র জন্মজয়ন্তীর জয়ধ্বনিতে সেই নূতনের পদধ্বনি। বাংলাদেশও এই জয়োল্লাসে যোগ দিয়াছে—

'ভারত সমুদ্রতীরে কম্পমান
শাখাপুঞ্জে আজি
নারিকেল কুঞ্জবনে জয়ধ্বনি
উঠিতেছে বাজি।'

৫০

যুগলক্ষণ

মালদহে ৩রা এপ্রিল কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ইউ এন ধেবর এক ছাত্রসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, সিনেমার উপর যদি পরীক্ষা লওয়া হয় তাহা হইলে আধুনিক ছাত্র নিঃসন্দেহে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইতে পারে। ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও মনঃসংযোগের অভাবের নিন্দা করিয়া তিনি বলেন যে, ছাত্ররা চিত্রতারকাদের অনুকরণে, তাদের চলা-ফেরা, পোষাক-পরিচ্ছদ,কথা বলার ধরণ-ধারণ অনুসরণ করিয়া জীবন গড়িয়া তুলিতে উৎসুক। তাহাদের কাছে যদি কোনো গ্রন্থ আদৌ প্রিয় হয় তাহা হইলে তাহা হইতেছে চলচ্চিত্র জগৎ সংক্রান্ত গ্রন্থ—পিতামাতার আর্থিক অবস্থা যাহাই হোক না কেন তাহাদের মাসে অন্ততঃ একবার সিনেমায় যাওয়া চাই-ই। কংগ্রেস সভাপতি বলেন, অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম আছে, তবে অধিকাংশ ছাত্রই এই দলের দলী। কংগ্রেস সভাপতি তাহাদের শক্তির অপচয় না করিয়া অধ্যয়নে একাগ্র হইতে উপদেশ দেন।

শ্রীযুক্ত ধেবরের মন্তব্যটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, কেবল ছাত্রসমাজের ও তাহাদের অভিভাবকবর্গের নয়, রাষ্ট্রনায়ক ও সমাজ-নায়কগণেরও। কিন্তু কমলাকান্তের ধারণা কেবল ছাত্রসমাজের প্রতি দোষারোপ করিলে অবস্থার প্রতিকার হইবে না। অবস্থাগতিকে এ যুগটাই চিত্রতারকাগণের যুগে পরিণত হইয়াছে—আর সকলেই অজ্ঞাতসারে চিত্রতারকাগণ কর্তৃক প্রভাবিত, মায় চিত্রতারকাগণ পর্য্যন্ত। এ হেন অবস্থায় অপ্রাপ্তবয়স্ক ছাত্রগণ যে মোহগ্রস্ত হইবে তাহা আর বিচিত্র কি ? চিত্রতারকাগণের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী যদি ছবি তোলেন আর সে সব ছবি যদি সাড়ম্বরে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তবে ছাত্রগণ কি মনে করিবে? রাজ্যপাল যদি চিত্রতারকাগণের দ্বারা ক্রিকেট-খেলার অনুষ্ঠান করেন, তবে ছাত্রগণ কি মনে করিবে? সভাস্থলে জনতা আকর্ষণের উদ্দেশ্যে যদি চিত্রতারকাদের আনা হয়, তাদের দেখিবার জন্য

যদি জনতার চাপে পথের ট্রাম বাস বন্ধ হইয়া যায়, নগর প্রাচীরের অধিকাংশ স্থান যদি চিত্রতারকাগণের চিত্র দ্বারা জবরদখল হয়, ছাত্রপাঠ্য রচনাপুস্তকসমূহ যদি সিনেমা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ বহন করে, সিনেমা যে অত্যুচ্চ শিল্পশ্রেণীর অন্তর্গত এবংবিধ মন্তব্য নিরন্তর যদি লোকে শুনিতে থাকে, সিনেমা সম্বন্ধীয় পত্র পত্রিকা যদি অতিশয় সহজপ্রাপ্য হয় (অনেক সময়ে অতিশয় স্থলভ মূল্যেও বটে), সংক্ষেপে সমস্ত সমাজটাই যদি নানাপ্রকারে চিত্র ও চিত্রতারকাগণের দ্বারা মোহগ্রস্ত হইয়া থাকে, তবে শুধু ছাত্রদের দোষ দিলে চলিবে কেন?

সিনেমা যদি সত্যই একটা শিক্ষা হয়, তবে ছাত্রগণ সে শিক্ষা যত অধিকবার গ্রহণ করে ততই মঙ্গল! সিনেমা যদি একটা উচ্চাঙ্গের শিল্প হয় তবে ছাত্রগণ সে পাঠ যত অধিকবার অভ্যাস করে ততই মঙ্গল! শ্রীযুক্ত খেবর বলিয়াছেন যে, ছাত্ররা পিতামাতার অবস্থা বিবেচনা না করিয়া সিনেমার জন্য অর্থব্যয় করে! কিন্তু কেন করে মনে রাখিলে দুঃখ হইবার কথা নয়। উচ্চশিক্ষা ও উচ্চশিল্প আয়ত্ত করিবার জন্যই তাহারা অর্থব্যয় করে। শুধু তাহাই নয়। টাকায় টাকা আনে। সিনেমা বিদ্যাটা শিখিয়া লইলে তাহারাও ভবিষ্যতে প্রভূত উপার্জন করিতে পারিবে। চিত্রতারকাগণের উপার্জনের বিভ্রান্তিকর অঙ্ক কে না জানে? আর তেমন তেমন কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারিলে কোন একদিন আকাদামি কর্তৃক পুরস্কৃতও হইবে। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি স্বহস্তে সে পুরস্কার দান করিবেন! এখন দোষ দিলে চলিবে কেন? এদিকে গাছ লাগানো হইয়াছে, অনেকগুলি মইও সংলগ্ন হইয়াছে, এবার খেবরজী সেই সব মই টান দিবার পরামর্শ দিতেছেন। কন্তু তাহাতে কাহারও ক্ষতি হইবে না। যাহারা ও গাছে একবার চড়িয়াছে, মই টান না দিলেও তাহারা নামিবে না। অতএব খেবরজীর বৃথা চেষ্টা।

বরঞ্চ সিনেমা যাহাতে অধিকতর জনপ্রিয় হয় তাহার চেষ্টা করাই কর্তব্য! অবশ্য ইতোমধ্যেই অনেক গৃহস্থের বাড়ীতে দেবদেবীর পটের সঙ্গে আধুনিক দেবদেবীর পটও দেয়ালের শোভা বাড়াইয়া থাকে। কিন্তু আরও আবশ্যক। ছাত্রপাট্য গ্রন্থসমূহের প্রচ্ছদে চিত্রতারকাগণের মূর্তি যথোচিত ভঙ্গিমায় মুদ্রিত হওয়া আশু প্রয়োজন। ঔষধ ও পথ্য দুই-ই হইবে। তখন ছাত্রগণ হয়তো পাঠ্যবই কেনার পয়সায় পাঠ্যবইগুলিই কিনিবে, সিনেমাপুস্তক আর কিনিবে

না! আরও কি কি উপায় অবলম্বন করা যায় সে উদ্দেশ্যে একটি "উচ্চ শক্তি বিশিষ্ট," High Power কমিটি গঠন করা দরকার।

ধেবরজী বলিয়াছেন যে ছাত্ররা চিত্রতারকাগণের অনুকরণে বেশভূষা করে। তবে কাহাদের অনুকরণে ছাত্ররা বেশভূষা করিবে? ধেবরজী কি মনে করেন সেই সত্যযুগে যখন এক কার্ষাপণে আড়াইমণ খাঁটি হৈয়ঙ্গবীন পাওয়া যাইত তখন যুবকগণ পরমারাধ্য ঋষিগণের অনুকরণে জটাশ্মশ্রু ও চীর চীবর ধারণ করিত? ধেবরজী আরও বলিতে পারিতেন যে অনেক তরুণ তরুণী সিনেমা জগতে প্রবেশের লোভে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া থাকে! কিন্তু সেটা কি দোষের? মহদুদ্দেশ্যে কেহ কি কখনো সংসার পরিত্যাগ করে নাই? আজকার দিনে সিনেমার চেয়ে মহত্তর উদ্দেশ্য আর তো কিছু ভাবিতেই পারি না! উহাতেই চতুর্বর্গের সমবায়!

ধেবরজী শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, এবং ছাত্রদের কল্যাণ কামনাতেই মন্তব্যটি করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু সবিনয়ে একটি কথা তাঁহাকে নিবেদন করি যুগের হাওয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া লাভ নাই। বরঞ্চ হাওয়াটা চলিয়া যাইবার জন্য অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। যান্ত্রিক যুগের আনন্দটাও যান্ত্রিক—সিনেমা যান্ত্রিক আনন্দের পরাকাষ্ঠা। ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে হইলে খাস যন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা আবশ্যক। অন্যথা পণ্ডশ্রম। তা ছাড়া সমাজে রাষ্ট্রে সর্বত্র সিনেমার মর্যাদা ও অর্থ, ছাত্রগণ যাহা দেখে তাহাই শেখে। এ দোষের জন্য তাহারা খুব বেশি দায়ী নহে। এ যুগ চিত্র ও চিত্রতারকাগণের যুগ, তাহাদের প্রতিষ্ঠা কমাইবার শক্তি মানুষের নাই, কেবল যুগ-ক্রান্তিতেই তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা।

৫১

দেউলিয়া ভবিষ্যৎ

হায়দরাবাদের ২২শে জুলাই তারিখের সংবাদ—ভারত সরকার এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অল্পবয়স্ক বালকবালিকাগণকে রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনী প্রচারকার্যে ব্যবহার করিতে পারিবে না।

স্কুলসমূহের ইন্সপেক্টরগণ এবং উচ্চ ও মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণের নিকট রাজ্যের জনশিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা এইরূপ নির্দেশ দিয়াছেন যে, নির্বাচনী প্রচারকার্যে যোগদান করিতে অল্পবয়সীকে যেন কৌশলে বাধা দেওয়া হয়।

সংবাদটি এতই শুভ যে বিশ্বাস করিতে মন সরিতেছে না। অবিশ্বাসের পক্ষে কিছু কারণও আছে। ইহা সত্যই যদি ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত হয়, তবে সংবাদটি হায়দরাবাদ হইতে প্রকাশিত হইল কেন? নয়াদিল্লী হইতে প্রকাশিত হইল না কেন? আবার অন্যান্য রাজ্য এ বিষয়ে নীরব কেন? নয়াদিল্লীর সিদ্ধান্ত কেবল তো বিশেষ একটি রাজ্য সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে না। সংবাদটির শেষাংশ বিশেষ সন্দেহের স্থল। "নির্বাচনী প্রচারকার্যে যোগদান করিতে অল্পবয়সী ছাত্রছাত্রীকে যেন কৌশলে বাধা দেওয়া হয়।" কৌশলটা কি হইবে? তখন প্রধান শিক্ষক কি ছাত্রছাত্রীর মধ্যে সন্দেশ বিতরণ করিয়া তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখিবেন? নির্বাচনী প্রচারকার্য করানো যাহাদের মতলব তাহারা সরকার ও প্রধান শিক্ষকের চেয়ে অনেক বেশি কৌশলী—এ কথা সরকার পক্ষ ছাড়া আর সকলেই জানে। অতএব কৌশলে কিছু হইবে না। তারপরে অবশ্য ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের দাবী তো আছেই। "অল্পবয়সী ছাত্রছাত্রীদের" কি প্রচারকার্য করিবার মৌলিক অধিকার নাই? বাধা দিবে কোন্ পাষণ্ড!

ছাত্রছাত্রীদের সকলেই "দেশের ভবিষ্যৎ" বলেন, প্রতি মিনিটে অন্ততঃ আটাশবার কথাটি দেশের চতুর্দিকে প্রচারিত হইতেছে। এখন সেই ছাত্র-

ছাত্রীকে স্কুল হইতে নানা অছিলায় পথে বাহির করিয়া আনিয়া দলীয় প্রচার-কার্য্যে নিয়োগ মানে অপরিশোধ্য ঋণের দায়ে দেশের ভবিষ্যৎ মর্টগেজ করিয়া রাখা—যাহার পরিণাম অচিরকাল মধ্যে দেউলিয়া হওয়া। ইহা এমন একটা স্থূল সত্য যে না বুঝিবার কারণ নাই। কিন্তু গরজ বড় বালাই! "অল্পবয়সী ছাত্রছাত্রীর" মতো এমন নিষ্ঠাবান্ ভলাণ্টিয়ার আর কোথায় পাওয়া যাইবে? দেশের বর্তমান শিক্ষার অধোগতি সম্বন্ধে সকলেই অন্ততঃ মুখে সচেতন। ইহার কারণ কি? গত ২০।৩০ বছর "অল্পবয়সী ছাত্রছাত্রীকে" কি ভাবে প্রচারকার্যে ব্যবহার করা হইয়াছে ভাবিয়া দেখিলেই আসল কারণ বুঝিতে পারা যাইবে। না পড়িয়া পরীক্ষা দিলে না শিখিয়া পাশ করিলে যে-বিদ্যা হয় —সেই বিদ্যায় দেশ ছাইয়া গিয়াছে। পূজনীয় শিক্ষক মহাশয়গণ যদি কমলাকান্তের বাচালতা মাপ করেন, তবে সভয়ে নিবেদন করি যে, স্কুলে অনেক শিক্ষক এবং গৃহে অনেক অভিভাবক ঐরূপ বিদ্যায় বিদ্বান্। অন্যের কথা কি কমলাকান্ত স্বয়ং ঐ ধনে ধনী—প্রমাণ তাহার আসর। দুঃখের উপরে দুঃখ এই যে, দেশ স্বাধীন হইবার পরেও ঐ লীলার অবসান ঘটিল না। এখনো প্রায়শঃ মধ্যাহ্নের রাজপথ সচকিত করিয়া কচিকণ্ঠের সমবেত ধ্বনি কানে প্রবেশ করে—"আমাদের দাবী মানতে হবে", "শিক্ষক বেতন বৃদ্ধি করতে হবে", "শিক্ষার মান উন্নত করতে হবে"—এমন আরও কত কি! শুনিয়া বাংলাদেশের ভাগ্যলক্ষ্মী নীরবে রোদন করিতে থাকে, আর এই লজঞ্চুষবাহিনীর পিছনে পিছনে নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করিয়া যে দাদাগুলি চলিতে থাকে তাহাদের মুখে হাসি আর ধরে না। সরকার খুব জব্দ হইতেছে! জব্দ হইতেছে কেবল সরকার নয়, সমগ্র দেশের ভবিষ্যৎ, যাহার শুভ কামনায় নাকি কাহারো মুখে খাদ্য, চোখে নিদ্রা প্রবেশ করে না। নিজের হিতাহিত সম্বন্ধে যে অচেতন তাহাকেই বলে—কি বলে না-ই বলিলাম!

এসব কথা প্রকাশ্যে বলিতে নাই, অন্ততঃ প্রকাশ্যে কেহ বলে না, ইহাই বিজ্ঞজনের উক্তি। সেই উক্তির নিষেধেই সাধারণতঃ চুপ করিয়া থাকি, বিজ্ঞতার ভান করি, শাদাকে কালো বলি, সর্বনাশের নৌকায় সোনার ধান সানন্দে তুলিয়া দিই, বিদ্যালয়ের "অল্পবয়সী ছাত্রছাত্রীদের" পথে পথে ঘুরিয়া দলীয় নকল সিংহনাদ করিতে শুনিলে কান এঁঠো করিয়া হাসি,

বলি যে দেশ অগ্রসর হইতেছে। আর দশজনের মতো এ সমস্তই যথারীতি পালন করিয়া থাকি! কিন্তু মাঝে মাঝে এক-আধবার ক্ষেপিয়া যাই, ঠুনকো বিজ্ঞতা শতখণ্ডে ভাঙিয়া পড়ে—ইচ্ছা করে গৃহশীর্ষ হইতে তার-স্বরে ঘোষণা করি, অল্পবয়সী ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ, অনভিজ্ঞতা ও আদর্শবাদকে exploit করা সব exploitation-এর চরম, ওর চেয়ে জঘন্য সামাজিক মনোবৃত্তি আর সম্ভব নয়। ইচ্ছা হয় চীৎকার করিয়া বলি ছাত্রসমাজকে ছাড়িয়া দাও, তোমাদের দলীয় রাজনীতির মধ্যে তাহাদের টানিয়া আনিও না এমন কি শিক্ষার মান উন্নতির জন্যও শিক্ষার্থী সমাজে ধর্মঘট ঘটাইও না, যে ডালে সকলের আশ্রয় সেই ডালে করাত চালনা হইতে ক্ষান্ত হও। কিন্তু বলিই-বা কাহাকে আর শুনিবেই-বা কে? সরকারকে বলিব? সরকার যে "কৌশলে" ছাত্রছাত্রীগণকে বাধা দিতে বলেন! এমন কৌশলী সরকারের অজ্ঞাত কিছু থাকিতে পারে কি? পরামর্শ বাহুল্য! আর কমলাকান্ত বলিলে লোকে শুনিবেই-বা কেন? সে যে আফিঙ খায়। আফিঙ খায় সত্য, কিন্তু ছাত্রছাত্রীর কচি মাথা খাওয়ার চেয়ে আফিঙ খাওয়া বোধ করি খারাপ নয়। তবু বলি, সাময়িকভাবে ক্ষেপিয়া গিয়াছি বলিয়া বলি, হে রাজনীতিকগণ, তোমাদের দলীয় প্রচারকার্যের মধ্যে 'অল্পবয়সী ছাত্রছাত্রীদের" টানিয়া লইয়া সমস্ত দেশের ভবিষ্যৎকে আর অধিক দেউলে করিয়া ফেলিও না।

৫২

"আত্মসম্মান প্রথা"

একটি সংবাদ পড়িয়া মনটা খুশী হইল। ত্রিবান্দ্রম হইতে সংবাদদাতা ২৪শে আগষ্ট তারিখে জানাইতেছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পনেরো শত ছাত্র পরীক্ষা দিতে বসিলে পরীক্ষা-গৃহে কোন গার্ড বা তদারককারী উপস্থিত ছিল না। সংবাদদাতা ইহাকে ছাত্রদের 'আত্মসম্মান প্রথা' অভিহিত করিয়াছেন। সংবাদদাতার মতে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহাই প্রথম—এইরূপ প্রথা চালু

করা হইল। তিনি আরও জানাইতেছেন যে মার্কিণ দেশের কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এইরূপ প্রথায় পরীক্ষা গৃহীত হইয়া থাকে, পরীক্ষাগৃহে কোন গার্ড বা তদারককারী উপস্থিত থাকে না। পরীক্ষার্থিগণ পরীক্ষার খাতায় লিখিয়া জানায় যে, কোন প্রকার সাহায্য লয় নাই, কাহাকেও সাহায্য করে নাই। ত্রিবান্দ্রম কলেজের অধ্যক্ষ জানাইতেছেন যে পরীক্ষাকার্য্য নির্বিবাদে সম্পন্ন হইয়াছে—কোন বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই।

বাঙলা দেশে পরীক্ষায় যেরূপ বিভ্রাট ঘটে, মাঝে মাঝে যে-রূপ অসাধুতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা কাহারো পক্ষে গৌরবের নয়। তদারককারীর সংখ্যা বাড়াইয়াও যে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় এমন নয়। কাজেই 'আত্মসম্মান প্রথা' চালু করিবার প্রস্তাব করিলে অনেকেই বিচলিত হইবেন, হয়তো বলিবেন যে এমন বিশ্বাস করার কোন বাস্তবসম্মত কারণ নাই। কিন্তু যদি মনে রাখি যে মানবপ্রকৃতি সর্বত্র সমান, ত্রিবান্দ্রম ও বাঙলায় ভিন্ন নয়, আরও যদি মনে রাখি যে বিশ্বাস করিলে প্রতিবিশ্বাস পাওয়া সম্ভব, তবে ব্যাপারটাকে একেবারে অবাস্তব বলিয়া মনে হইবে না। বিশেষ ছাত্রজীবনেই মানুষ যদি দেখে যে তাহারা বিশ্বাসের যোগ্য নয়—তবে তাহার কুফল সারা জীবন থাকিয়া যাইবার আশঙ্কা—হয়তো বা নানা অনভীষ্ট ও অবাঞ্ছিতরূপে থাকিয়াও যায়। ছাত্রদের আত্মসম্মানের উপর সমস্ত ব্যাপারটাকে ছাড়িয়া দিলে নিশ্চয় সুফল পাওয়া যাইবে এমন বিশ্বাস কেন না করিব! প্রথম প্রথম কোথাও কখনো হয়তো বা বিশ্বাসের ব্যভিচার ঘটিবে, কিন্তু ছাত্রগণ যখন বুঝিতে পারিবে যে তাহাদের আত্মসম্মান ছাড়া আর কোন তদারককারী উপস্থিত নাই, তখন তাহারা নিশ্চয়ই বিশ্বাসভঙ্গ করিবে না।

একটি বিদ্যালয়ের কথা জানিতাম যেখানে পরীক্ষায় কোনরূপ তদারক করিবার প্রথা ছিল না। সেখানে সে-সময় পরীক্ষায় বিশ্বাসভঙ্গ হইয়াছে এমন তো কখনো শুনি নাই। এমন বিদ্যালয় দেশে হয় তো আরো ছিল, আর এখন থাকাও অসম্ভব নয়।

অনেকে বাস্তবতার দোহাই দিয়া বলিবেন যে এমন হয় না, যেন পরীক্ষাগৃহে তদারককারী উপস্থিত থাকাই বাস্তবতার চরম। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে মানবপ্রকৃতির চেয়ে অধিকতর বাস্তব আর কিছুই নাই।

আর তাহার মূল সূত্র বিশ্বাসে বিশ্বাস সৃষ্টি করে, আত্মসম্মানের উপর দাবী করিলে সুফল অবশ্যম্ভাবী।

এই প্রথার প্রচলন বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করাই সঙ্গত। বাল্যকালে আত্মসম্মানের উপর নির্ভর করিতে শিখিলে কেবল বয়স্ক ছাত্রজীবনে নয়, উত্তর-জীবনেও ছাত্রগণ সত্যকার মানুষ হইয়া উঠিবে। আর পরীক্ষা পাশের চেয়ে মনুষ্যত্ব যে শ্রেষ্ঠতর আদর্শ—এ বিষয়ে নিশ্চয়ই মতভেদ নাই, বরঞ্চ পরীক্ষাপাশ ব্যাপারটা যাহাতে মনুষ্যত্ব লাভের অনুষঙ্গী হয় সেদিকেই দৃষ্টি রাখিলে সমগ্র সমাজ লাভবান হইয়া উঠিবে। এ প্রথা কি বাঙলা দেশের বিদ্যালয়ে চালানো যায় না? ইহার জন্য সাহস আবশ্যক, সমাজের ও বিদ্যালয়ের প্রধানগণ ও নেতৃগণের এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক।

কমলাকান্তের ধারণা পরীক্ষার দায়িত্ব ছাত্রসমাজের আত্মসম্মানের উপরে দিলে দেশের অন্যান্য ছাত্র সমস্যার পথও অনেকটা সুগম হইবে। জীবনের এক ক্ষেত্রে বিশ্বাস স্থাপন করিলে তাহার সুফল অন্যক্ষেত্রেও পড়িতে বাধ্য। আবার ইহার বিপরীতটাও সত্য। এক ক্ষেত্রে অবিশ্বাস অন্য ক্ষেত্রে অবিশ্বাসের সৃষ্টি করে। কাজেই পরীক্ষায় ছাত্রগণের আত্মসম্মানের উপরে নির্ভর ব্যাপারটাকে সমগ্র ছাত্রসমস্যার অঙ্গরূপে দেখা কর্তব্য। স্বাধীনতার মতো, শান্তির মতো আত্মসম্মানও সামগ্রিক ও সার্বজনীন, খণ্ডশঃ দৃষ্টি ভ্রান্ত দৃষ্টি ছাড়া কিছুই নয়। আগেই বলিয়াছি এ বিষযে অগ্রসর হইতে হইলে কিছু সাহসের প্রয়োজন, কিন্তু সাহস ছাড়া কোন্ মহৎ কার্যটা সম্ভব? এ প্রথা অবিলম্বে চালু হোক বা না হোক বিষয়টা লইয়া সকলের চিন্তা করিয়া দেখা কর্তব্য।

৫৩

শিক্ষক ও রাজনীতি

নৈহাটিতে শিক্ষক সম্মেলনের কয়েকদিন পরেই শিক্ষক সনদ দিবস উদ্‌যাপিত হইলে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, শিক্ষাব্রতিগণ শিক্ষাসমস্যা সম্বন্ধে সচেতন। বলা বাহুল্য ইহা আনন্দের কথা। শিক্ষক সম্মেলন মাঝে মাঝে হইয়া থাকে, কিন্তু 'শিক্ষক সনদ' ব্যাপারটা নূতন হইলেও ইহা শুভ সঙ্কল্প সূচী। এই সনদের বৈশিষ্ট্য হইতেছে শিক্ষকের অধিকার ও দায়িত্ব, দাবী ও কর্তব্য দুইটি বিষয়েরই আলোচনা ইহাতে আছে। এইজন্যই ব্যাপারটাকে শুভ সঙ্কল্প সূচী বলিলাম। লোকের ধারণা শিক্ষকগণ সাধারণতঃ নিজেদের দাবী ও অধিকারের কথাই তোলেন, কর্তব্য ও দায়িত্বের কথায় তাঁহাদের যেন উৎসাহ নাই। বর্তমান সনদ প্রমাণ করিতেছে যে, এরূপ অনুমান সত্য নহে। শিক্ষাব্রতিগণ যদি নিজ কর্তব্য ও দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত হন, তবে তাঁহাদের কাম্য আরো সহজে তাঁহাদের করায়ত্ত হইবে, কেন না দায়িত্ব পালনের দ্বারাই অধিকার অর্জিত হয়। যে-ব্যক্তি নিজ কর্তব্য বিস্মৃত হয় না, তাহার প্রাপ্য অধিককাল তাহাকে এড়াইয়া চলিতে সমর্থ হয় না। কথাটা হঠাৎ শূন্যগর্ভ মনে হইলেও দীর্ঘ অভিজ্ঞতার দ্বারা সমর্থিত। কোন কোন ব্যক্তি মনে করিতেন যে, অনেক শিক্ষক 'ট্রেড ইউনিয়ন'-মনোভাবসম্পন্ন, সমগ্র শিক্ষক সমাজ যে সে ভাবসম্পন্ন নয়, সনদের ভাষা তাহা প্রমাণ করিতেছে। কমলাকান্ত ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষাব্রতিগণের দাবীদাওয়ার অনুকূল, কাজেই তাহার যে বিশেষ আনন্দ হইবে তাহা বলা একান্ত বাহুল্য।

এই প্রসঙ্গে শিক্ষা সমাজ সম্পর্কিত একটি গুরুতর সমস্যার আলোচনা করিতে চাই। শিক্ষকগণ প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে নামিবেন কি না সমস্যা ইহাই। কমলাকান্তের ব্যক্তিগত ধারণা এই যে, শিক্ষকগণের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে পদার্পণ উচিত নয়। কেন বোঝা কঠিন নয়। এখনকার রাজনীতি আর Part-time Job নয়। নিষ্ঠার সহিত রাজনীতিকের কর্তব্য

পালন করিতে হইলে দিনরাত্রি তজ্জন্য ব্যয় করা আবশ্যক। আর সেরূপ করিলে শিক্ষকতা কার্যে ঘাটতি না পড়িয়া যায় না। এক্ষেত্রে যুগপৎ দুধ ও তামাক অচল। যদি কোন শিক্ষক রাজনীতি দ্বারাই দেশের সেবা করিতে চান, তবে তাঁহার সেই পথ গ্রহণ করিতে বাধা নাই। কিন্তু তখন কি তাঁহার পক্ষে শিক্ষকতা পরিহার করা কর্তব্য নহে? অনেকে বলিবেন ভারতীয় সংবিধান সকলেরই রাজনীতি চর্চার অধিকার স্বীকার করিয়াছে। এ কথা সত্য সন্দেহ নাই, কিন্তু অধিকার থাকিলেই সর্বদা সে অধিকারের প্রয়োগ করিতে হইবে এমন কথা নাই। শিক্ষকগণ অভিযোগ করেন যে, সমাজের চোখে শিক্ষকের তেমন মর্যাদা নাই। এ কথা অংশতঃ সত্য, আর তাহার অনেক কারণের মধ্যে একটি শিক্ষকগণের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে পদার্পণ। যে শিক্ষক পথে পথে শ্লোগান দিয়া ফেরেন, সদলবলে শোভাযাত্রা চালান বা পিকেটিং করেন, সমাজের দৃষ্টিতে তাঁহার আর যেরূপ মর্যাদাই থাকুক, শিক্ষক-মর্যাদা হ্রাস না পাইয়া যায় না। তার উপরে তিনি যদি অষ্টপ্রহরব্যাপী রাজনীতির ভূতে পাওয়া হন, তবে সে ভূত তাঁহার ছাত্রদের উপরেও প্রভাব বিস্তার করিবে। ইহা শিক্ষার অনুকূল অবস্থা নয়। দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের সমগ্র দেশকে এখন সুলভ রাজনীতির ভূত প্রেত দানোয় পাইয়াছে। রাজনীতির বুকনি যাহার মুখে লোকচক্ষে সে মস্ত লোক। যে-দোকানদার কেনাবেচা করিবার সময়ে দুটা রাজনীতির কথা বলে তাহার বেশি কাটতি; যে-সাহিত্যিক রচনার সঙ্গে রাজনীতির গরম মশলা মিশাইয়া দেন তিনি বড় সাহিত্যিক; যে ভক্তব্যক্তি প্রাচীন শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে করিতে অর্থনীতির সূত্র আওড়ান তিনি ভক্তচূড়ামণি; এমন আর কত দৃষ্টান্ত দিব। সামাজিক এই আবহাওয়াতে শিক্ষকগণও প্রভাবিত হইয়াছেন। তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন যে, শিক্ষকদের মধ্যে যিনি রাজনীতিক তাঁহারই মান-সম্মান বেশি, ছাত্ররা তাঁহাকে মানে, সাধারণে তাঁহাকে খাতির করে এমন কি সর্বশক্তিমান স্কুল কমিটিও তাঁহার বেতন দুইমাসের অধিক বাকি ফেলিবার সাহস পান না। এমন অবস্থায় শিক্ষকগণ রাজনীতির দিকে না ঝুঁকিয়া পারেন না। ইহা সম্পূর্ণ অবাঞ্ছনীয় অবস্থা, ইহার আশু প্রতিকার আবশ্যক। শিক্ষক সনদে ঘোষিত হওয়া উচিত ছিল যে, শিক্ষক সমাজ প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে পদার্পণ করিবেন না, রাজ্যের আইন সভায় ও

লোকসভায় তাঁহারা প্রতিনিধি প্রেরণ করিবেন না, কিন্তু সাধারণ কেন্দ্র হইতেও নির্বাচনে নামিবেন না। এরূপ করিলে তাঁহাদের মান বাড়িবে বই কমিবে না। একজন শিক্ষক প্রতিনিধি রাজ্যসভায় গেলে শিক্ষকসমাজের শক্তিবৃদ্ধি পায় ইহা উক্ত সৌভাগ্যবান প্রতিনিধি ছাড়া আর কেহ নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন না। কমলাকান্তের অভিজ্ঞতা এই যে, গত সাধারণ নির্বাচনের ঘূর্ণিহাওয়া শিক্ষক সমাজকে বিচলিত করিয়া শিক্ষা সমস্যাকে অধিকতর আবিল করিয়া তুলিয়াছে।

নৈহাটিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষক সম্মেলনে প্রবীণ শিক্ষাব্রতী ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন অন্য অনেক কথার সঙ্গে এই কথাটিই বলিয়াছিলেন। তাঁহার মূল বক্তৃতা আমার চোখে পড়ে নাই। এখানে যেটুকু উদ্ধার করিয়া দিতেছি তাহা হইতেই ডাঃ সেনের বক্তব্য বুঝিতে পারা যাইবে।

"ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন শিক্ষকদের আদর্শ ও কর্তব্য সম্বন্ধে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন যে, শিক্ষকের একমাত্র ও প্রধান কর্তব্য শিক্ষা দান। সুতরাং শিক্ষক হিসাবে ছাত্র সমাজের প্রতি তাঁহার যে দায়িত্ব সেই দায়িত্বকেই বড় করিয়া দেখিতে হইবে। এই দায়িত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ডাঃ সেন কেন্দ্রের বা রাজ্যের আইনসভায় প্রতিনিধি প্রেরণে শিক্ষকদের অংশ গ্রহণ সমর্থন করেন নাই। কারণ তাঁহার মতে ইহাতে শিক্ষাদানকার্য ব্যাহত হইবে।"

৫৪

ছাত্রসমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা

ছাত্রসমাজের ক্রমবর্ধমান উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি দেশের রাজনীতিকগণের সম্প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে, ইহা মন্দর ভালো। দেশে উচ্ছৃঙ্খলতা না থাকিলেই ভালো হইত। রাজনীতিকগণ ইহার প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতেছেন। কিন্তু কারণ জানিলে তবে প্রতিকার। এখন প্রথম প্রশ্ন—ছাত্রসমাজের অনেক অংশে যে শৃঙ্খলার অভাব দেখা যাইতেছে তাহার কারণ কি? দ্বিতীয় প্রশ্ন—তাহার প্রতিকারের উপায় কি?

নানা জনে নানা কারণ দর্শাইতেছেন। অর্থনৈতিক পাদ্রীগণ আমাদের মাথা খারাপ করিয়া দিয়াছে। সব কিছুর পিছনেই একটি আর্থিক কারণ আছে, এটি বর্তমান যুগের একটি মুখ্য কুসংস্কার। এই রাজনৈতিক পাদ্রী-গণের শিক্ষা আমাদের বলিতেছে যে, দারিদ্র্যই ছাত্রসমাজের উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ। দারিদ্র্য কখনোই বাঞ্ছনীয় নয়, কাজেই দারিদ্র্য দূর করা অবশ্যই দরকার। কিন্তু দারিদ্র্য যে এই অবস্থার কারণ, ইহা স্বীকার করিতে পারি না। আমাদের দেশ দরিদ্রের দেশ, এদেশের অধিকাংশ নমস্য সন্তান দরিদ্রের ঘরে জন্মিয়াছেন, দারিদ্র্য আমাদের দেশে মানুষকে মনুষ্যত্বের ধাপ হইতে টানিয়া নামায় না বা সামাজিক বিশৃঙ্খলা ঘটাইতে শেখায় না। খুব সম্ভব ইউরোপে দারিদ্র্য মনুষ্যত্বের পরিপন্থী, খুব সম্ভব রাজনৈতিক পাদ্রীগণের সেই শিক্ষাই পূর্বাপর বিবেচনা না করিয়া এদেশের রাজনৈতিক প্রধানগণ এদেশের অবস্থার প্রতি আরোপ করিয়া একটি মহতী ভ্রান্তি করিতেছেন। পুনরায় বলি, দারিদ্র্য সমর্থনীয় নয়, দারিদ্র্য দূর হওয়া আবশ্যক, কিন্তু তাই বলিয়া ইহাও স্বীকার করিতে পারি না যে, দারিদ্র্য হইতেই এ অবস্থার উদ্ভব। তবে ইহার কারণ কি?

প্রথম ও প্রধান কারণ রাজনীতির আতিশয্য এবং অনেক রাজনীতিকের আচরণ ও ব্যবহার। ছাত্রগণ দেখিয়া শিখিবে। এ যুগে সমাজের মুকুটমণি রাজনীতিকগণ, তাঁহারা নির্বাচনসাগর অতিক্রমকারী মহাবীর। তাঁহাদের গর্জনে দিগ্‌গজ লাঞ্ছিত, বাসুকি কম্পিত, তাঁহাদের সমকক্ষ কে? তাঁহাদের আদর্শ ছাড়া ছাত্রগণ আর কোন্ আদর্শ অনুসরণ করিবে? সামান্য ইস্কুল-মাষ্টারের পদাঙ্ক অবশ্যই অনুসরণযোগ্য নয়। এখন, দেশের বিধানসভাসমূহে দেশবাসীর অর্থে লালিত মাননীয়গণ মাঝে মাঝে যেভাবে দেশবাসীর মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন, তাহা উপভোগ্য হইলেও তরুণ সমাজের পক্ষে বাঞ্ছনীয় দৃষ্টান্ত নহে। অবশ্য আমরা গৌরব করিয়া বলিতে পারি যে, আমাদের মাননীয় প্রতিনিধিগণের স্তরে ছাত্রগণ এখনো পৌঁছিতে পারে নাই। বিধানসভাসমূহের কাণ্ড-কারখানা ক্রমে যেরূপ হইতে চলিয়াছে, তাহার বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশ বন্ধ করা উচিত কি না, ভাবিবার সময় বোধ করি আসন্ন। এখন দেশের মাথাগণ (আমাদের ঘাড়ে কয়টি মাথা?) যদি এরূপ কাণ্ড করিতে থাকেন, তবে ছাত্রগণকে আর দোষ দেওয়া কেন? এই সঙ্গেই

জড়িত আছে রাজনীতির প্রশ্নটা। রাজনীতির আত্যন্তিক প্রভাব কোন সমাজের পক্ষেই শুভ নয়, উহা অনেক সময়েই সামাজিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী। কিন্তু রাজনীতিকগণ বিবেচক হইলে অশুভ অনেকাংশে কাটিয়া যায়। কিন্তু এদেশের অধিকাংশ রাজনীতিক……কি বলিব? আশা করি, পাঠক আমার মনের কথা বুঝিতে পারিয়াছেন।

ছাত্রসমাজের উচ্ছৃঙ্খলতার দ্বিতীয় প্রধান কারণ ছাত্রসমাজের উপরে শিক্ষক-সমাজের প্রভাব হ্রাস। স্নেহশীল শিক্ষক ও শ্রদ্ধাবান ছাত্র শিক্ষার অনুকূলতম অবস্থা। সে অবস্থা আমাদের দেশে এই সেদিন অবধি ছিল। ছাত্রগণ জানিত, শিক্ষকের আদেশ অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু ইহা আমাদের রাজনীতিকগণের সহ্য হইল না। বিনা পয়সায় ভলাণ্টিয়ার পাইবার আশায় তাঁহারা ছাত্রসমাজকে শিক্ষক-অসহিষ্ণু করিয়া তুলিয়াছেন, অবস্থা এখন চরমে পৌছিয়াছে।

শিক্ষক ও ছাত্র যেখানে পরস্পরের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস পোষণ করে না, মনে করে উভয়ের স্বার্থ ভিন্ন, ছাত্র যেখানে আদর্শের আশায় রাজনীতিকগণের দিকে চাহিয়া থাকে, শিক্ষক যেখানে ট্রেড ইউনিয়ন পন্থা অবলম্বন করে, সেখানে অবস্থা চরমে উঠিয়াছে বলিলে কি অন্যায় হইবে? আর এটি ঘটাইয়াছে রাজনীতির শিক্ষা। ভলাণ্টিয়ারের আবশ্যক, প্রপাগাণ্ডার আবশ্যক—তাই ছাত্রসমাজকে আবশ্যক। কিন্তু তাহার অন্তরায় শিক্ষক সমাজ, কাজেই ছাত্রসমাজকে শিক্ষক-অসহিষ্ণু করিয়া তুলিতে হইবে—খুব সম্ভব এইরকম একটি লজিক রাজনীতিকগণ অনুসরণ করিয়াছেন। আর আজ তাহার অনিবার্য পরিণাম সকলেই দেখিতে পাইতেছে। কাজেই ছাত্রসমাজকে উচ্ছৃঙ্খলতার জন্ম আর যাহারাই দোষী করুক, রাজনীতিকগণের করা উচিত নয় এবং অধিকাংশ রাজনীতিকই তাহা করেন না। কেন করিবেন? আমার পদাঙ্ক কেহ অনুসরণ করিলে আমার কি তাহাকে দোষ দেওয়া সাজে?

প্রধানতঃ এই দুটিই ছাত্রসমাজের সাম্প্রতিক উচ্ছৃঙ্খলতার মুখ্য কারণ। অপর যদি কিছু থাকে তুলনায় গৌণ। এখন এ দুটি কারণ দূর হইলে তবেই অবস্থার প্রতিকার হইবে। কিন্তু ভাবে বোধ হইতেছে যে, রাজনীতিকগণ শিয়ালের ঠ্যাং বলিয়া বটের শিকড় ধরিয়াছেন। আর শিয়ালের ঠ্যাং-ই বা ধরিবেন কিরূপে, তাহাতে যে নিজেদের দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া হয়।

৫৫

কেন এমন হয় ?

এবারকার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় বাহাত্তর হাজার পরীক্ষার্থী যোগদান করিয়াছিল। তন্মধ্যে ফেল করিয়াছে সাঁইত্রিশ হাজার আর থার্ড ডিভিশনে পাশ করিয়াছে সাড়ে সাতাশ হাজার। এই দুঃসহনীয় অবস্থা শিক্ষিত সমাজের শিরঃপীড়ার কারণ ঘটাইয়াছে। কিন্তু এরূপ শিরঃপীড়ার কারণ প্রতি বৎসর ঘটিতেছে। দু'চার দিন সকলে হা-হুতাশ করে, পরে ভুলিয়া যায়, পর বৎসর আবার ঠিক অনুরূপ কাণ্ড ঘটে। শীঘ্র যে অন্যথা হইবে এমন আশা দেখি না। প্রত্যেক বৎসর স্কুল ফাইনালের ফল বাহির হইলে কিছু-দিন কার্যকারণ লইয়া আলোচনা চলে, সংবাদপত্রে প্রবন্ধ ও পত্রাদি প্রকাশিত হয়—তারপরে যথা পূর্বং তথা পরং চলিতে থাকে। এইসব আলোচনায় বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রায় সকলেই "নিরাপদ নীতি" গ্রহণ করিয়া আলোচনায় নামেন। যেসব বিচিত্র কারণের সমবায়ে এমন ছাত্রমেধ কাণ্ড ঘটে—তন্মধ্যে যে কথাগুলি বলা "নিরাপদ" এবং যাহাতে কাহারো স্বার্থে আঘাত না পড়ে, সেই কথাগুলিই সকলে বলেন। অপ্রিয় সত্য ভাষণের দায়িত্ব প্রায় কেহ স্বীকার করিতে চান না। সরকারের দোষ, সমাজ-ব্যবস্থার দোষ, শিক্ষানীতির দোষ—এই পর্যন্ত বলিয়াই সকলে ক্ষান্ত হন—তদধিক অগ্রসর হইলে স্বার্থে ঘা পড়িবার আশঙ্কা এবং কোন কোন মহলের অপ্রীতি-ভাজন হইবার সম্ভাবনা। এমন মাথা বাঁচাইয়া চলিলে মাথা বাঁচিতে পারে, কিন্তু অবস্থার প্রতিকার ঘটে না। কমলাকান্ত অনেকবার ইহার প্রতিকারের পন্থা আলোচনা করিয়াছে, কিন্তু সে তো রাজনীতিক নহে, ভোট-সর্বস্ব নেতা নহে, সমাজের "নির্বাচিত" নেতৃস্থানীয় নহে, সামান্য কলম-(column)বাজ মাত্র, কাজেই তাহার কথা কেহ কানে তোলেন নাই। এখনও কানে তুলিবেন এমন ভরসা নাই—তবু আর একবার বলিতে দোষ দেখি না। কান যদি শ্রবণ করিতে অস্বীকার করে—মুখ কথা বলিতে অস্বীকার করিবে কেন ?

এমন সার্বজনীন পরীক্ষায় ছাত্রের প্রতি অবিচার না হইয়াই পারে না। পরীক্ষা গ্রহণকর্তা বোর্ড যতই সতর্কতা অবলম্বন করুন না কেন, বাহাত্তর হাজারের প্রতি যথোচিত বিচারের দৃষ্টি জাগ্রত রাখা মানুষের অসাধ্য। আর বাহাত্তর হাজার ২।৪ বছরের মধ্যেই এক লক্ষে পরিণত হইবে। তখন অবস্থার আরো অবনতি অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য পরীক্ষা ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম—আরো অনেকে লিখিয়াছিলেন, কিন্তু কেহ কর্ণপাত করেন নাই। কেন? অনুমান করিতেছি, কোন কোন প্রবল মহলের রুজি-রোজগারে হাত পড়িবার আশঙ্কা। নিজের গণ্ডা ঠিক করিয়া পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙিয়া "বিপ্লব" করিতে গেলে তাহা প্রায়শঃ সফল হয় না।

দ্বিতীয় কারণটি অধিকতর অপ্রীতির সম্ভাবনাস্থল—কাজেই সকলেই সেটা এড়াইয়া যান। ২৭শে জুলাই তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় ডক্টর জ্যোতির্ময় ঘোষ "থার্ড ডিভিশন" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ডাঃ ঘোষ প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, শিক্ষার সহিত "অর্ধ শতাব্দীর" যোগের ফলে তিনি যাহা বুঝিয়াছেন, এই প্রবন্ধে জানাইয়াছেন। এই স্পষ্টভাষিতার জন্য এবং অপ্রিয় সত্যভাষিতার জন্য তিনি সমাজের সকলের ধন্যবাদের পাত্র। এই প্রবন্ধে তাঁহার দুইটি সিদ্ধান্ত। প্রথমটি "ইহারা (থার্ড ডিভিশনে পাশ ছাত্রগণ) থার্ড ডিভিশনের মানুষ নহে।" তবে কেন এমন হয়? সেটি তাঁহার দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত। সেটি আগাগোড়া তাঁহার ভাষাতেই তুলিয়া দিলাম। সমাজ-হিতকামী ব্যক্তি মাত্রেরই তাহা প্রণিধানযোগ্য।

ডাঃ ঘোষ বলিতেছেন :—

"বিদ্যালয়ের অভাব অভিযোগ আছে। কিন্তু শুধু অভাবের অজুহাতে আমরা সম্পূর্ণ দায়মুক্ত হইতে পারি না। শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে, নিয়মকানুনের মধ্যে বহু ত্রুটি আছে, তাহাও অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু এই সকল অসুবিধা বা অভাবের অজুহাতেই আমরা সমগ্র একটা জাতির কিশোর ও যুবকদিগকে একটা অনভিপ্রেত এবং অবাঞ্ছনীয় অপদার্থতার চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া তাহাদিগকে দারুণ হীনম্মন্যতার কবরে নিক্ষেপ করিব?

"শিক্ষাদান বিনামূল্যে হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু শিক্ষার ব্যবসায় ঠিক অন্যান্য ব্যবসায়ের মত নহে। কালোবাজারীরা, মুনাফাখোরেরা আমাদের

ক্ষতি করে বলিয়া আমরা অভিযোগ করি; কিন্তু 'পড়াইব' বা 'শিখাইব' বলিয়া অভিভাবকগণের নিকট হইতে অর্থগ্রহণ করিয়া যদি আমরা কিছুই না শেখাই, সেটা কি একপ্রকার মুনাফাখোরের কাজ নয়? আমি ব্যক্তিগত-ভাবে কোন শিক্ষক সম্পর্কেই কোন কথা বলিতেছি না। আমাদের অধিকাংশ বিদ্যালয়গুলির যে গঠন এবং যে সকল নিয়মাদি পালন করিয়া চলিতে হয়, তাহাতে হয়তো এই চরম দুর্দশাই আমাদের প্রাপ্য। কিন্তু এ বিষয়ে চিন্তা করিবার সময় কি এখনও হয় নাই? যাঁহারা দেশের এবং দেশের ছেলে-মেয়েদের সত্যকার কল্যাণ চান, তাঁহাদিগকে এ সম্পর্কে সম্যক্ অবহিত হইতে হইবে। নতুবা জাতির ও সমাজের কল্যাণ নাই।"

ডাঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ মহাশয় যাহা বিস্তারিতভাবে বলিয়াছেন, কিছুদিন আগে পশ্চিম বঙ্গ বিধানসভার অধিবেশনে ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয় তাহাই অতিশয় সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন—"শিক্ষকগণ শিক্ষা দেন না, ছাত্রগণ পড়ে না।" দুইজনের ভাষা পৃথক, কিন্তু ভাব এক এবং এখানেই আমাদের শিক্ষা জগতের অন্যতম প্রধান ত্রুটি।

৫৬

গঠনাত্মক দৃষ্টি

সম্প্রতি দমদম মোতিঝিল ময়দানে উদ্বাস্তু সম্মেলনে ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে গঠনাত্মক দৃষ্টি প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য বক্তাগণ যখন কেবল সমালোচনা করিয়াই কর্তব্য সমাধা করিয়াছেন, তখন কেবল নেতিবাচন মাত্র না করিয়া ডাঃ ঘোষ পথ নির্দেশ করিয়াছেন, কি ভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত, কি ভাবে অগ্রসর হইলে সমাধান হওয়া সম্ভব প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। উদ্বাস্তুগণের অধিকার ও দাবীর সমর্থন যেমন তিনি করিয়াছেন তেমনি তাহাদের কর্তব্য ও দায়িত্বের কথাও স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গে আরো অধিকসংখ্যক উদ্বাস্তুবাসন সম্ভব কি না যেমন

বিচার করিয়া দেখিতে বলিয়াছেন তেমনি "নীতিগতভাবে" উদ্বাস্তুগণের অন্য প্রদেশে যাওয়াও তিনি সমর্থন করিয়াছেন। ইহাই প্রকৃত গঠনাত্মক দৃষ্টি—এবং দেশে আজ ইহার বড় প্রয়োজন। অধিকাংশ লোকে সমালোচক হইয়া উঠিলে দেশের মঙ্গল হয় না, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমালোচনা দায়িত্বহীন বলিয়া তাহা নিতান্ত নেতিবাচক ভাব। বস্তুতঃ আইনসভায় সরকার বিরোধী দলের প্রধান কর্তব্য হইতেছে গঠনাত্মক প্রস্তাব দ্বারা সরকারের ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে পশ্চিম বঙ্গ বিধানসভায় অনেকেই কথাটি মনে রাখেন না, এ বিষয়ে সরকার পক্ষ ও সরকার বিরোধী পক্ষের অনেকেই একাসনে অবস্থিত। সরকার বিরোধী পক্ষের মুখে দায়িত্বহীন উক্তি ও সমাধানহীন উক্তি একেবারেই সাজে না, কেন না, ঘটনাচক্রে সরকার গঠনের ভার তাঁহাদের উপরে আসিয়া পড়িলে ঐ সব দায়িত্বহীন উক্তি ও সমাধানহীন ইঙ্গিত সারিবদ্ধভাবে পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাদের বিব্রত করিয়া তুলিবে না কি? ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রতিদিন কেরল রাজ্যের শাসন ব্যাপারে মিলিতেছে। আজকার দিনে তথাকার কম্যুনিষ্ট সরকার যে সব উক্তি করিতেছেন ও বিবৃতি দিতেছেন সেগুলি পূর্বতন "প্রতিক্রিয়াশীল" কংগ্রেস ও প্রজা-সমাজতন্ত্রী সরকারের প্রতিধ্বনির মতোই যেন শোনাইতেছে। ধরুন, ঘটনাচক্রে পাঁচ বৎসর পরে পশ্চিম বঙ্গে যদি প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল সরকার গঠন করেন তখন এই সব সমস্যাই তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে। রাজনীতিকের অদ্যতন ও আগামী-কল্যের কথা একসঙ্গে চিন্তা করা আবশ্যক। এইরূপ চিন্তাধারা গঠনাত্মক হইতে বাধ্য। দুঃখের বিষয় এটি দুর্লভ। এখন ডাঃ ঘোষ মহাশয় দেশের মধ্যে ও বিধানসভায় গঠনাত্মক মনোভাব জাগাইয়া তুলিতে পারিলে দেশের একটি প্রধান অভাব মোচন করিয়া অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

এই প্রসঙ্গে ডাঃ ঘোষ "দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা" সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। উক্ত পরিকল্পনাকে তিনি যেমন সরাসরি উড়াইয়া দিতে নিষেধ করিয়াছেন, তেমনি আবার কোনরূপ ব্যবস্থা না করিয়াই তিনি সেখানে উদ্বাস্তু পাঠাইবার বিরুদ্ধেও সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। অর্থাৎ সরকার ও জনসাধারণ দুই পক্ষকেই তিনি অবহিত হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। ডাঃ ঘোষের এই গঠনাত্মক দৃষ্টির সহযোগিতা

করা সকল পক্ষেরই কর্তব্য—সরকার, সরকার বিরোধী ও দেশবাসী। নিছক নেতিবাদে চরিতার্থতা নাই, এই অতি সরল ও সত্য কথাটি বুঝিতেই স্বাধীনতার প্রথম দশ বৎসর গেল, আরো কত দিন লাগিবে তাহাই ভাবিয়া উদ্বেগ বোধ করিতেছি।

৫৭

রাজনৈতিক ভূত

আগে উল্লেখ করিয়াছি, পশ্চিম বঙ্গ বিধানসভার অধিবেশনে প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের নেতা ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ শিক্ষা প্রসঙ্গে একটি অতিশয় মূল্যবান উক্তি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে শিক্ষকগণ শিক্ষা দেন না, ছাত্রগণ পড়ে না। বলা বাহুল্য কথাটি যেমন অপ্রিয়, তেমনি সত্য, আর প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতে তেমনি সাহসের আবশ্যক। বাঙালী শিক্ষিত সমাজ মনে মনে যাহা অনুভব করিয়া থাকে কিন্তু সাহস বা প্রসঙ্গের অভাবে যাহা বলিতে পারে না ডাঃ ঘোষ তাহা প্রকাশ্যে বলিয়া সমস্ত সমাজের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। বলিয়াছি যে, বিধানসভায় নেতিবাচক অনেক কথাই শুনিতে পাওয়া যায়—কিন্তু এমন সার্থক ইঙ্গিতপূর্ণ বাক্য কদাচিৎ উক্ত হইয়া থাকে। ডাঃ ঘোষ এইভাবে দেশ গঠনের দৃষ্টি বিধানসভায় প্রবর্তন করিতে সক্ষম হইলে সমস্ত দেশের উপকার হইবে। বিরোধী দল সরকারী দলের পরিপূরক, সরকারী দলের প্রতিবাদী নহে।

'শিক্ষকগণ শিক্ষা দেন না, ছাত্রগণ পড়ে না।'—এই একটি সূত্রে শিক্ষা জগতের যাবতীয় ট্রাজেডি ঘনীভূত। সূত্রটির ভাষ্য করিলে শিক্ষার ইতিহাস বর্ণিত হইয়া যায়। একটিমাত্র বাক্যে এতখানি প্রকাশের ক্ষমতায় বিশেষ মনীষার আবশ্যক হয়। গোড়াকার প্রশ্ন এই শিক্ষার কেন এমন দুর্দশা? অনেক কারণ আছে, শিক্ষকগণের বেতনের স্বল্পতা, বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যার আধিক্য, কলিকাতা সহরে অতি জনতার চাপ, শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে প্রত্যয়ের অভাব ইত্যাদি। কিন্তু সবচেয়ে গুরুতর কারণ, যাহার তুলনায় এ সমস্তই নগণ্য, সেটি হইতেছে শিক্ষা জগতে রাজনৈতিক দলের অবাঞ্ছনীয়

প্রভাব। শিক্ষার ঘাড়ে অর্থাৎ শিক্ষকের ঘাড়ে, কাজেই ছাত্রের ঘাড়ে, পাঠ্যতালিকার ঘাড়ে, স্কুল কমিটির ঘাড়ে অর্থাৎ সর্বময় ঘাড়ে রাজনৈতিক ভূত চাপিয়া তাথৈ নৃত্য সুরু করিয়াছে। জনশ্রুতিতে শুনিয়াছি যে শিক্ষা জগতের সহিত সম্পর্কহীন নেতা (?) বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া ছাত্র-সভায় সংস্কৃতি (?) প্রচারের নামে নির্লজ্জ নির্বাচনী বক্তৃতা করিতেছে, প্রধান শিক্ষক মহাশয় নিজ কক্ষে অসহায় বসিয়া আছেন, কিম্বা আদৌ হয়তো অসহায় নহেন, এই পাপচক্রের তিনিও হয়তো একজন গোপন উদ্যোক্তা। এবম্প্রকার ঘটনা এতই অবিরল যে আজ আর উদাহরণযোগে বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না। জানেন সকলেই, পরিণামও যে না বোঝেন তাহা নয় কিন্তু সকলেই বেশ **tactfully** চলেন, সত্য কথা বলিয়া কে অপ্রিয় হইবে? এহেন অবস্থায় ডাঃ ঘোষ যে **tact**-এর আশ্রয় না লইয়া সত্যোদ্‌ঘাটন করিয়াছেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর।

যদি কোন রাজনৈতিক দল মনে করেন যে, এইভাবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে হাত করিয়া কংগ্রেস সরকারকে বিব্রত করি, অপ্রীতিভাজন করিয়া তুলি এবং অবশেষে তাহাদের গদিচ্যুত করি, তবে তাহাদের স্মরণ করাইয়া দিই যে, কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট কিন্তু চিরকাল থাকিবে না, কিন্তু যে সমস্যা এখন সৃষ্ট হইতেছে তাহা থাকিয়া যাইবে। যে-শিক্ষক শিক্ষা দেন না, যে-শিক্ষার্থী পড়ে না—সেই **human material** লইয়া তাঁহাদেরও কাজ করিতে হইবে। তখনকার কথাটা একবার রাজনৈতিক দলগুলি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি? তাঁহারা যদি এই ভূতের সহযোগিতায় বর্তমান সরকারকে বিব্রত করিয়া তোলেন, তবে যেন না ভুলিয়া যান যখন তাঁহারা সরকার গঠন করিবেন এই ভূত তাঁহাদিগকেও বিব্রত করিতে দ্বিধা করিবে না, ভূতের কোন রাজনীতি নাই—মানুষকে বিব্রত করাই তাহার একমাত্র নীতি।

মনে রাখিতে হইবে যে, দেশের উন্নতি সাধনের জন্যই সরকারের সৃষ্টি। কিন্তু রাজনীতির দলাদলির চক্রান্তে পড়িয়া শিক্ষার অর্থাৎ দেশের যদি এহেন অবস্থা হয়, তবে এক সরকারের স্থানে অন্য সরকার প্রতিষ্ঠা হইলেই বা কি লাভ হইবে? তখন কি গদিচ্যুতরা আবার সেই সর্বনাশা খেলায় মাতিবে না? এইভাবেই কি চিরটা কাল চলিবে? যে **human material**-এর উন্নতি সাধন সকলের লক্ষ্য—সেই **human material**-কেই সর্বনাশা কার্যে

নিয়োগ, এ যেন শালগ্রাম শিলা ছোঁড়াছুড়ি করিয়া শরিকানি মামলা নিষ্পত্তির চেষ্টা !

আমি তো এমন কোন সর্ষে-পড়া বা হলুদ-পোড়ার সন্ধান জানি না যদ্দ্বারা এই ভূত নামানো যাইতে পারে। ডাঃ ঘোষের মত বাংলার শিক্ষা জগতে আজ অচলাবস্থা। আর কিছুকাল এমন চলিলে তখন শিক্ষকগণ শিখাইতে ইচ্ছুক হইলেও কিছু শিখাইতে পারিবেন না। না শিখিয়া যে বিদ্যা আয়ত্ত হয় সে মূলধনে আর যে ব্যবসা চলুক শিক্ষাদান চলে না। তখন "অন্ধেন অন্ধোনীয়মানঃ'—উপভোগ্য দৃশ্য হইবে বটে !

অনেক বলিবেন যে কমলাকান্ত একদেশদর্শী। এ বিষয়ে সরকারের দায়িত্ব সম্বন্ধে নীরব। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে আমি নীরব হইলেও লোকে নীরব নয়—সহস্র কণ্ঠে সে কথা ধ্বনিত হইতেছে। বস্তুতঃ সে ধ্বনি এতই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে তাহার তলায় অন্য দিকটা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। ডাঃ ঘোষ সেই দিকটা তুলিয়া ধরিয়াছেন। আর আশা করিতেছি যে ইহার প্রতিকারোপায় নির্দেশ করিয়া তিনি দেশের অনন্ত কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

৫৮

"বাবু" বনাম "হাতুড়ে"

সেদিন নেহরুজী "বাবু সভ্যতার" নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, এক সময়ে তিনি কর্মী ছিলেন, কিন্তু এখন অধিকাংশ সময় দিল্লীতে দপ্তরখানায় বসিয়া "বাবু"র মতো নথীপত্র পড়িতে বাধ্য হন। ইতিপূর্বে, অনেক কাল আগে বঙ্কিমচন্দ্রও "বাবু"র নিন্দা করিয়াছেন, মানব চরিত্রের যাবতীয় দোষ তিনি বাবুর স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছেন।

বাবু চরিত্র যে সমস্ত নিন্দার অতীত এমন বলি না, তাই বলিয়া আবার সংসারের যাবতীয় দোষের ঘাঁটি বাবু চরিত্র এমনও স্বীকার করিতে পারি না। বরঞ্চ বলিব যে, গত একশ বছরের ভারতীয় ইতিহাস বাবু সভ্যতারই ইতিহাস, তাহাতে দোষও যেমন আছে, গুণও তেমনি আছে, বোধ করি দোষের তুলনায় গুণের পরিমাণই অধিক। কিন্তু যাঁহারা বাবু চরিত্রে

সর্বদোষের আকর আবিষ্কার করিয়াছেন, কমলাকান্তের মতে তাঁহারা একদেশদর্শী। খুব সম্ভব তাঁহারা "বাবু"র প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে "হাতুড়ে"কে দাঁড় করাইতে চান। "হাতুড়ে" কি না যাহারা হাতুড়ি পেটে, কল চালায়, যন্ত্র-বিদ্যায় আছে যাহাদের নৈপুণ্য। আর "বাবু" হইতেছে প্রধানতঃ কলমজীবী ব্যক্তি।

এখন যাঁহারা বাবুর নিন্দা করেন, আর "হাতুড়ে"দের প্রশংসা করেন, তাঁহাদের নিরপেক্ষ বলিতে পারি না। তাঁহারা সর্বদা "বাবু"র নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত এবং "হাতুড়ে"র উৎকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেন। এমন ক্ষেত্রে বিচার কখনোই ন্যায় বিচার হইতে পারে না। অন্যপক্ষে "বাবু"র উৎকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত ও "হাতুড়ে"র নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলেও অন্যায় হইবে। "বাবু" সভ্যতার বিচার করিতে হইলে বাবু সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ফল দেখাইতে হইবে। সেরূপ নজিরের অভাব নাই। এক সময় সকলেই রবীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রবাবু বা রবিবাবু বলিত, এখনো আমরা বঙ্কিমবাবু বলি। মধুসূদন খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ না করিলে খুব সম্ভব তিনি মধুবাবু নামে অভিহিত হইতেন। বিদ্যাসাগরকে বিদ্যাসাগরবাবু বলিবার নজির সেকালের পুঁথিপত্রে পাওয়া যায়। এ সমস্ত দৃষ্টান্ত নিশ্চয়ই অগ্রাহ্য করিবার মতো নয়। আর দেশের কোন ইতিহাস গ্রন্থই নিশ্চয়ই এই সব মহনীয় পুরুষের কীর্তি বাদ দিতে সম্মত হইবে না। বাবু সভ্যতার বিচার করিতে বসিলে এমন রায় দিতে হইবে, যাহাতে এই সব মহাপুরুষ সম্মানের আসন পান। নতুবা অকর্মণ্য, বহুভারপীড়িত, অদৃষ্ট ও মনিবের দ্বারা লাঞ্ছিত একটি কেরাণীর দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে বাবু সভ্যতার স্বরূপ প্রদর্শন হইবে না।

"বাবু"র বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ কি? "বাবু" অকর্মণ্য। বাবু পরজীবী, নিজে ধনোৎপাদন করে না, পরের উৎপাদিত ধন ভোগ করে। প্রথমে ধনোৎপাদনের জবাব দিই। এটি নিতান্তই একালের একটি অর্থনৈতিক তত্ত্ব। এখন একালের অর্থনৈতিক তত্ত্বের জন্য সেকালের মানুষকে দায়ী করা চলে না। আর সেজন্য যদি বাবুকে দায়ী করা হয়, তবে রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, ভীমার্জুন, অশোক, আকবর সকলকেই দায়ী করিতে হয়, কারণ যতদূর জানি, তাঁহারা কেহই চাষ করিতেন না বা কারখানায় হাতুড়ি পিটিতেন না। অতএব বাবু যদি এ দায়ে দোষীই হয়, তবে সে বহু কীর্তিমানের

সমপর্যায়ভুক্ত। এবারে অকর্মণ্যতার অভিযোগ। অধিকাংশ বাবু কলম পিষিয়া বা নথী পড়িয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছে সত্য, কিন্তু বাবু ও বাবুর সন্তানগণই ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে দেশকে সজাগ ও সচেতন করিয়া তুলিয়াছে; তাহারাই ইংরাজ সাম্রাজ্যের দুর্ভেদ্য প্রাচীর হইতে প্রথম ইষ্টক ক'খানা খসাইয়া ফেলিয়া ইংরাজ শাসনের বনিয়াদ শিথিল করিয়া দিয়াছে। ঐতিহাসিক নেহরুকেও এ সত্য স্বীকার করিতে হইবে। কাজেই বাবু সভ্যতার বিচারে বসিলে এ সত্য অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? আর এ সত্য একবার স্বীকার করিলে বাবুকে নিন্দা করিতে কলম কুণ্ঠিত হইবেই।

একটি উদাহরণ সময়োচিত ও প্রাসঙ্গিক হইবে। লোকটি সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাসে "জেমিগ্রীণ" নামে পরিচিত। বিদ্রোহের অপরাধে ধৃত হইয়া তাঁহার ফাঁসীর হুকুম হয়। ফাঁসীর পূর্বরাত্রে একজন ইংরাজ সৈনিকের কাছে যে স্বীকারোক্তি সে করে তন্মধ্যে আছে—"জেমিগ্রীণ" বলিতেছে, সিপাহীরা তোমাদের শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহাদের সাধ্য নাই যে, তোমাদের শাসন টলায়। সে বলিল—সাহেব তোমাদের শাসন টলাইবে কাহারা জানো! আমার মতো স্কুল কলেজে পড়া লোকে (সে ইচ্ছা করিলে "বাবু" শব্দটি প্রয়োগ করিতে পারিত) যখন তোমাদের শাসনের উপরে, তোমাদের ন্যায়পরতার উপরে বিশ্বাস হারাইবে, সেদিন তোমাদের সমূহ সর্বনাশ! সেদিন জানিও যে তোমাদের সাম্রাজ্যের সিংহাসন টলিল। সে বলিয়াছিল যে, এ সিপাহিগণের সাধ্য নাই যে, তোমাদের দূর করিতে পারে। পরবর্তীকাল প্রমাণ করিয়াছে যে, "জেমিগ্রীণে"র উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। স্কুল কলেজে পড়া মানুষে (বাবুর দল) ইংরাজ সাম্রাজ্য ধ্বংসে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করিয়াছে, এ কথা এমন সত্য যে, প্রমাণের আবশ্যক আছে মনে করি না। ইহাই "বাবু সভ্যতার" অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি, অপর শ্রেষ্ঠ কীর্তির কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি—রবিবাবু, বঙ্কিমবাবু প্রভৃতির মহৎ কীর্তি।

আসল কথা বাবু সভ্যতা উদার শিক্ষার ফল। উদার শিক্ষার গুণ ও দোষ দুই-ই বাবু সভ্যতায় বর্তিয়াছে। বিচারের সময়ে গুণ বাদ দিয়া দোষটি গ্রহণ নিতান্ত অবিধেয়। কিন্তু বাবুকে দোষ দিয়া লাভ নাই, যেহেতু বাবু

সভ্যতা বিদায় লইবার মুখে, এখন তৎস্থলে আসন্ন "হাতুড়ে" সভ্যতা। বাবু সভ্যতা গত একশ বছরের ইতিহাস তৈয়ারি করিয়াছে, ইংরাজ সাম্রাজ্য টলাইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতিকে দিয়াছে, দেশে এখনো যেটুকু মনের আলো বর্তমান তাহাও ঐ বাবু সভ্যতারই কৃপায়। এবারে দেখা যাক্, "হাতুড়ে" সভ্যতা আমাদের কোথায় লইয়া যায়। হাতুড়ে সভ্যতার কৃপায় যে জীবনচিত্র উদ্‌ঘাটিত হইবে, তাহার মধ্যে নেহরুর মতো মানসজীবীর স্থান আদৌ আছে কি না, কিম্বা কতটুকু আছে, তাহা সত্যই একটা দুর্জ্ঞেয় ও প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসার চিহ্ন।

৫৯

ইংরাজি শিক্ষা

প্রেসিডেন্সি কলেজের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইল। প্রেসিডেন্সি কলেজের জীবিত ছাত্রগণের মধ্যে মুখ্যতম স্বয়ং রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ এই উপলক্ষ্যে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, কাজেই আড়ম্বরেরও অভাব হয় নাই। ব্যাপারটা বড় সামান্য নয়, কারণ প্রেসিডেন্সি কলেজ ও তাহার পূর্বরূপ হিন্দু কলেজ এদেশে ইংরাজি শিক্ষায় যুগান্তর আনিয়াছে। আরো বলা যাইতে পারে যে, হিন্দু কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসই বাংলা দেশের গত দেড়শ বছরের ইতিহাস। কোন একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নয়। প্রেসিডেন্সি কলেজের কোন কোন কৃতবিদ্য ছাত্রের মুখে শুনিয়াছি যে, শিক্ষিত ব্যক্তির মুখ দেখিলেই নাকি বুঝিতে পারা যায় যে সে উক্ত কলেজের ছাত্র কি না! সেরূপ অন্তর্দৃষ্টি না থাকায় কমলাকান্ত বিষয়টি সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইল (দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া বুঝিয়াছি যে তাহার শ্রীমুখেও ক্ষণে ক্ষণে একটি দীপ্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু হায় তাহা উক্ত কলেজের শিক্ষা-সাহচর্য-জাত নয়, নিতান্তই ধূমায়মান বিড়ির দীপ্তি)। তৎসত্ত্বেও স্বীকার করিতে আপত্তি নাই যে, গত দেড়শ বছরে বাংলা দেশের ও বৃহত্তর ক্ষেত্রের বিভিন্ন

জীবনস্তরে যে সব জ্ঞানী গুণীর উদ্ভব হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই প্রেসিডেন্সি কলেজ ও হিন্দু কলেজের শিক্ষার ফল! (ইস্, বড়লোক বনিবার কি সুযোগটাই না কমলাকান্তের ফস্কিয়া গেল!) এহেন প্রতিষ্ঠানের শতবার্ষিকী কেবল প্রতিষ্ঠানগত ব্যাপার নয়, শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রের পক্ষেই স্মরণীয় ঘটনা। প্রেসিডেন্সি কলেজের শ্রীবৃদ্ধি হোক।

আগেই বলিয়াছি যে, প্রেসিডেন্সি কলেজের পূর্বরূপ হিন্দু কলেজে ইংরাজি শিক্ষা বিস্তারের সূত্রপাত। তারপরে দেড়শ বছর গিয়াছে, ইংরাজের ভারত সাম্রাজ্য গিয়াছে, ইংরাজির প্রতি সাধারণের মনে যে সহজাত শ্রদ্ধা ছিল তাহারও অনেকটা গিয়াছে, আর গিয়াছে ইংরাজি শিক্ষার্থীর মনে ইংরাজি ব্যাকরণ ও অভিধানের সহিত সহযোগিতার ভাব। ইংরাজের শাসন ও ইংরাজির অনুশাসন দুই-ই এক সঙ্গে গিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে ইংরাজি শিক্ষায় আমাদের কি লাভ হইয়াছে, তাহার হিসাব নিকাশ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে মনে হয় না।

প্রেসিডেন্সি কলেজের অন্যতম মুখ্য ছাত্র এ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন স্থান কাল পাত্রের যোগাযোগে তাহা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আনন্দমঠের শেষ অধ্যায়ে মহাপুরুষ ইংরাজি শিক্ষার (ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান ইংরাজ শাসন ও ইংরাজি শিক্ষার সূত্রেই এ দেশে আসিয়াছে) উপকারিতা কীর্তন করিয়াছেন। মহাপুরুষ বলিতেছেন—"প্রকৃত হিন্দুধর্ম জ্ঞানাত্মক, কর্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার, বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। অন্তর্বিষয়ক যে জ্ঞান, সেই সনাতন ধর্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি, তাহা না জানিলে সূক্ষ্ম কি, তাহা জানা যায় না। এখন এদেশে অনেক দিন হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কাজেই প্রকৃত সনাতন ধর্মও লোপ পাইয়াছে। সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে আগে বহির্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক। এখন এদেশে বহির্বিষয়ক জ্ঞান নাই, শিখায় এমন লোক নাই, আমরা লোকশিক্ষায় পটু নহি। অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরাজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু।...ইংরাজি শিক্ষায় এ দেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখন সনাতন

ধর্ম প্রচারে আর বিঘ্ন থাকিবে না। তখন প্রকৃত ধর্ম আপনা আপনি পুনরুদ্দীপ্ত হইবে।"

সেকালে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্রের মুখে এ সব কথা মনিবতোষণের মতো শোনাইয়াছিল। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে সত্যদর্শন করিয়াছিলেন, আজো তাহা পুরাতন হইয়া যায় নাই। বহির্বিষয়ক জ্ঞান লাভ এখনো সম্পূর্ণ হয় নাই বলিয়া আজিও আমাদের মার্কিণ, রুশ প্রভৃতি দেশ হইতে Expert বা বিশেষজ্ঞ আনিতে হইতেছে। কিন্তু বহির্বিষয়ক জ্ঞানের ভারতব্যাপী যে ভূমিকা আমরা দেখিতেছি, তাহা মুখ্যতঃ ইংরাজি শিক্ষারই ফল, বঙ্কিমচন্দ্র আজ উপস্থিত থাকিলে এইরূপ মত প্রকাশ করিতেন আর দেখিতে পাইতেন যে, আনন্দমঠ প্রকাশের পরে দেশের গতি তাঁহার চিহ্নিত পথেই চলিয়াছে। এই চিহ্নিত পথের এক প্রান্তে হিন্দু কলেজের উদ্বোধন—আর অন্য প্রান্তে এখন প্রেসিডেন্সি কলেজের শতবার্ষিকী। ইংরাজি শিক্ষার অনেক গৌণ ফল আছে, কিছু কুফলও আছে, কিন্তু ইহাই শ্রেষ্ঠ ফল—আর তাহার বর্ণনা প্রেসিডেন্সি কলেজেরই এক ছাত্রের মুখে ফলোদয়ের পূর্বেই উচ্চারিত হইয়াছিল। স্থান কাল পাত্রের প্রাসঙ্গিক যোগাযোগ স্মরণ করিয়া বিষয়টি বিবৃত করিলাম।

৬০

বিশেষজ্ঞ বনাম অবিশেষজ্ঞ

ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের বিংশতিতম অধিবেশনে আধুনিক ইতিহাস শাখার সভাপতি ডক্টর শিবপদ সেন সাধারণের অবশ্যজ্ঞাতব্য একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি ঐতিহাসিকগণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, ইতিহাস রচনাকালে মনে রাখিতে হইবে যে, পাঠক সমাজ বিশেষজ্ঞ নহেন। তাঁহার মতে এই স্থূল সত্য কথাটি ভুলিয়া গেলে, আর অনেক সময়েই ভুল হইয়া থাকে, ইতিহাস নীরস ও দুষ্পাচ্য হইয়া পড়ে। তখন সাধারণে আর ইতিহাসের গ্রন্থ গলাধঃকরণ করিতে চাহে না—অথচ ইতিহাসের মতো সরস

বস্তু অল্পই আছে। ডাঃ সেন ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকগণের পক্ষেও দুই-চার কথা বলিয়াছেন, ঐতিহাসিক সমাজের একান্তে তাঁহাদের জন্যও একটুখানি স্থান হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাস্তবিক ইতিহাসের সত্যকে সরসভাবে প্রচার করিবার ভার তো তাঁহাদেরই। স্কটের উপন্যাসসমূহ লিখিত না হইলে ইউরোপের ইতিহাসের মর্ম এত প্রচারিত হইত কি? অষ্টাদশ শতকের বাঙালীর জীবন সম্বন্ধে জানিতে বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর যেমন সাহায্য করিয়াছে তেমন আর কোন পুস্তক করিয়াছে কি? তবু এ কথা নিশ্চয় যে, ঔপন্যাসিক ঐতিহাসিক নন এবং তাঁহার জন্য সে পদবী আমরা প্রার্থনাও করি না। ডাঃ সেনের অপর প্রসঙ্গটি লইয়া কিছু আলোচনা করিতে চাই।

দুই শ্রেণীর ঐতিহাসিক আছেন, বিশেষজ্ঞ শ্রেণীর ও সাহিত্যিক শ্রেণীর। এক দলের কাছে ইতিহাস বিজ্ঞান, তাঁহারা বক্তব্য সন-তারিখ, দলিল-দস্তাবেজ, কোটেশন ও ফুটনোটে প্রকাশ করিতে ভালবাসেন। অপর দল ইতিহাসকে সাধারণের বোধ্য ভাষায় রঙে রসে অলঙ্কার ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করিয়া প্রকাশ করেন। এক দলের কাছে ইতিহাস জীবনের কঙ্কাল, অপর দলের কাছে জীবন। পূর্বোক্ত দল স্কলার বা বিশেষজ্ঞ। তাঁহারা অপর দলকে সন্দেহের চোখে দেখেন এবং তাঁহাদের কলমকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না। এ রকম ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকগণের প্রতি তাঁহাদের মনোভাব সহজেই অনুমেয়—যদিচ তত সহজে প্রকাশ্য নয়। বিশেষজ্ঞগণ ফুটনোটের কাঁটার বেড়া দিয়া সুরক্ষিতভাবে বাস করিতে ভালবাসেন, অনধিকার প্রবেশকে তাঁহাদের বড় ভয়। তাঁহাদের কৃতিত্ব, পাণ্ডিত্য, অধ্যবসায় ও গবেষণা অবশ্যস্বীকার্য। কিন্তু অন্যপক্ষে ইহাও ভুলিলে চলিবে না যে, তাঁহাদের সংরক্ষিত গবেষণা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে অক্ষম। সাহিত্যিক ঐতিহাসিকগণই ইতিহাসের সত্যকে জনসমাজে প্রচার করিবার ভার লইয়াছেন। হেরোডোটাস, থুকিডাইডিস, গিবন, ভলতেয়ার, কার্লাইল, মেকলে, ট্রেভেলিয়ান, চার্চিল প্রভৃতি কেহই বিশেষজ্ঞ নহেন, কিন্তু ইহারা ইতিহাসকে সঞ্জীবিত করিয়া না তুলিলে জ্ঞান কি পঙ্গু হইয়া থাকিত না? আসল কথা সংসারে বিশেষজ্ঞ ও সাহিত্যিক দুয়েরই প্রয়োজন আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহাদের সম্বন্ধ তেমন সুস্থ নয়—একে অপরকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে; আসলে একে অপরের পরিপূরক।

দর্শন বিজ্ঞান অর্থনীতি সমস্তই ক্রমে ক্রমে বিশেষজ্ঞের অধিকারভুক্ত হইয়া উঠিতেছে। এমন কি কোন কোন শ্রেণীর কবির হাতে কবিতা Quantum Theory-র মতো দুর্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে, বিশেষজ্ঞের জ্ঞান ছাড়া সাধারণ রসবোধে তাহা বুঝিবার নয়। এহেন সময়ে ডাঃ সেনের মতো সুপণ্ডিত ব্যক্তি সভাপতির উচ্চাসন হইতে অবিশেষজ্ঞের পক্ষে দু'কথা বলিয়াছেন, তাহাতে তিনি সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন, বিশেষ করিয়া কমলাকান্তের, কারণ সে-ও ঐতিহাসিক, তবে কি না মানুষের ভাবোন্মাদের ঐতিহাসিক। সংসারে বিশেষজ্ঞ যত খুশী থাকুক, তবে কি না মেকলে, গিবন প্রভৃতির ধারা যেন লোপ না পায়।

৬১

বেপরোয়া এঞ্জিন

কি লিখিব ভাবিতেছিলাম এমন সময়ে দেখি আস্ত একখানা রেলের এঞ্জিন আসরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। ব্যাপার কি? ভালো করিয়া চাহিয়া দেখি এঞ্জিনখানা চালকহীন। তাই বটে, নহিলে এমন বেয়াড়া পথে চলিবে কেন? ঐ এঞ্জিনখানার সঙ্গে এক গাড়ী ভাব মনের মধ্যে আমদানী হইল, ভাবিলাম আজকার মতো এগুলাই পাঠককে উপহার দিই। কিন্তু তার আগে চালকহীন এঞ্জিনের খবরটা বলি। ব্যাপারটা রূপক নয়। সাহিবগঞ্জের খবরে প্রকাশ যে, মির্জা চৌকি রেল ষ্টেশনে একখানা এঞ্জিন হইতে চালকগণ নামিয়া গেলে এঞ্জিনখানা আপনি চলিতে আরম্ভ করে। সময়টা রাত্রি, পলাতক এঞ্জিন, রোমাঞ্চকর কাহিনীর প্রায় সমস্ত উপাদান প্রস্তুত। যাই হোক অধিকতর রোমাঞ্চকর কিছু ঘটিবার আগেই মাইল সাতেক রাস্তা চলিয়া এঞ্জিন থামিয়া যায়, তখন পলাতককে আবার স্বস্থানে ফিরাইয়া আনা হয়। ঘটনাটি এই। এবারে রূপক।

সংবাদটি পড়িয়া মনে হইল আজকার সমস্ত পৃথিবীটা ঐ চালকহীন এঞ্জিনের মতো ভীমবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, সঙ্ঘর্ষ বাধাইবে কি খাদে পড়িবে

কেহ জানে না। আর শুধু তাই নয়—এঞ্জিনের সঙ্গে যুক্ত আছে অসংখ্য গাড়ীতে আড়াইশো কোটি প্যাসেঞ্জার। আর নাই চালক, নাই গার্ড, নাই লাইনের সঙ্গমে পয়েণ্টস্‌ম্যান, সিগন্যাল হয়তো আছে, কিন্তু উদ্ধত কি অবনত কুয়াশায় অস্পষ্ট; তাছাড়া সে সঙ্কেতটাও যে এ গাড়ীর পক্ষে প্রযোজ্য এমন নিশ্চয়তা নাই; হয়তো সে সঙ্কেত উনবিংশ শতকের জাতীয়তাবাদরূপ প্যাসেঞ্জারের জন্য; মধ্য বিংশ শতকের অরাজকতার মেলগাড়ী সেই সঙ্কেতের মুখে ধাবিত; রেল লাইন অবিকৃত আছে তো! ইতোমধ্যে অনেক বন্যা ভূকম্প ঘটিয়া গিয়াছে; মোটের উপর "মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে দিক্ দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা।" ইহাই মহাপ্রলয়ের পটভূমি। চালকহীন গাড়ী, অন্ধকার রাত্রি, হয়তো বা আমাবস্যাই হইবে, আড়াইশো কোটি শিশু বৃদ্ধ নরনারী ত্রাহি ত্রাহি ডাকিতেছে, অনেকক্ষণ খাদ্য পানীয় নিঃশেষ, আর সর্বোপরি মুহুর্মুহু সঙ্কটের আশঙ্কা। সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য, তবে দু'দণ্ড আগে আর পরে।

বিজ্ঞ পাঠক নিশ্চয় বুঝিতে পারিতেছেন যে, অদ্যকার মানবসভ্যতার প্রসঙ্গ তুলিয়াছি। সভ্যতার এমন চালকহীন মুহূর্ত আগে আর আসিয়াছে কি না সন্দেহ। আর এই সঙ্কটের সুযোগ লইয়া যত সব হাতুড়ের দল, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়া বিনাশের গতিকে ত্বরান্বিত করিতেছে। ধীরভাবে সমস্তটা চিন্তা করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইবার কথা। চমৎকার! আজকাল কোন প্রশ্ন উঠিলেই অমনি সঙ্গে সঙ্গে "দুই শিবিরে"র কথা উঠিয়া পড়ে। কুরু পাণ্ডব দুই শিবির এবং বিদুরের আধখানা শিবির সর্বত্র আজ সমান অশান্তি। এ বিষয়ে কম্যুনিষ্ট ও অ-কম্যুনিষ্ট রাজ্যে বড় ভেদ নাই। সর্বত্র অশান্তি, অসন্তোষ, বিশৃঙ্খলা ও মানসিক অরাজকতা। কী ভয়াবহ অবস্থা।

হাতের কাছে বাংলাদেশের কথাই ধরা যাক। আজ দেশে সর্বজনমান্য কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নাই, যিনি কথা বলিলে সমস্ত দেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনিবে। কোন একজন নেতা না থাকিলে যাহা হওয়া উচিত তাহাই হইয়াছে, হাজার নেতায় দেশ ছাইয়া গিয়াছে, আর হাজার নেতা থাকিলে যাহা হওয়া উচিত তাহাই ঘটিতেছে—অরাজকতার এঞ্জিন ছুটিয়াছে। এমন হইবার কারণ এ যুগ রাজনীতিকেই জীবনের ধ্রুবতারা করিয়াছে, উল্কাকে ধ্রুবতারার

দায়িত্ব দিলে, সেই সঙ্কেতে তরণী চালনা করিলে অতলের পথ প্রশস্ত হয়। এখন ঐ একটিমাত্র পথই মানব-সভ্যতরে পক্ষে সুগম। সেই পথ ধরিয়া চালকহীন এঞ্জিন অন্ধবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। অনেকে আর্তরব তুলিয়াছে, আর অনেকের অবস্থা "দেবী চৌধুরাণী"র হরবল্লভের মতো—ডুবিয়াই গিয়াছি আর দুর্গানাম করিয়া কি ফল!

৬২

কোথায় আলো?

কমলাকান্তের বিড়ম্বনা নানাবিধ। সকালবেলা ৫।৬ খানা খবরের কাগজ পড়িয়া শেষ করিলে ঘণ্টা দুয়েকের জন্য মাথার মগজ উল্টা অবস্থায় পড়িয়া হাঁপাইতে থাকে। বিশ্বের যাবতীয় সমস্যা, দেশী ও বিলাতী দুই ভ্যারাইটি-ই আছে, সংবাদপত্রের হেড-লাইনের রূপ ধরিয়া মুখের দিকে কটমট করিয়া তাকাইয়া থাকে। সে কি মারাত্মক দৃষ্টি! অন্তরাত্মা বাতাহত বাঁশপাতার মতো কাঁপিয়া কাঁপিয়া সারা হয়। এদিকে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে পাকিস্তান সমর্থকদের রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ। ওদিকে পাকিস্থানী জেট বিমানের অবৈধভাবে ভারত-সীমান্তে প্রবেশ। একদিকে ওমানে বৃটেনের হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে ভারতের প্রতিকূল মনোভাব, অন্যদিকে রাষ্ট্রসঙ্ঘে হাঙ্গারীর বিদ্রোহ আলোচনা সম্বন্ধে তথাকার প্রধানমন্ত্রীর প্রতিবাদ। আবার দেখুন রাশিয়া সাইবেরিয়াতে এবং মার্কিণ নেভাদাতে দুটি আণবিক বোমা ফাটাইয়া আণবিক প্রতিযোগিতা বন্ধ সমর্থন করিয়াছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্তে নাগা অশান্তি, আসামে তৈল বিক্ষোভ, পাঞ্জাবে ভাষা বিক্ষোভ, রাজস্থানে ছাত্র বিক্ষোভ, করাচীতে পাকবিক্ষোভ, এমন কত বলিব! আবার তথ্যপুঞ্জের এই বিরাট গন্ধমাদনের মধ্যে এক আধটি বিশল্যকরণী লতাও দৃষ্ট হয়। উক্ত লতার দর্শনমাত্র মনের অনেক শল্যক্ষত স্নিগ্ধপ্রলেপে নিরাময় হইয়া যায়। কম্যুনিষ্ট কেরলের খাদ্যমন্ত্রী পথে বাহির হইবামাত্র ম্যাকারনি, ম্যাকারনি নামে অভিহিত হন। তিনি চাউলের অভাব পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে কিছু

কিছু ম্যাকারনি খাইবার উপদেশ দিয়াছিলেন। পশ্চিম বঙ্গের "হাফপ্যাণ্ট মন্ত্রী"র পাল্টা "ম্যাকারনি মন্ত্রী"। সমস্যার আর অন্ত নাই।

কিন্তু এ যুগের সবচেয়ে প্রকাণ্ড সমস্যা—সংবাদপত্র কর্তৃক পরিবেশিত তথ্যস্তূপের ভার। প্রতিদিন প্রাতে শত শত সংবাদপত্র হাজার হাজার টন তথ্যস্তূপ আনিয়া পাঠকের মনের দরজায় ঢালিয়া দিতেছে—অবশেষে অবস্থা এমন হইয়াছে যে, বেচারা পাঠকের ঘর হইতে বাহির হইবার পথটি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মানুষ এখন আপনার গৃহে বন্দী, Home Interned মানুষের স্বাধীনতা নিতান্তই কাল্পনিক। তথ্যপুঞ্জের অবরোধ ভাঙিয়া দূরে দাঁড়াইয়া প্রকৃত অবস্থা দেখিবার শক্তি আর মানুষের নাই। তার উপরে তথ্যপুঞ্জ শুধু গুরুতর নয়, পরস্পরবিরোধী। একদিকে আণবিক প্রতিযোগিতা বন্ধ করিবার দাবী অন্যদিকে সেই সময়ে আণবিক বোমা বিস্ফোরণ; ভারতীয় কম্যুনিষ্ট দলের কেন্দ্রীয়-সরকার বিরোধিতা আবার কেরলে সরকার-বিরোধিতার নিন্দা, সরল জীবনযাত্রার প্রতি কংগ্রেসের আগ্রহ এবং সেই সঙ্গে বহু ব্যয়সাধ্য হোটেল নির্মাণ; এমন কত উল্টোপাল্টা খবর একটা অপরটার ফল লোপ করিয়া সকলে মিলিয়া একটি বৃহৎ শূন্যতার সৃষ্টি করিতেছে। পাঠকের মনের অবস্থাটা একবার কল্পনা করুন। কিন্তু মনে রাখিবেন যে এখানেই তথ্যপুঞ্জ সরবরাহের বিবরণ সীমাবদ্ধ নয়—বেতার আছে, সভা-সমিতি আছে, ইস্কুল-কলেজ আছে আর আছে জনশ্রুতি। তথ্যভারে মানুষ আজ উদ্‌ভ্রান্ত। এই মানুষের কাছে সত্যনির্ণয়ের আশা দুরাশা, প্রকৃত পথ দর্শনের আশা বাতুলতা, আত্মদর্শনের আশা অবান্তর। আর মানুষের এই উদ্‌ভ্রান্তির সুযোগ লইয়া একদল লোক তাহার মাথায় কাঁঠাল ভাঙিয়া মনের আনন্দে ভোজন করিতেছে। অনেকে বলিবেন সমস্তই না হয় বুঝিলাম বাপু, কিন্তু এই অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় কি? উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না, তবে কমলাকান্তের আসর নিয়মিত পাঠ করিলে একটা কিনারা হওয়া অসম্ভব নয়। 'আসর' পথ না হইতে পারে, খুব সম্ভব দেয়ালের ফাটল মাত্র, অন্ধকারে আলোর রেখা বাহিয়া আনে। আপাততঃ ঐটুকু অবলম্বন করিয়া অপেক্ষা করা ছাড়া তো গত্যন্তর দেখি না।

৬৩

২০৫৭ সালে

আজ হইতে একশ বছর পরে পৃথিবীর অবস্থা কেমন হইবে, তার এক মনোরম আভাস সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইতিমধ্যে অনেকেই আহ্লাদিত হইয়া উঠিয়াছেন। এখন তাঁহাদের কোষ্ঠীতে যদি দীর্ঘায়ুযোগ লিখিত থাকে, তবে স্বতন্ত্র কথা নতুবা তাঁহাদের আহ্লাদের কারণ বোঝা কঠিন। একশ বছর পরে বাঁচিবার আশা তাঁহারা রাখেন কি? যাক্‌গে, এখন সেই মনোরম চিত্রের কিছু কিছু আভাস দিতেছি।

তখন ছুটিছাটাতে মানুষ চন্দ্রলোকে গমন করিয়া আরামদায়ক হোটেলে বাস করিতে পারিবে। আর হাত পা ভাঙিলে চিন্তার কারণ থাকিবে না। "ব্যাঙ্কে" গিয়া ভাঙা হাতখানা জমা করিয়া দিলে নূতন একখানা হাত পাওয়া যাইবে। সপ্তাহে চার হইতে আট ঘণ্টা খাটিলেই যথেষ্ট, অতিরিক্ত পরিশ্রমের প্রয়োজন হইবে না। তখনকার মানুষের জোরে কথা বলিবার আবশ্যক হইবে না, মনে মনে কথা বলিলেই অপরে বুঝিয়া লইবে। মানুষ নিজ দেহের আয়তন ও দৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে। আর খাদ্যের জন্য চিন্তা নাই, সূর্যের আলো ও জল হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিবে। আরও দেখুন, তখনকার দিনে মনোভাব নিয়ন্ত্রণ করিবে ঔষধ। খুব সম্ভব এক এক প্রকার ঔষধ সেবনের ফলে এক এক প্রকার মনোভাবের সৃষ্টি হইবে। আর পৃথিবী ঘিরিয়া শত শত উপগ্রহ আবর্তিত হইবে, তাহারা সর্বত্র বেতারে খবর পাঠাইতে থাকিবে। সত্যই কি মনোহর ভবিষ্যৎ। কিন্তু এ সব ব্যাপারের পরিণাম কি কেহ চিন্তা করিয়া দেখিয়াছে?

জোরে কথা বলিবার যদি প্রয়োজন না হয়, একজন যদি অনায়াসে অপরের মনের কথা শুনিতে পায়, তবে মুহূর্তে কি বিপ্লব ঘটিয়া যাইবে না? পিতাপুত্রে স্বামী-স্ত্রীতে আত্মীয়-স্বজনে পরিবার-পরিজনে চেনা-অচেনায় কি চুলিচুলি ঘুষোঘুষি ঘটিবে না? সংসার যে এখনো অচল হয় নাই, তার

আসল কারণ অপরের মনোভাব অনুমান করিতে পারিলেও এখনো নিশ্চয় করিয়া "শুনিতে" পাই না। "শুনিতে" পাইলে হয়তো দেখিব যে, আসল আমার অনুমানের চেয়েও ভীষণ। তেমন অবস্থায় সংসারে একদিনেই কুরুক্ষেত্রকাণ্ড ঘটিয়া যাইবে। তাছাড়া জোরে কথা বলিতে না পারিলে ঝগড়া করিবার স্বর্গীয় আনন্দ হইতে লোকে বঞ্চিত হইবে। বাঁচিবার প্রধান কারণটাই যে দূরীভূত হইয়া যাইবে।

আবার দেখুন মনোভাব উৎপাদন যদি ঔষধের উপর নির্ভর করে, তবে কি দুঃসহ অবস্থা। ঠিক এই মুহূর্তে রাগিতে চাই, কিন্তু হাতের কাছে ঔষধের অভাব। গুম হইয়া বসিয়া রহিলাম। যখন ঔষধ আসিয়া পৌঁছিল, রাগের কারণ অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। কি বিষম অবস্থা।

সূর্যকিরণ হইতে নাকি খাদ্য প্রস্তুত হইবে। কিন্তু সে সূর্যকিরণ যে দোকানে গিয়া বা চোরাবাজারে গিয়া চড়া দামে কিনিতে হইবে (বর্ষাকালে বিশেষ দুর্মূল্য হইয়া উঠিবে), তাহা তো কেহ খুলিয়া বলিতেছে না। কাজেই আনন্দের হেতু তো দেখিতেছি না। আনন্দের কারণ কেবল পাঁঠার। সংবাদে প্রকাশ, তখন সকলেই নাকি নিরামিষ-ভোজী হইবে। সহস্র পাঁঠার নিঃশঙ্ক বিচরণে সেদিন ধরাতল ভরিয়া যাইবে। এখন একমাত্র ভরসা ২০৫৭ সালে থাকিব না, যাঁহারা থাকিবেন বলিয়া ভরসা পান তাঁহারা সেই সত্যযুগের জন্য প্রস্তুত হোন। আমি ঈর্ষা করিব না। কিন্তু ইহাও বলিয়া দিতেছি, তখন যদি আজকার এই দুঃসময়ের জন্য কখনো অনুশোচনা বোধ হয় আমার সহানুভূতি পাইবেন না।

৬৪

ধূমপান ও মন্ত্রিত্ব

"নয়াদিল্লী, ২০শে এপ্রিল—আজ লোকসভায় শ্রীপুরোষত্তম দাস ট্যাণ্ডন মন্ত্রিগণ কর্তৃক ক্রমাগত ধূমপানের তীব্র বিরোধিতা করিলে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। মন্ত্রীদের আসন হইতে কয়েকজন মন্ত্রী ইহার কড়া জবাব দেন এবং ডাঃ পাঞ্জাবরাও দেশমুখকে এইরূপ মন্তব্য করিতে শোনা যায় যে, প্রায় প্রত্যেক মন্ত্রী ধূমপান করেন।

শ্রম-বিভাগের উপমন্ত্রী জনাব আবিদ আলী বলেন যে, তিনি ধূমপান করেন না।

শ্রী ট্যাণ্ডন মন্ত্রীদের ধূমপানের অভ্যাস পরিত্যাগের জন্য দৃঢ়ভাবে আবেদন জানান। তিনি বলেন, দেশের নেতৃস্থানীয় এই সব মন্ত্রীর এই অভ্যাসে উৎসাহ দান করা উচিত নহে।"

শ্রীযুত পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন সাত্ত্বিকভাবাপন্ন ব্যক্তি। তিনি নিজে ধূমপান করেন না, তাই তিনি জানেন না যে, তিনি কি হারাইয়াছেন। এমন অবস্থায় অপরকে ধূমপান বর্জনের উপদেশ দিবার অধিকার তাঁহার আছে কি না সন্দেহ। আর যাই হোক, এ বিষয়ে তিনি অনধিকারী। পাট না চিনিলে পাটের দালালি করা যায় না। অপরপক্ষে এ বিষয়ে (এবং অন্য অনেক বিষয়ে) পরামর্শ দানের স্বাভাবিক অধিকার কমলাকান্তের। ট্যাণ্ডনজী ও তাঁহার মতো বেরসিকগণ যাহাই বলুন না কেন, সংসারে ধূমপান কখনো বন্ধ হইবে না। হাইড্রোজেন বোমার ভয়ে কোনকালে যুদ্ধ বন্ধ হইতেও পারে, কিন্তু পিতা, শিক্ষক, ক্যানসার, মূল্য-বৃদ্ধির ভয়েও ধূমপান কখনো রাহত হইবে না।

তবে এ ক্ষেত্রে ট্যাণ্ডনজী বিশেষভাবে মন্ত্রিগণকেই পরামর্শ দিয়াছেন। ব্যক্তিবিশেষ কখনো ধূমপান ছাড়িলেও ছাড়িতে পারে, কিন্তু মন্ত্রী বা রাজনীতিকগণের পক্ষে ইহা চিতাবাঘের বর্ণ পরিবর্তনের মতোই অসম্ভব।

কেন তাহা খুলিয়া বলি। প্রথম, রাজনীতির উদ্দেশ্য মনোভাব গোপন। এখন একটা সিগারেট বা চুরুট মুখের মধ্যে গোঁজা থাকিলে, ছিপি যেভাবে বোতলের মুখ আটকাইয়া রাখে, সেইভাবে বক্তাকে সাহায্য করে। রাজনীতিকগণের পক্ষে সিগারেট বা চুরুট এক প্রকার ছিপি। তার পরে দেখুন, কথা বলা যখন অনিবার্য হইয়া পড়ে তখন বাক্যের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ধোঁয়া মিশাইয়া দিয়া সমস্ত ব্যাপারটাকে ধোঁয়াটে করিয়া তোলা সম্ভব হয়। রাজনীতিকের পক্ষে সবচেয়ে ভালো নীরবতা, কিন্তু তারপরেই হইতেছে ধোঁয়াটে কথা। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, সিগারেট বা চুরুট বাক্যে ভেজাল দিবার উপকরণ। আরও দেখুন, সিগারেট বা চুরুটে টান দিবার উপলক্ষে ভাবিয়া লইবার অবকাশ পাওয়া যায়। রাজনীতিক মাত্রেই জানেন যে, এ কত বড় সুযোগ। যে ভাবেই বিচার করা যাক না কেন মন্ত্রিগণের ধূমপান বর্জনের তো কোন কারণ দেখা যায় না, বরঞ্চ না বর্জনের পক্ষেই যাবতীয় যুক্তি।

আরও এক কথা, লোকসভা ও অন্যান্য আইনসভায় ধূমপান করিবার নিয়ম আছে কি না জানি না; না থাকিলে অবিলম্বে এই হিতকর ব্যবস্থার প্রচলন আবশ্যক। মন্ত্রী ও সদস্যগণের মুখে সিগারেট বা চুরুটের ছিপি আঁটা থাকিলে তাঁহারা কথা কম বলিবেন। আর সকলেই জানেন যে, কথার মাত্রা কমিলে কাজের মাত্রা বাড়িবার সম্ভাবনা। তাছাড়া আইন সভাসমূহে Freedom of Speech থাকার ফলে মাঝে মাঝে যে জাতীয় কথাবার্তা হইয়া থাকে ধূমপানের কৃপায় তাহাও কমিবে। এ ক্ষেত্রে ধূমপান সুনীতি রক্ষায় সহায়। অতএব ধূমপান বর্জনের তো কোন কারণ দেখা যায় না।

অনেককাল আগে একটা গান শুনিয়াছিলাম—

"হরি দিন তো যায় না
কি করি?
গাঁজা গুলি চরস ভাঙ
খেতে যে হয় সুতরাং…"

কোন কোন রাজ্যে মন্ত্রিসংখ্যা এত বেশি যে, তাঁহাদের সময় না কাটিবার সমস্যা হওয়া অসম্ভব নয়। অবশ্য গানটিতে উল্লিখিত নেশা ধরিতে কেহ তাঁহাদের অনুরোধ করিবে না, কিন্তু সিগারেট বা চুরুট ধরিলে নিতান্ত বেমানান হইবে না, সময়ও কাটিবে ভালো।

অতএব ট্যাণ্ডনজীকে অনুরোধ তিনি যেন এরূপ পরামর্শ আর না দেন। আর মন্ত্রিগণের প্রতি অনুরোধ তাঁহারা কখনো ধূমপান বর্জন যেন না করেন। কারণ ধূমপান ছাড়িলে হয় তো মন্ত্রিত্বও যাইতে পারে। যুগপৎ সিগারেট ও মন্ত্রিত্ব আঁকড়াইয়া থাকিয়া তাঁহারা দেশের কল্যাণ চিন্তা করিতে থাকুন ইহাই কমলাকান্তের প্রার্থনা।

৬৫

পলিটিক্স

কলিকাতা হইতে দূরে আসিয়া বেশ হাল্কা বোধ করিতেছি, ভাবিলাম অন্ততঃ আর কোন উপকার না হোক, কিছুদিনের জন্য রাজনীতির ভূতটা ঘাড় হইতে নামিল। কিন্তু বেশিদিন মনের এই প্রফুল্ল ভাব টিকিল না। একদিন সন্ধ্যায় বেড়াইয়া ফিরিতেছি, এমন সময়ে পশ্চাতে কাহার পদধ্বনি কাণে প্রবেশ করিল। পিছনে তাকাইয়া দেখিলাম, কেহ কোথাও নাই। মনের ভ্রম ভাবিয়া আবার চলিতে সুরু করিলাম। কিছুক্ষণ পরেই আবার পদধ্বনি! পিছন ফিরিয়া শুধাইলাম কে? কোন উত্তর নাই। বন্ধুর প্রান্তর, মনে হইল কোন পথচারী আড়ালে পড়িয়াছে। কিন্তু এ কি, চলিতে সুরু করিলেই পদধ্বনি বাজিতে থাকে। কৌতূহলের অন্ত থাকিল না। চোর, ডাকাত না ভূতপ্রেত? কথাগুলি বোধ হয় কিছু উচ্চস্বরে বলিয়া থাকিব—অর্ধ পরিচিত কণ্ঠে একজন বলিল, একেবারে অপরিচিত নই, পাশে চাহিয়া দেখো দেখি।

এ কি, তুমি?

হাঁ, আমি।

ভাবিয়াছিলাম, তোমার হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছি।

কাপড়-কাচা সাবানের মতো ফ্যাকাশে হাসি হাসিয়া সে বলিল, আমার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া সহজ নয়—বিশেষ তোমার মতো অর্ধ-সাপ্তাহিক কলমবাজের পক্ষে। আমি আকাশের মতো, বাতাসের মতো, ঈশ্বরের মতো—আর যদি ভগবান মানো, তবে ভগবানের মতো সর্বব্যাপী।

হার মানিয়া নীরব হইলাম।

পাঠক, স্পষ্ট করিয়া কি বলিয়া দিতে হইবে যে, এই সর্বব্যাপী সহচর আর কেহই নয়—রাজনীতি, বাংলায় যাহাকে বলা হয় পলিটিক্স।

আমার নীরবতায় উৎসাহিত হইয়া পলিটিক্স বলিতে লাগিল, দুঃখিত হইও না, কিন্তু বলো দেখি আমি কোথায় নাই ?

কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিলাম, কেন, আকাশে ?

পলিটিক্স বলিল, আকাশে ? এবার যে আমি আকাশেও পদার্পণ করিয়াছি, রুশীয় উপগ্রহের কথা কি শোন নাই ? দু'এক বছর মধ্যে চন্দ্রে ও অন্যান্য গ্রহে পৌছিব। ইতোমধ্যেই অন্তরীক্ষ ভাগাভাগির প্রশ্ন উঠিয়াছে শোন নাই কি ? এখন আর চন্দ্র লইয়া কবিত্ব চলিবে না, পাওয়ার পলিটিক্স করিতে হইবে।

তখন আমি বলিলাম, সমুদ্র তোমার শাসনাধীন নয় নিশ্চয়।

বটে। টেরিটোরিয়াল ওয়াটার্স কথাটা কি শোন নাই ? এতদিন উহা তিন মাইল ছিল, এখন তিনশ মাইল হইতে চলিয়াছে। আমি বামনের মতো তিন পদক্ষেপে জল-স্থল-অন্তরীক্ষ দখল করিয়াছি। আমার কবল হইতে কোথাও রক্ষা নাই।

অন্ততঃ দেবমন্দির তোমার দখল নয়।

তাই কি ! হরিজনের মন্দির প্রবেশ লইয়া মাথা ফাটাফাটি ও আইন আদালতের কথা কি শোন নাই ?

আমার নীরবতা প্রমাণ করিল যে, শুনিয়াছি।

তখন পলিটিক্স বলিতে লাগিল—ঐ যে অদূরে কারখানা সধূম অগ্নি-উদ্গীরণ করিতেছে, ওখানেও আমি। খোঁজ করিলে হয়তো জানিতে পাইবে, ওখানকার কর্মীরা ধর্মঘটের নোটিশ দিয়া বসিয়া আছে। আর ঐ যে এক মূহূর্ত আগে রেলগাড়ী পবনলাঞ্ছিতবেগে ছুটিয়া গেল—কাগজে হয়তো দেখিয়া থাকিবে যে ১৪ই নভেম্বর হইতে রেলে ধর্মঘটের নোটিশ পড়িয়াছে। আবার রেললাইনের পাশে টেলিগ্রাফের লাইন। ডাক ও তার বিভাগের ধর্মঘটের সম্ভাবনা এখন আদালতের অধীন। এখন বলো দেখি ভাই আমি কোথায় নাই ? আর একবার ধর্মঘট বাধিয়া উঠিলে ভাগাড়ে মরা গোরু পড়িলে যেমন শকুনের পাল আসিয়া পড়ে, তেমনি আমার চেলা-চামুণ্ডাগণ

আসিয়া পড়ে। তাহারা সাপ হইয়া কামড়ায়, রোজা হইয়া ঝাড়ে, তিলকে তাল করে, তালকে বেতাল করে, বেতালকে হিন্তাল করে, আমার মতো তাহারাও সর্বব্যাপী।

আমি বলিলাম, পেশাদার রাজনীতিকগণ এ যুগের শিরঃপীড়া।

শির থাকিলে পীড়া হইবে না, এমন সম্ভব নয়।

কিন্তু এ যে কেবলই পীড়া।

পীড়া না থাকিলে বদ্দি বেকার। সমস্যা না থাকিলে পেশাদার রাজনীতিকগণের কি দশা হইবে? তাই সর্বদা সমস্যাকে জীয়াইয়া রাখিয়া তাহারা নিজেরা জীবিত থাকে।

এখন উপায়?

কোন উপায় নাই। অক্টোপাশের মতো মানুষকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছি, সবলে তাহার মনুষ্যত্বটুকু শুষিয়া না খাইয়া ছাড়িব না!

তারপরে আর কি থাকিবে?

যদি কিছু না থাকে, আমার কি? বর্তমান পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য কি আমি দায়ী? আগে গোরু ভাগাড়ে পড়ে, তারপরে শকুন আসে। শকুন কারণ নয়, কার্য।

সবই বুঝিলাম, কিন্তু কমলাকান্তের ঘাড়ে কেন?

কমলাকান্ত ঘাড় পাতিয়াছে বলিয়া। এ যুগে বিশুদ্ধ সাহিত্যিক সম্ভব নয়—নিতান্ত প্রেমের কবিতাতেও রাজনীতি আসিতে বাধ্য। অতএব তোমার মতো হাফ-সাহিত্যিক আমার কবল হইতে রক্ষা পাইবে এমন ভাবিলে কি প্রকারে?

আর ভাবিব না বলিয়া কোনরূপে পলিটিক্সের কাছ হইতে বিদায় লইলাম।

৬৬

বিশ্বভ্রমণ ও বিশ্বমৈত্রী

প্রত্যেক যুগ নূতন নূতন কুসংস্কারের সৃষ্টি করে। বর্তমান যুগের একটি প্রধান কুসংস্কার এই ধারণাতে যে ছড়ি ছাতা হ্যাণ্ডব্যাগ হাতে মাসখানেকের মধ্যে পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া আসিলে মানুষকে জানা হয়—আর এইভাবে বিভিন্ন দেশের মানুষ সম্বন্ধে চাক্ষুষ পরিচয় হইলে বিশ্বমৈত্রীর বনিয়াদ পাকা হয়। এত বড় ভুলের গন্ধমাদন কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। কোন কারণে বা অধিকাংশ সময়ে অকারণে যাহারা বিদেশযাত্রার সংকল্প করিয়াছে তাহারাই এই ধারণাটি চালু করিয়াছে। নিজেদের অপদার্থ খেয়ালকে একটি ভদ্রোচিত বেশ পরাইয়া তত্ত্বে পরিণত করিয়াছে। বেশ যতই ভদ্র হোক, তত্ত্বের যতই ভান করুক, আসলে ব্যাপারটা একটা নূতন কুসংস্কার। পতনোন্মুখ মাতাল হাঁকিয়া সংকল্প ঘোষণা করিয়াছিল, 'বাপ সকল আমি স্থির করেছি আজ এখানটাতেই পড়বো।' বস্তুতঃ সেখানে না পড়িয়া তাহার উপায় ছিল না। যাহাদের বিদেশ যাত্রার সংকল্প স্থির তাহারা এমন ভাব প্রকাশ করিতেছে—এ তো শখের ভ্রমণ নয়, বিশ্বমৈত্রীর বনিয়াদ প্রতিষ্ঠায় এ যে কঠোর কর্তব্যসাধন!

এবারে ব্যাপারটা একবার বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাক। বিশ্বমৈত্রী না নিতান্ত ব্যক্তিগত শখ মাত্র? যে ব্যক্তি ২।১ কিংবা ২।৪ মাসের মধ্যে গোটা দুনিয়া ঘুরিয়া আসিল তাহার চোখে পড়িল কোন্ বৈশিষ্ট্য? মানুষে মানুষে পার্থক্যটা নয় কি? সে দেখিল দেশভেদে ভাষাভেদ, বর্ণভেদ, আচারভেদ, সংস্কারভেদ, আইনভেদ, রাষ্ট্রীয় গঠনভেদ, সংক্ষেপে মানুষে মানুষে যত কিছু ভেদ সম্ভব তাহাই উগ্রভাবে, প্রত্যক্ষভাবে তাহার চোখে পড়িল ও মনে বিদ্ধ হইয়া রহিল। আগে সে পুস্তকে পড়িয়াছিল বা লোকমুখে শুনিয়াছিল যে, সর্বত্র মানুষ এক। এখন নিজের চোখে দেখিয়া আসিল মানুষে মানুষে ভেদ, আর যেহেতু পরোক্ষ জ্ঞানের চেয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রবল সেই ভেদবোধটাই তাহার মনে সত্য হইয়া রহিল। তখনো মুখে হয়তো সে মানুষের ঐক্য

ঘোষণা করে, কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসের ক্ষেত্রে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার একাধিপত্য শিথিল হয় না। এখন এ যুগে যানবাহনের সুলভ আনুকূল্যের ফলে যত বেশি লোক বিশ্বভ্রমণ সমাধা করিতেছে, তত বেশি করিয়া মানুষে মানুষে ভিন্ন, ভেদটাই আসল, ঐক্যটা অপ্রত্যক্ষ কাজেই কাল্পনিক, এইরূপ ধারণা ক্রমে সর্বজনীন হইয়া উঠিতেছে। ইহা এক মহাদুর্দৈব ও মহাদুশ্চিন্তার কারণ। যানবাহনের সচলতায় একদিকে পৃথিবী যতই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে, ভেদবুদ্ধিও ততই প্রকট হইতেছে। এ যেন ছোট্ট এক ঘরে অনেকগুলি প্রতিদ্বন্দ্বীকে পুরিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভিতরের অবস্থা কল্পনা করা কঠিন নয়।

বরঞ্চ যে-যুগে দেশান্তর গমন কঠিন বলিয়া লোকে সারাটা জীবন স্বদেশে, অনেক সময়ে স্বদেশেরও সঙ্কীর্ণ একটা অংশে কাটাইয়া দিত তখনই প্রকৃত বিশ্বমৈত্রী ছিল। মানুষকে জানিত না বলিয়াই তখন মানুষের ঐক্য মনে সত্য ছিল, মানুষকে চিনিত না বলিয়াই মানুষকে সত্যকার ভালবাসা তখন সম্ভব ছিল। তখন স্বগ্রামবাসী ব্যক্তি দেশ-দেশান্তর সম্বন্ধে কি কল্পনা করিত? কল্পনা করিত যে, পূবে পশ্চিমে, উত্তরে দক্ষিণে, গ্রীষ্মাঞ্চলে, পাহাড়ে অরণ্যে যেখানেই মানুষ আছে, মোটের উপরে তাহারা এই রকমেরই ভেদ থাকিলেও তাহা অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত, কারণ সে বস্তু নিতান্তই তৎস্থানিক বলিয়া কল্পনায় ধরা পড়িত না। সে কালের লোকে কল্পনায় দেখিত বলিয়া ঐক্যটিই উপলব্ধি করিত, একালের আমরা হাতে কলমে দেখি বলিয়া ভেদটাই উপলব্ধি করি। এখন বুঝিতে পারা যাইবে কেন সেকাল, দেশভ্রমণ যখন মানুষের কুসংস্কার হইয়া ওঠে নাই, বিশ্বমৈত্রীর অনুকূল ছিল, আর কেন একাল, যখন আজ—দিল্লী—কাল লণ্ডন, বিশ্বমৈত্রীর অনুকূল নয়।

সেকালে যোগ-প্রযোগে যে মুষ্টিমেয় লোকের ভ্রমণ সৌভাগ্য হইত, এ বেলা—বোম্বাই—ও বেলা—কায়রো করিবার যাহাদের উপায় ছিল না, কুড়ি পঁচিশ বছরের আগে যাহাদের দেশে ফিরিবার সম্ভাবনা থাকিত না, সেই মার্কো পোলো, ফা হিয়ান, হুয়েন সাং (আধুনিকতম উচ্চারণ কি জানি না) প্রভৃতির পক্ষে মানুষের ঐক্য উপলব্ধি অসম্ভব ছিল না। কারণ তাহারা এক এক দেশে দীর্ঘকাল থাকিতে বাধ্য হইত বলিয়া মানুষের বাহ্যভেদের স্তর উত্তীর্ণ হইয়া তাহার আন্তরিক ঐক্য বুঝিবার সুযোগ ও সময় পাইত। মানুষে

মানুষে ভেদও সত্য ঐক্যও সত্য; ভেদটা বাহ্য, তাই দেখিবামাত্র চোখে পড়ে, ঐক্যটা গভীরে থাকে তাই বুঝিতে কিছু সময় লাগে। সেকালের ভ্রমণকারী সময় পাইত, একালের ছাতা-ছড়ি-টুপির দল সময়ের অজীর্ণ ব্যাধিতে ভুগিতেছে, চব্বিশ ঘণ্টায় ভাণ্ডারে বাস করিয়াও কিছুই তাহার ভোগে আসিতেছে না।

যাহারা দেশ ভ্রমণ করিবে কমলাকান্ত লিখিলেও করিবে, না লিখিলেও করিবে (সুযোগ পাইলে কমলাকান্তও বিদেশ ভ্রমণে যায়)। কিন্তু তাহা বিশ্ব-মৈত্রীর প্রসঙ্গরূপে কথিত না হইলেই আমি কৃতার্থ হইব। কিন্তু তাহা হইবার উপায় কি আছে? কখনো শিক্ষার নামে, কখনো সংস্কৃতির নামে, কখনো প্রতিনিধিত্বের নামে Hard Currency ও Soft Currency-র অপব্যয় চলিতে থাকিবে, আর পাশের বাড়ীর বাবুটি বিমান হইতে নামিয়া রুমালে ঘাম মুছিতে মুছিতে বলিবেন ওদেশে মানুষ এমন ঘামে না! আবার কেহ বা বিমান বন্দরে উপস্থিত সাংবাদিকগণকে কৃপাহাস্য বিতরণ করিয়া বলিবেন —একটু বিশ্বমৈত্রী ক'রে আসা গেল। শোনাইবে ঠিক যেন—একটু মার্মালেড খেয়ে আসা গেল। এখন এহেন দায়িত্বহীন অপদার্থের দলের উপরে যেখানে বিশ্বমৈত্রী নির্ভর করিতেছে সেখানে পরিণাম সম্বন্ধে অনিশ্চয়ের কিছুই নাই।

৬৭

"আমায় দে গো মন্ত্রীগিরি"

"কুর্নুল, ১১ই জুলাই—আজ অন্ধ্র বিধানসভার একজন সদস্য মুখ্যমন্ত্রী শ্রীগোপাল রেড্ডীকে বলেন—'আমাদের প্রত্যেককে অন্ততঃ তিন মাসের জন্য মন্ত্রী করিয়া দিন না?' জাতীয়তাবাদী দলের এই সদস্য শ্রী জি এন আপ্পারাও বলেন যে, বাজেট পর্যালোচনা করিয়া তাঁহার মনে হইয়াছে যে, মন্ত্রিসভার সাতজন সদস্য যে যে এলাকার প্রতিনিধি সেই সেই এলাকার স্বার্থের দিকেই কেবল দৃষ্টি দিয়াছেন। ১৯৬টি নির্বাচন কেন্দ্রের প্রত্যেক সদস্যকে যদি তিন মাস করিয়া অন্ততঃ মন্ত্রী করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে

এই ১৯৬টি নির্বাচন কেন্দ্রের অভাবগুলি মিটিবে। তিনি বলেন যে, যদি তাঁহার প্রস্তাব কার্যকরী করা সম্ভবই না হয় তাহা হইলে মন্ত্রিগণ নিজ এলাকার অথবা দলের স্বার্থের উর্ধ্বে থাকিয়া সামগ্রিকভাবে দেশে সমৃদ্ধির জন্য কাজ যদি করেন তাহা হইলে তিনি আনন্দিত হইবেন।"

সাধক কবি রামপ্রসাদ এক সময়ে গাহিয়াছিলেন, "আমায় দে মা তবিলদারি, আমি নেমখারাম নই শঙ্করী।" তাঁহার লক্ষ্য ছিল পরমার্থ আর অন্ধ সদস্যদের লক্ষ্য হইতেছে অর্থ। ঐ সামান্য প্রভেদটুকু বাদ দিলে বড় তফাৎ নাই, কেন না পরমার্থের যেমন হিসাব কিতাব নাই বা কাহাকেও হিসাব কিতাব দিতে হয় না এখানে অর্থ সম্বন্ধেও সেই কথা, শুনিতে পাই হিসাবের বালাই নাই। যে অর্থ পরের জন্য ব্যয় হইতেছে তাহার হিসাব চাহিবেই বা কোন্ পাষণ্ড, আর দিবেই বা কোন্ পাষাণ হৃদয়? তাই শ্রীযুক্ত আপ্পারাও গাহিয়াছেন, (ঠিক স্বরতাল সংযোগে গাহিয়াছেন না সরল গদ্যে বলিয়াছেন প্রকাশ নাই) "আমায় দে গো মন্ত্রীগিরি।" তিনি জানাইয়াছেন যে, পরোপকারের উদ্দেশ্যে তিনি ও তাঁহার দল মন্ত্রীগিরি গোবর্ধন ধারণ করিবেন। বর্তমান মন্ত্রিগণ স্ব স্ব নির্বাচন কেন্দ্রের জন্যই অর্থ ব্যয় করেন। অন্য স্থানের লোকে বঞ্চিত হয় ইহা তাঁহার অভিযোগ। কিন্তু তাঁহার জানা উচিত যে, charity begins at home! এখানে home মানে নির্বাচন কেন্দ্র, কাজেই homeটি বেশ ব্যাপক। অনেক সময়ে charity আদি ও অকৃত্রিম home-এর বাহিরে যায় না, অর্থাৎ charity begins and ends at home! আপ্পারাও বলিয়াছেন যে, মেয়াদী মন্ত্রীগিরি দান সম্ভব না হইলে "মন্ত্রিগণ নিজ এলাকার অথবা দলের স্বার্থের উর্ধ্বে থাকিয়া সামগ্রিক-ভাবে দেশে সমৃদ্ধির জন্য কাজ যদি করেন তাহা হইলে তিনি আনন্দিত হইবেন।" কিন্তু শ্রীযুক্ত আপ্পারাওকে আনন্দ দানের জন্যই কি মন্ত্রিগণ মন্ত্রিত্ব গ্রহণ রূপ কঠোর ব্রত পালন করিতেছেন? অবশ্যই নয়। তাঁহাদের লক্ষ্য পরোপকার আর ভাবী পরোপকার সাধনের পথটি যাহাতে খোলা থাকে তজ্জন্য নির্বাচন কেন্দ্রের তোষণ! উক্ত সদস্য মহোদয় এত বোঝেন আর এইটুকু বুঝিলেন না! কিন্তু মেয়াদী মন্ত্রীগিরিতে কমলাকান্তের আপত্তি নাই, তবে তাহাতেই কি সকলের ভাগ্যে মন্ত্রিত্ব জুটিবে? সদস্যসংখ্যা ১৯৬ জন, আগামী নির্বাচনের আর কয়মাস বাকি? কাজেই আপ্পারাও স্বদলের সঙ্গে

কোরাসে বা একককণ্ঠে যতই গান করুন না "আমায় দে গো মন্ত্রীগিরি" সমস্যা যেমন তেমনি থাকিবে। অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। কি উপায়? What Bengal thinks to day, the rest of India will think to-morrow! পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রিসভার মতো অন্ত্রের মন্ত্রিসভা যদি একটি জনসভায় পরিণত হয় তবে অনেককে সন্তুষ্ট করা সম্ভব হইবে। অবশ্য সকলকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব হইবে না। হায় এ জগতে সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারে কে?

"সবার মনের মতন ভিক্ষে
দিতে যদি হ'তো কল্পবৃক্ষে
ঘুণ ধ'রে যেতো।"

সকলের সন্তোষ সাধন অসম্ভব বলিয়া কি শ্রীযুক্ত আপ্পারাওকেও খুশী করা হইবে না! পশ্চিম বঙ্গ পথ দেখাইয়াছে, আশা করি অন্ত্র অনুসরণ করিবে।

নেহরুজী বারংবার বলিয়াছেন যে 'মন্ত্রিত্বের লোভ করিও না।' ও কথাটা "Love thy neighbour"-এর মতোই অতিশয় কঠিন। প্রতিবেশীকে ভালবাসা যদি সহজ হইত তবে ধর্মগুরুগণ এতবার মাথার কিরা দিয়া বলিতেন না যে "প্রতিবেশীকে ভালোবাসো।" মন্ত্রিত্বের লোভ পরিত্যাগ বোধ করি ততোধিক কঠিন। একবার মন্ত্রী হইতে পারিলে কত সুবিধা! কাগজে ছবি ও বিবৃতি ছাপা হইবে, আগে পিছে যাত্রাদলের রাজার মতো জনকতক চাপরাশি চলিবে, টুরে বাহির হইলে আদর আপ্যায়নের অভাব হইবে না, কাজটুকু সেক্রেটারিতে করিয়া দিবে আর বিধানসভায় প্রশ্ন-বাণে জর্জরিত হইলে আছে "notice wanted," তাহাতেও না কুলাইলে আছেন বিপদে মধুসূদন, যিনি দিয়াছেন তিনিই রক্ষা করিবেন, "তোমারি দেওয়া প্রাণে তোমারি দেওয়া দুখ।" এহেন মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ! প্রাণ গেলেও নয়, অবশ্য নির্বাচনে হারিলে অন্য কথা, সেই জন্যই তো নির্বাচন জন-পদের এমন সেবা করিতে হয়! কমলাকান্ত একজন ভোটপ্রার্থীকে জানে যাঁহার জয়ের কিছুমাত্র আশা ছিল না। এমন সময়ে স্বয়ং যমরাজ তাঁহার সুযোগ জোগাইলেন। ভোট ভিক্ষায় বাহির হইয়া দেখেন যে এক ব্যক্তি মারা গিয়াছে, খাটিয়া বহনের জন্য তিনজন মাত্র লোক, চতুর্থ ব্যক্তির অভাব। তিনি তখনই বাম হাতে ঝাণ্ডা ধরিয়া ডান হাতে খাটিয়া স্কন্ধে তুলিলেন। অমনি মৃত ব্যক্তির শ্মশানযাত্রা ভোটপ্রার্থীর শোভাযাত্রায় পরিণত হইল। হরি বোল ধ্বনির সঙ্গে মিশ্রিত

হইয়া "অমুক দলের জয়" শব্দের হর-গৌরীর মতো সকলের মনোহরণ করিল। এই হইতেছে নির্বাচনের রহস্য! সেই নির্বাচনপ্রার্থী শ্মশান হইতে সরাসরি বিধানসভায় চলিয়া গেলেন। ইহাতে কি শিক্ষা পাওয়া যায়? শিক্ষা পাওয়া যায় যে সংসারের একপ্রান্তে শ্মশান অন্য প্রান্তে নির্বাচন, উভয় স্থানেই সকলে সমান, কোন ভেদাভেদ নাই। তাই বুঝি তুলসীদাসজী বলিয়াছেন—

"সব্ বন তুলসী ভয়ো,
সব্ পাহাড় ভয়ো শালিগরাম।
সব্ পানি গঙ্গা ভয়ো,
সব্ ঘট্‌মে বিরাজে রাম।"

সমদর্শী অর্থাৎ নির্বাচনপ্রার্থীর চক্ষে সমস্ত কাননই তুলসীবন, সব পাষাণই শালগ্রাম, সমগ্র জলই জাহ্নবীজল, কোথাও ভেদাভেদ নাই।

এহেন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া যিনি মন্ত্রী হইয়াছেন তিনি মন্ত্রিত্ব ছাড়িবেন কিরূপে? বশিষ্ঠ কি ঋষিগিরি ছাড়িতে পারিয়াছেন? বার্ট্রাণ্ড রাসেল কি লর্ডগিরি ছাড়িতে পারিয়াছেন? তবে? অতএব শ্রীযুক্ত আপ্পারাও স্বরলয়-সংযোগে যত খুশী গান করুন, "আমায় দে গো মন্ত্রীগিরি"—কোন ফল হইবে না। পরোপকারের মোহ সংসারে সবচেয়ে দুর্নিবার॥

৬৮

পরোপকার—নবসংস্করণ

কেন জানি না কমলাকান্তের একটি ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে পরোপকারীর পরিণাম শুভ নয়। পরলোকে তাহার জন্য কি ব্যবস্থা হয় সেটা তো কেবল অনুমানগম্য, ইহকালের ব্যবস্থা তো নিত্যনিয়ত চোখের উপরেই ঘটিতেছে। বেচারী নবকুমার পরের জন্য কাষ্ঠাহরণে গিয়া আর একটু হইলেই প্রাণ হারাইয়াছিল আর কি। সম্প্রতি অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছে। পত্রান্তরে চিঠিপত্রে সংবাদটি প্রকাশ। এক ভদ্রলোক দয়াপরবশ হইয়া পথে আহত এক ব্যক্তিকে কলিকাতার কোন হাসপাতালে পৌঁছাইয়া দেন।

সকলেই বলিলেন যে কাজটি অতি উত্তম এবং আর সকলের পক্ষে অনুকরণীয়। কিন্তু ঘটনার পরবর্তী অংশ শুনিলে কেহ অনুকরণ করিতে অগ্রসর হইবে কি না সন্দেহ। কিছুদিন পরে সেই ভদ্রলোকের কাছে একখানি বিল যায়—সেই রুগীর হাসপাতাল খরচার বিল। সে টাকার দায়িত্ব কার জানি না, কিন্তু নিশ্চয়ই সেই পরোপকারী ব্যক্তিটির নয়। তিনি অবশ্য টাকা না পাঠাইয়া বিলখানি পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠাইয়া দেন। সে দপ্তর হইতে ভদ্রলোককে জানানো হয় যে এ যাত্রার মতো টাকাটা মাপ করা গেল। যাক্, ভদ্রলোক পরোপকারের মাশুলের দায় হইতে বাঁচিয়া গেলেন। ভদ্রলোক তো রক্ষা পাইলেন, কিন্তু আর সকলে কি শিক্ষা পাইল? প্রথম শিক্ষা এই যে সাধারণভাবে পরোপকার কার্যটাই অবাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয় শিক্ষা বিশেষভাবে এই যে কলিকাতায় পথেঘাটে হতাহত ব্যক্তি পড়িয়া থাকিতে দেখিলে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া প্রস্থান করিবে, আর্তের কাতরোক্তিতে কখনো কর্ণপাত করিবে না। আর যদিস্যাৎ কখনো ভুলিয়া আহতের ভার গ্রহণ করো তবে তাহাকে হাসপাতালে পৌঁছাইয়া না দিয়া একেবারে সাধনোচিত ধামে অর্থাৎ নিমতলা বা কেওড়াতলায় পৌঁছাইয়া দিবে, কারণ দুয়েরই পরিণাম সমান, সুবিধার মধ্যে এই শেষোক্ত স্থান হইতে বিল পাঠায় না।

পরোপকার নিতান্ত অকেজো ব্যক্তিতে করিয়া থাকে, আর যেহেতু বর্তমান যুগে অকেজো ব্যক্তির স্থান নাই, কাজেই বুঝিতে পারা যায় যে পরোপকার যুগাভিপ্রায় নহে। বুঝাইয়া বলি। আপনি দশটায় মোটরযোগে অফিসে চলিয়াছেন এমন সময়ে দেখিলেন পথে একটি লোক অর্ধমৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে, খুব সম্ভব পূর্ববর্তীর মোটর চাপা পড়িবার ফলেই এমন ঘটিয়াছে। তখন আপনার কর্তব্য কি? আপনি যদি যথেষ্ট প্রগতিশীল হন তবে লোকটির দেহের উপর দিয়া মোটর চালাইয়া দিয়া পূর্ববর্তীর অসমাপ্ত কার্যকে সমাপ্তিতে পৌঁছাইয়া দিবেন। আর আপনি যদি আর আর দশ জনের মতো সাধারণ জীব হন তবে অন্য দিকে মুখ ঘুরাইয়া প্রস্থান করিবেন। কিন্তু এ দুয়ের কিছু না হইয়া আপনি যদি পরোপকারী হন তবে লোকটিকে মোটরে তুলিয়া হাসপাতালে পৌঁছাইয়া দিবেন। দেখুন ঐ কাজটার ফলে আপনার কিছু অতিরিক্ত পেট্রল খরচ হইল, আফিস কামাই হওয়াতে গুরুতর কত কাজের ক্ষতি হইল; তারপরে আপনার ভুল ঠিকানা যদি না দিয়া আসেন তবে

একখানি বিল আপনার ঠিকানায় আসিবে। নিন, এবারে পরোপকার করুন। তারপরে আবার পুলিশের হাঙ্গামায় জড়াইয়া পড়াও বিচিত্র নয়, আপনিই যে লোকটিকে চাপা দেন নাই, তাহার প্রমাণ কি! অতএব দেখা গেল যে আদর্শবাদ, কাণ্ডজ্ঞান সমস্তই ইঙ্গিত করিতেছে পরোপকার করিতে নাই, করিলে অসীম দুর্গতি, দুর্ভোগ ও লাঞ্ছনা। আশা করি ইহার পরে আপনাদের আর কেহ পরোপকারের পথে অগ্রসর হইবেন না।

কিন্তু এত নিষেধ সত্ত্বেও যদি কাহারো পরোপকার করিতে সাধ যায় তবে এমনভাবে করিবেন যাহাতে হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, পরোপকার —কিন্তু আসলে আত্মোপকার ছাড়া আর কিছু নয়। ব্যাপারটার সঙ্গে অবশ্য সকলেরই পরিচয় আছে তবু একটা উদাহরণ দিতে আপত্তি কি!

"আমেদাবাদ, ১৬ই জুলাই—ইহা ভূদান অথবা জীবনদানের কাহিনী নয়, পত্নীদানের সত্য ঘটনা। এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দম্পতি কোলে সম্প্রদায়ভুক্ত। তরুণ প্রণয়ী স্বামীর সহিত একই কারখানায় 'জিরাসদারের' কাজ করে; পত্নী তাহারই প্রেমে পড়িয়াছিল। পত্নী অন্য যুবকের প্রতি প্রেমাসক্ত, স্বামী যখন ইহা জানিতে পারিল, তখন সে কুপিত হইল না; বরং তরুণীভার্যাকে তাহার প্রণয়ীর হাতে সঁপিয়া দিয়া বলিল, 'আজ হইতে তুমি আমার বহিন।' কারখানার কর্মীদের মধ্যে পত্নীদানের কাহিনীতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইয়াছে।"

হঠাৎ পড়িয়া পরোপকার মনে হইলেও বস্তুত: তাহা নয়। "আত্মানং সততং রক্ষেৎ ধনৈরপি দারৈরপি"-র প্রকৃষ্টতম উদাহরণ। বৃদ্ধের পক্ষে তরুণী ভার্যা মস্ত দায়, লোকে দায়মুক্ত হইবার সুগম পথ পায় না, আর এই ভাগ্যবান স্বামী (এখন ভূতপূর্ব স্বামী) নিজের বোঝা শুধু অপরের ঘাড়ে চাপাইয়া যে দিল তাই নয়, একজন মহানুভব ব্যক্তি বলিয়াও নাম কিনিল। অবশ্য কারখানার কর্মীদের চাঞ্চল্যের কারণ বুঝি, আরও অনেকের অনুরূপ দায়মুক্ত হইবার ইচ্ছা। নিতান্ত সামাজিক কারণে অসম্ভব না হইলে বহু স্বামী নিজের স্ত্রীকে 'বহিন' ডাকিয়া ভূতপূর্ব স্বামী বনিতে রাজি আছে ইহা শপথ করিয়া বলা যায়। এখন পরোপকার যদি করিতেই হয়—তবে ইহাই প্রকৃষ্টতম

পন্থা, বিল আসিবে না, লোকে ধন্য ধন্য করিবে, আর আসলে যাহা হইল অপরে না জানিলেও অন্তর্যামী জানিতেছেন। আসলে হইল, আগেই বলিয়াছি, পরোপকারের অজুহাতে আত্মোপকার। মনের বিশেষ একটা অবস্থায় উহাই পরোপকার, কারণ তখন নাকি আর আত্মপর ভেদ থাকে না।

৬৯

'বিশ্বনাগরিক'

লোকটির নাম গ্যারি ডেভিস, বয়স চৌত্রিশ, এক সময়ে সে মার্কিণ রাজ্যের অধিবাসী ছিল, যুদ্ধকালে বোমারু বিমানের নাবিকের কাজ করিত সে। তারপরে তাহার কি রকম মতিগতি হইল, মার্কিণ নাগরিকত্ব পরিহার করিল, এখন সে "বিশ্ব-নাগরিক" হইয়া ভবঘুরে ব্রত লইয়াছে. বোধকরি তাহার কল্পিত বিশ্বের সন্ধানেই। কয়েকদিন আগে ডেভিস দিল্লীতে নেহরুজীর সঙ্গে দেখা করিয়াছিল, উদ্দেশ্য আশীর্বাদ প্রার্থনা, অবশ্য খালি হাতে প্রার্থনা করে নাই, নেহরুকে "বিশ্বনাগরিক" পদ দিয়াছে, আগে আর একজনকে দিয়াছিল, মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারকে।

লোকটি কি পাগল না ঘোরতর আদর্শবাদী না আর কিছু? প্রশ্নটা তাহার নিজের মনেও উঠিয়াছে তাই সে উত্তরে বলিয়াছে যে, তাহাকে পাগল বা মৎলববাজ মনে করিলেও সে ও-সব কিছু নয়, নিছক আদর্শবাদী। কেহ কেহ তাহাকে নূতন যুগের ডন কুইকসট মনে করিতে পারে কিন্তু আর যাই হোক ডন কুইকসট পাগল বা মৎলববাজ ছিল না, ছিল ঘোরতর আদর্শবাদী। ডেভিসের বিশ্বাস পৃথিবীর বর্তমান দ্বন্দ্ব সংঘাত বিদ্বেষ অবিশ্বাসের মূলে রহিয়াছে পারস্পরিক সন্দেহ, রহিয়াছে একদেশ হইতে অন্যদেশকে নানা কৃত্রিম উপায়ে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবার অনিষ্টকর প্রথা। এই কারণেই ডেভিস কোন বিশেষ দেশের নাগরিক থাকিতে অস্বীকার করিয়া মার্কিণ নাগরিকপদ পরিহার করে। স্বাভিহিত "বিশ্বনাগরিক" সে। এক সময়ে ইহার ফলভোগও তাহাকে করিতে হইয়াছে। জাহাজ হইতে কোন দেশের বন্দরে নামিবার

অনুমতি সে পায় নাই, সর্বত্র একই কারণ দেখানো হয়—পাসপোর্ট নাই। মনে আছে তখন লোকটিকে বেশ কিছুকাল জাহাজে জাহাজে ঘুরিতে হইয়াছিল, ডাঙার মানুষের ডাঙায় নামিবার পথ বন্ধ। তারপরে এখন সে কি ভাবে ডাঙায় নামিল জানি না, অবশ্য ভারতবর্ষে সকলেরই পথ উন্মুক্ত।

বর্তমান জগতের আধিব্যাধির যে স্বরূপ ডেভিস নির্ণয় করিয়াছে তাহাই একমাত্র সত্য এমন বলি না, কিন্তু তাহার মধ্যে কিছু সত্য যে আছে সে বিষয়ে সংশয় নাই। নানা নামের নানা শ্রেণীর প্রাচীরে বিভিন্ন দেশের জন-সমষ্টিকে ভাগ করিয়া রাখিয়া একদল পেশাদার রাজনীতিক 'পীপলে'র (People) মুরুব্বি সাজিয়া পৃথিবীতে আজ এক অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। সোরাব ও রোস্তাম সমরক্ত বহন করিয়াও দ্বন্দ্বে নামিয়াছিল, সোরাব মরিয়াছিল, কেন না তাহারা পরস্পরকে চিনিত না। বর্তমানের গণযুদ্ধ বা Peoples' Warটাও কি তদনুরূপ নয়? মাঝখানকার মুরুব্বিগণ তাহাদের নানা নামের রক্ষাকবচ লইয়া সরিয়া গেলে প্রকৃত 'পীপল' পরস্পরকে চিনিতে পারিবে আর আত্মীয় বলিয়া চিনিতে পারিলে আত্মীয়বৎ আচরণ করিবে। যতদূর বুঝি ডেভিসের বক্তব্য এই রকম কিছু। পৃথিবীর বিভিন্ন রাজ্য ও দেশ যতই ঘনীভূত হইতেছে ততই তাহাদের দূরত্ব বাড়িতেছে না কি? ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্যগুলি প্রকটতর হইয়া বৃহৎ ঐক্যটাকে ক্রমেই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে না কি? নিজেদের ও অপরের দিকে তাকাইয়া যেন উত্তরটা ভাবি। মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখিতে আর আমরা অভ্যস্ত নই। নানা নামের শ্রেণীহীন নানা নূতন শ্রেণীর লেবেল মানুষের আষ্টেপৃষ্টে এমন সাঁটিয়া গিয়াছে যে, এই কিম্ভূত জীবটাকে মানুষ বলিয়া চেনাই কঠিন। তাই মানুষের প্রতি অমানুষের মতো আচরণ করিতে আমাদের বাধে না। যাইহোক বর্তমানকাল খুব সম্ভব গ্যারি ডেভিসকে বাতুল বলিয়াই মনে করিবে, কিন্তু এ কালের বিচারটাই তো চূড়ান্ত বিচার নয়। মানুষে মানুষে প্রভেদ কমাইয়া আনিতে হইবে, তার একটা উপায় রাষ্ট্রগত নাগরিক পদ লোপ। ডেভিস সেই পথের প্রথম পথিক। প্রথম পথিককে প্রায়শঃ উন্মাদ আখ্যা বহন করিতে হয়। কিন্তু শেষে দেখা যায় যে, এক যুগের উন্মাদ পরবর্তী যুগের ঠাকুরে পরিণত হয়। ডেভিসের ক্ষেত্রে কি তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবে?

৭০

ঘাসের ফুল

একটি ছোট্ট খবর—খুব সম্ভব ভালো করিয়া অধিকাংশ লোকেরই চোখে পড়ে নাই, তাই বলিয়া তাহার মূল্য কম নয়।

"ব্যারাকপুর, ২২শে সেপ্টেম্বর—টিটাগড় শিল্পাঞ্চলের জনৈক ভিক্ষুক তাহার সারা দিনের সংগৃহীত অর্থ উড়িষ্যার বন্যার্তদের সাহায্যকল্পে দান করিয়াছে।

ভিক্ষুকটির নাম হরিয়া। গত মঙ্গলবার দিন ভিক্ষা করার সময় সে প্রত্যেকের নিকট তাহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে; কিন্তু অনেকেই তাহার কথায় আস্থা স্থাপন করে নাই। সন্ধ্যার সময় জনৈক রিলিফ কর্মীর হস্তে সে তাহার সারা দিনের উপার্জন পৌনে তের আনা উড়িষ্যার বন্যার্ত সাহায্য তহবিলে দান করে।"

অনুরূপ আর একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। একবার গান্ধীজী যখন বাংলা দেশের কোন গ্রামাঞ্চলে যান, তখন একজন ভিক্ষুক তাঁহার পথরোধ করিয়া তাঁহার হাতে একটি পয়সা অর্পণ করে। সে হয়তো শুনিয়াছিল যে, গ্রামে একজন সাধু পুরুষ আসিয়াছেন, কাজেই সে তাহার যথাসাধ্য সাধুপুরুষকে দান করিল। ঐ পয়সাটি গ্রহণ করিবার সময়ে গান্ধীজীর মনোভাব কিরূপ হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা চলে। লোকটির অনেক ক্ষুধা, অনেক আকাঙ্ক্ষা ঐ পয়সাটির মধ্যে ঘনীভূত ছিল।

এই সব ক্ষুদ্র ঘটনাই জীবনের লাবণ্য। ধনীর উদ্যানে কত দেশী বিদেশী ফুল গন্ধে ও সৌন্দর্যে বাতাস আমোদিত করে। কিন্তু সে-সব ঐ উদ্যানেরই ঐশ্বর্য। কিন্তু পৃথিবীকে সরস ও শোভন করিয়া রাখিয়াছে যে-সব সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র ঘাসের ফুল তাহা কয়জনের চোখে পড়ে! অথচ নাম-না-জানা ফুলের বাহারেই তো পৃথিবী সুন্দরী। উপরি উক্ত ঘটনা দুটি সেই নাম-না-জানা ঘাসের ফুল। ইহারা যে কেবল জীবনকে সুন্দর করিয়া রাখিয়াছে তাহা নয়, ইহাদের সৌন্দর্য ও সরসতায় বুঝিতে পারা যায় যে, পৃথিবী, জীবন

এখনো রসগর্ভ। ইহার ব্যতিক্রম বা বিপরীত ঘটিলে ধনীর উদ্যানও শুকাইয়া যাইত, কবির লেখনীও বন্ধ্যা হইত।

অথচ অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, জীবনের এই শাশ্বত রসপ্রবাহটিই আমাদের চোখ এড়াইয়া যায়, আমরা ধনীর উদ্যানশোভা নিরীক্ষণ করিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকি। আমার তো মনে হয় ইহা জীবনের পরীক্ষা। শত শত উল্কাস্রাবী আতসবাজি নিক্ষেপ করিয়া জীবন আমাদের পরীক্ষা করে—আকাশের ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোকবিন্দুগুলি আমাদের চোখে পড়ে কি না। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাব্যাপী শিরোনামা খাটাইয়া পরীক্ষা করে কপর্দক-সহায় ভিক্ষুকের সর্বস্বদান আমাদের চোখে পড়ে কি না! তূরী ভেরী ও জগঝম্প বাজাইয়া পরীক্ষা করে ঘুঘুর করুণ বিলাপ আমাদের কানে প্রবেশ করে কি না! আপাত-অসামান্যের আড়ম্বর সৃষ্টি করিয়া পরীক্ষা করে নিত্য অসামান্যকে আমরা গ্রহণ করিতে পারি কি না! পরীক্ষা করে ধনীর লক্ষ মুদ্রার অন্তরালবর্তী ঐ পৌনে তেরো আনার যথার্থ মূল্য আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি কি না! জীবনরহস্যের মর্মজ্ঞ ব্যক্তি জানে যে, ঐ পৌনে তেরো আনার মূল্য পুরা ষোলআনা।

বর্তমান যুগের ট্রাজেডি এই যে, জীবনের শাশ্বত মূল্যগুলি আমাদের চোখে পড়িতে চায় না। নিতান্ত ক্ষণিক, নিতান্ত স্থানিক, নিতান্ত সাময়িক ঘটনা অদৃষ্টের পরিহাসে এমন একটা অস্বাভাবিক মাহাত্ম্য লাভ করিয়া বসে যে, লোকে সেই সবকেই নিত্যবস্তু বলিয়া গ্রহণ করে। অবশ্য মনীষী ও মহাপুরুষগণ এই নীতির প্রতিবাদ করেন, কিন্তু সেখানেও বিপদ কম নয়। কে মহাপুরুষ আর কে মহাপুরুষ নয়—তাহা স্থির করিবে কে? যে-কোন চতুর ফন্দিবাজ বিস্তর বাক্যের জাল বুনিয়া মানুষের মন ধরিতে উদ্যত। যাহার জালে যত মন সে তত সুধীবর! এক এক সময়ে মনে হয় যুগ-প্রহসনের প্রকৃত নায়ক মহাপুরুষও নয়, 'পীপল' বা জনগণও নয়, বাক্যব্যবসায়ী চতুর ফন্দিবাজ ব্যক্তিই বর্তমানে যুগ-নায়ক। সে স্রষ্টিকর নয়, জাদুকর মাত্র। অনায়াসে সে ব্যক্তি টুপির ভিতর হইতে খরগোস এবং পকেট হইতে বিশ্বত্রাণ পরিকল্পনা বাহির করিতে সমর্থ। সে ব্যক্তি অনায়াসে নিজের কাণাকড়িকে লক্ষ মুদ্রা প্রতিভাত করিতে পারে। ভিক্ষুকের পৌনে তেরো আনা তাহার কাছে নিতান্তই অবজ্ঞার বস্তু।

৭১ ·

ডেপুটি-ভগবান

কোপেনহাগেনের একটি সংবাদে পড়িলাম যে, সেখানকার পারাবতকুল ধ্বংস করা হইবে। কেন? পারাবত সংখ্যায় অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে, ইহাই কি যথেষ্ট কারণ নয়? তবে কিনা এই হত্যাকার্য মনুষ্যোচিত পন্থাতেই সাধিত হইবে, অকারণ নিষ্ঠুরতার স্থান মানুষের আচরণে নাই। খাদ্যের সঙ্গে ঘুম-পাড়ানী ওষুধ মিশাইয়া ছড়াইয়া দেওয়া হইবে, সেই খাদ্য গ্রহণ করিয়া পারাবতকুল ঘুমাইয়া পড়িলে তখন তাহাদের গ্যাস চেম্বারে নিক্ষেপ করিয়া মারিয়া ফেলা হইবে। তাহারা জানিতেও পারিবে না যে, মরিল। ইহাকেই বলে মনুষ্যোচিত সদয় হত্যাকার্য। বন্দুকের গুলী নয়, খাদ্যের গুলী; অস্ত্রশস্ত্র নয়, গ্যাস চেম্বার; জাগ্রতে নয়, সুষুপ্তিতে; অকারণে নয়, প্রয়োজনে; নৃশংসতায় নয়, দয়ায়! পারাবতকুল নিশ্চয়ই এত দয়া প্রত্যাশা করে নাই, খুব সম্ভব এত দয়ার যোগ্যও তাহারা নয়। কিন্তু যাহারা লড়াই করিতে জানে না, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য যাহারা নয়, যাহারা শুধু স্বাদু মাংস জোগায়—আর আকাশপথে ডাক-হরকরার কাজ করে, তাহাদের জন্য এতখানি সতর্কতার আবশ্যক কি? সে কথা কি আবার খুলিয়া বলিতে হইবে? মানুষ যে বিবেচক, মানুষ যে দয়াবান জীব, মানুষ যে ডেপুটী ভগবান! সমস্ত ঘটনার বিবরণ পড়িয়া মানুষের মনুষ্যত্ববোধে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। ক্ষণকালের তরে বাক্‌রোধ হইয়াছিল, বাক্‌স্ফূর্তি হইলে হৃদয়ের গভীরতম স্থান হইতে ধ্বনিত হইল—আহা কর্তার কি দয়া!

এই কলিকাতা সহরেও মাঝে মাঝে শস্ত্রপাণি কর্পোরেশনের অনুচরদের দেখিয়াছি কুকুর সংগ্রহ করিতে, পাছে অবুঝ, অসভ্য জানোয়ারগুলা মানুষকে, নাগরিককে, কর্পোরেশনের ভোটারকে কামড়াইয়া দেয়! কর্পোরেশনেরও দয়ামায়া আছে, কুকুরগুলাকে খুব সম্ভব গ্যাস চেম্বারে নিক্ষেপ করা হয়, আর যদি ব্যয়বহুলতার জন্য তাহা সম্ভব না হয়, তবে মা গঙ্গা তো আছেন,

অভাবে বিদ্যাধরী! যে পন্থাই গৃহীত হোক না কেন কুকুরগুলা যে বিনা যন্ত্রণায় মরে তাহাতে সন্দেহ নাই। শুনিয়াছি কুকুরের কামড় যন্ত্রণাদায়ক, অপরপক্ষে মানুষের কামড় যেমন মধুর, তেমনি সদয়! হাজার হোক মানুষ মানুষ, কুকুর কুকুর—তেলে জলে তো আর মিশ খায় না।

প্রগতির তাল বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ক্রমেই অধিকতর বিবেচক হইয়া উঠিতেছে আর তাহার মূক প্রতিবেশীদের অধিকতর সদয়ভাবে হত্যা করিতেছে! তাহার দয়ার আক্রমণ হইতে কুকুর, শিয়াল, ইঁদুর, বিড়াল, পশু-পক্ষী কাহারো পরিত্রাণ নাই। শ্বাপদ ও সরীসৃপের কথা তুলিলাম না, যেখানে নিরীহ পশু-পাখীরই এই পরিণাম সেখানে শৃঙ্গী নখীর কথা তুলিলে কি ফল হইবে? আরো আছে। প্রতিনিয়ত হাজার হাজার ইঁদুর, খরগোস ও গিনিপিগ নিহত হইতেছে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার নামে। জ্যান্ত কুকুরের মস্তিষ্কে ছুরি চালাইয়া Condition Reflex-এর পরীক্ষা চলে। যে বৈজ্ঞানিক ঔষধ বা চিকিৎসার ফলে পশুকুলের কিছুমাত্র লাভবান হইবার আশা নাই, সেইসব প্রাণান্তকর (এবং খুব সম্ভব যন্ত্রণাদায়ক) পরীক্ষা চলে পশুদেহে। এ অধিকার মানুষের আছে কি না প্রশ্ন তুলিয়াছেন বার্ণার্ড শ'। কিন্তু নিরামিষভোজী শ' কি বুঝিবেন? মানুষের অবশ্যই সে বিধিদত্ত অধিকার আছে—মানুষ যে ভগবানের স্থলাভিষিক্ত। তবে ভরসার মধ্যে এই যে পারাবতগুলা জানিতেও পারিবে না যে তাহারা মরিল, তাহারা সোজা স্বর্গে গিয়া জাগিয়া উঠিয়া গলা ফুলাইয়া ডাকিতে সুরু করিবে বক্‌-বকম্‌-বক্‌!

নিদ্রিত পারাবতগুলাকে গ্যাস চেম্বারে নিক্ষেপ করা হইবে পড়িয়া নাৎসী গ্যাস চেম্বারের কথা মনে পড়িল। কলিকাতা কর্পোরেশনের কুকুর সংগ্রহ ও দূরবর্তী স্থানে প্রেরণ ব্যাপারে দাস-শিবিরের কথা মনে পড়িল। আর পারাবতকুল নিধনের সঙ্কল্পে য়িহুদি জাতি বিনাশের কথা মনে পড়িল! ইহাই স্বাভাবিক পরিণাম—পশু-পক্ষী হত্যা, মনুষ্য হত্যার হাতে খড়ি; পশু-পক্ষী হিংসা মনুষ্য হিংসার প্রথম ধাপ; পারাবতকুল ধ্বংস সামগ্রিক যুদ্ধের রিহার্সাল; এ-যাবৎকাল মানুষের অবিবেচনা ও অত্যধিক বিবেচনার ফলে যত পশু পক্ষী নিহত হইয়াছে তাহাদের নীরব অভিসম্পাতেই মানুষকে সামগ্রিক বিশ্বযুদ্ধের দিকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। লোষ্ট্রপাতে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গবলয় যেমন প্রতি মুহূর্তে বৃহত্তর হইতে থাকে, একটি সামান্য মূষিক

হত্যার শেষ পরিণাম যে বিশ্বযুদ্ধ নয়—তাহার প্রমাণ কি? অন্ততঃ পরীক্ষা তো হয় নাই।

ক্রৌঞ্চবধে আদি শ্লোকের সৃষ্টি, শিবি রাজার উপাখ্যান, সিংহ কর্তৃক দিলীপকে পরীক্ষা বা সেণ্ট ফ্রান্সিস্ অব্ এসিসি-র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব না, কারণ তাহা হইলে লোকে কমলাকান্তকে সেন্টিমেণ্টাল মনে করিবে—এ যুগে, সদয় পশু হত্যার যুগে ওর চেয়ে বড় গাল আর নাই। তবু একবার ভাবিয়া দেখিতে বলি নিজের কল্পিত কল্যাণের জন্য পশুবধ করিবার অধিকার সত্যই কি মানুষের আছে? এ Divine Right সে কোথা হইতে পাইল? আসল কথা, পশু-পক্ষী শ্বাপদ সরীসৃপ লইয়া নিশ্চিন্তে জীবন ধারণ করিতে হইলে যে লোকোত্তর জীবনতন্ত্রের আবশ্যক মানুষ এখনো তাহার পরিকল্পনা করিতে পারে নাই। অর্থাৎ মানুষ এখনো অর্ধ-সভ্য ও অসম্পূর্ণ বলিয়াই পশু-বধের প্রয়োজন বোধ করিতেছে, আশা করা যাক্ যে এমন এক সময় আসিবে যখন সে এই নৃশংস প্রয়োজন অনুভব করিবে না। হয়তো তখন পশু-পক্ষী বাঁচিয়া যাইবে। কিন্তু বেশ বোঝা যাইতেছে যে, এ যাত্রা কোপেনহাগেনের পারাবতকুলের সদয় মৃত্যুর হাত হইতে কিছুতেই রক্ষা নাই।

৭২

বানর-মেধ যজ্ঞ

কিছুদিন আগে কলিকাতার কোন কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কুকুরের "সুখদায়ক মৃত্যু" ব্যবস্থা গ্রহণের বিরুদ্ধে লিখিয়াছি। খুব সম্ভব বর্তমানে ঐ ব্যবস্থা রহিত হইয়াছে এবং "সুখদায়ক মৃত্যু"র কবল হইতে মুক্তি পাইয়া কুকুরগুলি দুঃখে বাঁচিয়া আছে। কিন্তু পশুসমাজের প্রতি অকারণ নিষ্ঠুরতার ইহাই একমাত্র দৃষ্টান্ত নহে। কিছুকাল হইল ভারত হইতে বিদেশে হাজার হাজার বানর চালান যাইতেছে—উদ্দেশ্য অতিশয় সাধু ও নৃশংস। ঐসব বানরের উপরে জীবিতাবস্থায় ছুরি চালাইয়া অস্ত্রোপচার করা হয়, পরীক্ষা হয় কোন্ অবস্থায় কোন্ ওষুধের কি প্রতিক্রিয়া ঘটে, কোন্ স্নায়ু বা

কোন্ পেশীর কোন্ আচরণের প্রমাণ পাওয়া যায়—ইহার বৈজ্ঞানিক নাম vivisection বা জীবচ্ছেদ। যে কোন কার্যকে একটা বৈজ্ঞানিক নাম দিতে পারিলে তাহার শুদ্ধি হইয়া যায়, তাহার নিষ্ঠুরতা পরম দয়ায় পরিণত হয়। আর হইবেই বা না কেন! মানুষের উপকার সাধনের জন্যই তো এইসব কাণ্ড ঘটানো হয়, মানুষের আপত্তি করিবার পথ বন্ধ। অতএব ভারতীয় বানরকুল হাজারে হাজারে বিশ্বের মানবকুলের উপকারার্থ প্রাণ দিতে বাধ্য হইতেছে। ইহার চেয়ে বানরের আর কি মহৎ পরিণাম কল্পনা করা যাইতে পারে! সার্থক বানরজন্ম—ধন্য মানব যাহারা বানরকে "বাধ্যতা-মূলক দধীচি"তে রূপান্তর দিতেছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পৃথিবীতে বেরসিকের অভাব নাই, তাহাদেরই কয়েকজন বানরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রতিবাদ করে—আর সেই প্রতিবাদের ফলে দুই মাসের জন্য বিদেশে বানর চালান বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু এমন তো দীর্ঘকাল চলিতে পারে না। বৈজ্ঞানিক গবেষণা বন্ধ সেই সঙ্গে রক্তাক্ত বৈদেশিক মুদ্রার আমদানীও বন্ধ। কাজেই আত্মোৎসর্গের জন্য আবার বানর চালান যাইতে থাকে। আবার বেরসিকের দল তৎপর হইয়া ওঠে। তাহারা ৯ই জুলাই তারবার্তা প্রেরণ করিয়া বানর চালান বন্ধ করিবার জন্য নেহরুকে অনুরোধ করিয়াছে, তাহাদের প্রচেষ্টা "in defence of the monkeys of India whose shocking fate has aroused the indignation of the whole civilised world." কিন্তু এই আবেদনে কতদূর ফলোদয় হইবে বলা যায় না, একে গবেষণাটি বৈজ্ঞানিক তাহাতে আবার মানবজাতির উপকারের জন্য। ইহাদের যে কোন একটির ধাক্কা সামলানো কঠিন—দুটি একত্রে ধাক্কা মারিলে কাৎ হইয়া পড়িতেই হইবে।

তবু একটা নৈতিক প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকিয়া যায়, মানুষের তথাকথিত বা সত্য উপকারের জন্য মূক পশুপক্ষীর উপর অত্যাচার করা উচিত কি না, বিশেষ সে অত্যাচার যখন জীবিত অবস্থায় করা হয়। বস্তুতঃ জীবচ্ছেদ বা vivisection-এর মতো নিষ্ঠুর অত্যাচার অল্পই আবিষ্কৃত হইয়াছে। জীবচ্ছেদকারী প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক এক একজন চেঙ্গিজ খাঁ। তার উপরে জীবচ্ছেদের ফলে যে সব তথ্য পাওয়া যায় সে-সব কতদূর বাস্তব, কতদূর কাল্পনিক সে সন্দেহ থাকিয়াই যায়। মূক পশুর মনোভাব নিশ্চয়রূপে জানিবার

উপায় নাই। এই জন্যই কোন কোন anti-vivisector বা জীবচ্ছেদ-বিরোধী মনীষী মূক পশুপক্ষীর উপর পরীক্ষা না চালাইয়া পরীক্ষকের নিকটতম আত্মীয়ের উপরে পরীক্ষা চালাইতে পরামর্শ দিয়াছেন—তাহারা মানব ভাষায় ফলাফল ঘোষণা করিতে পারিবে। বার্নার্ড শ ছিলেন জীবচ্ছেদ-বিরোধী—এ বিষয়ে তাঁহার প্রবন্ধগুলি পড়িলে জীবচ্ছেদকারিগণ অনেক পরামর্শ ও প্রস্তাব পাইবেন। তাঁহার পরামর্শ ও প্রস্তাবের নির্গলিতার্থ এই যে, পশুপীড়ন করিয়া মানবের উপকার করিবার নৈতিক অধিকার কোন মানুষের নাই—এমন কি বৈজ্ঞানিকগণেরও নাই। খাদ্যের জন্য হোক, পথ্যের জন্য হোক, সত্যের জন্য হোক, যুদ্ধের জন্য হোক কোন কারণেই তিনি জীব-হত্যা সমর্থন করেন না, কুকুর বানর তো দূরের কথা, এমন কি নরহত্যারও তিনি বিরোধী।

শান্তির মতো অহিংসাও অবিভাজ্য। বানর মারিব, কুকুর মারিব, নিরীহ পক্ষিকুল মারিব, কেবল মানুষ মারিবার বেলায় হাত সংযত করিব এমন হইবার নয়। এইসব দৈনন্দিন ছোট ছোট হিংসা মানুষের মনকে শাণিত করিয়া তোলে—নিরীহ পশুহত্যা নরহত্যার খসড়া; পৃথিবীময় বৈজ্ঞানিক উপায়ে মূক পশুপক্ষী হত্যা বিশ্বযুদ্ধের ড্রেস রিহার্সাল। এইসব ছোট ছোট হিংসার ঝরণা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিংসার স্রোতস্বিনী যে মহানদে মিশিয়াছে তাহার নাম যুদ্ধ, আবার যুদ্ধের নদনদী যে মহা সমুদ্রের অভিমুখে ধাবিত তাহার নাম বিশ্বযুদ্ধ। ইহা অলঙ্কারের অত্যুক্তি বা কবিকল্পনা নয়—নিছক নিরেট ন্যূনতম সত্য। কারণ ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় হিংসা, অশান্তি, ঘৃণা, বিদ্বেষ একসূত্রে গ্রথিত। যদি বিশ্বযুদ্ধ বন্ধ করিতে চাও নৃশংস পশুহত্যা বন্ধ করো, মনে হিংসার শাণ দেওয়া বন্ধ করো। হিংসায় শাণিত মন শান্তির পথ জানে না। মনে রাখিতে হইবে শান্তি, অহিংসা, সত্য—সমস্তই অবিভাজ্য, তাহাদের দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশ নাই।

৭৩

"হেথা হ'তে যাও পুরাতন—"

পশ্চিম বঙ্গ সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, ১লা বৈশাখ হইতে পশ্চিম বঙ্গের যাবতীয় জমিদারী সম্পত্তির স্বত্বস্বামিত্ব সরকারে আসিয়া বর্তিবে। অতএব এতদিনে এক শ' বাষট্টি বৎসরের রঙ্গমঞ্চে যবনিকা পড়িল। এখন ভরত-বাক্য উচ্চারণের পালা। এ ভার কমলাকান্ত গ্রহণ না করিলে আর কে গ্রহণ করিবে!

এ কথা সত্য যে, আধুনিক রাষ্ট্রতন্ত্রে জমিদারী প্রথার স্থান নাই। কাল-ধর্মে যাহার প্রয়োজন ফুরাইয়াছিল কালের নিঃশ্বাসে সেই জীর্ণ প্রথা ঝরিয়া পড়িল। দুঃখ করিয়া লাভ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া দীর্ঘকালের এই প্রথা অবলুপ্তির সময়ে তাহার বিগত দিনের কীর্তি ও স্মৃতি একবার স্মরণ করিব না তাই বা কেমন? কালসিন্ধুর এক তরঙ্গে জমিদারী প্রথা তাহার নায়েব গোমস্তা কারকুন আমলা পাইক পেয়াদা লইয়া, তাহার বিচিত্র শাসন-ব্যবস্থার সেহা খসড়া প্রভৃতি লইয়া বাঙালীর জীবনে আসিয়াছিল, আজ আবার কালসিন্ধুর আর এক তরঙ্গে তাহা অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গেল। বাঙালীর মনে, বাঙালীর শ্রুতি-স্মৃতিতে, বাঙালীর সাহিত্যে, শিল্পে এক বিচিত্র স্মৃতি। এ প্রথা ভালো কি মন্দ সে তর্কে প্রবেশ করিয়া ফল নাই; এক যুগের ভালো অন্য যুগের মন্দে পরিণত হয়, lest one good custom corrupts the world! কাজেই সে নিষ্ফল আলোচনা থাক্। তাছাড়া, ভরত-বাক্য বিচারবাক্য নয়, বিদায়বাক্য, বিদায়বাক্য মধুর হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

এক সময়ে কমলাকান্ত শর্মা নসীরাম বাবুর আশ্রয় লইয়াছিল। জমিদারী ছিল বলিয়াই নসীরাম বাবু কমলাকান্তের আশ্রয়দাতা। আবার সেরূপ আশ্রয় পাইয়াছিল বলিয়াই কমলাকান্ত তাহার অমূল্য বাণী লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়াছিল, কাজেই এ প্রথার বিরুদ্ধে আর যাহারই যে অভিযোগ থাকুক,

কমলাকান্তের আছে কৃতজ্ঞতা। কিন্তু কেবলি কি কমলাকান্ত কৃতজ্ঞ! ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদেরও কৃতজ্ঞ হইবার কারণ আছে। বস্তুতঃ এক সময়ে গোটা বাংলা সাহিত্যটাই জমিদারগণের চণ্ডীমণ্ডপের পাশে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। সেকালে চণ্ডীমণ্ডপের পাশেই ছিল সরস্বতীর মণ্ডপ! নিতান্ত আধুনিককালেও সে ধারা লোপ পায় নাই। জমিদারী প্রথার সঙ্গেই 'গল্প-গুচ্ছ'র কার্যকারণ সম্বন্ধ! আর শিলাইদর কুঠিবাড়ী যুগপৎ জমিদারের কাছারী ও আসমানদারের বিহারক্ষেত্র!

এক সময়ে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় জমিদারী প্রথার বিশেষ উপযোগিতা ছিল, আজ সে উপযোগিতা ফুরাইয়াছে বলিয়াই তাহা লোপ পাইতে চলিল। কিন্তু বাংলাদেশের সামাজিক ও মানসিক ইতিহাস লিখিতে বসিলে এই প্রথার যথাপ্রাপ্য তাহাকে দিতেই হইবে। সেকালে গ্রামাঞ্চলের যাবতীয় পূর্ত কার্য ও দাতব্য কার্য সমস্তই ছিল জমিদারগণের অবশ্যকর্তব্যের অঙ্গ। কৃষ্ণকান্তের উইলের কৃষ্ণকান্তকে প্রাচীন জমিদারগণের সুযোগ্য প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাহারাই এক সময়ে বাঙালীর সামাজিক জীবনের যাবতীয় দায়িত্ব বহন করিয়াছে। কিন্তু শুধু সামাজিক জীবনেরই বা কেন? বাঙালীর সামাজিক জীবনের ঢিমেতাল যখন রাজনৈতিক আন্দোলনের ঝাঁপতালে পরিণত হইল, তখন বহু জমিদার কি-ভাবে অর্থের দ্বারা ও অন্যান্য উপায়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের আনুকূল্য করিয়াছে, সে ইতিহাসও একেবারে প্রচ্ছন্ন নয়, অনেকেরই জানিবার কথা। যে দিক দিয়াই বিচার করা যাক না কেন, ভালোয় এবং মন্দে জমিদারী ব্যবস্থা বাঙালীর জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। আজ সেই যোগ ছিন্ন হইয়া গিয়া জমিদার ও জমিদারী স্মৃতির পর্যায়ে চলিয়া গেল। দুঃখ করিয়া লাভ নাই, প্রয়োজন না ফুরাইলে এমনটি কখনো সম্ভব হইত না।

গোড়াতেই বলিয়াছি যে, আমি বিচার করিতে বসি নাই, নাটকের যবনিকা পতনক্ষণে ভরত-বাক্য উচ্চারণই আমার উদ্দেশ্য। মানুষের স্বভাব এই যে, অতীতকে তাহার মধুর লাগে, স্মৃতিকে বড় রমণীয় মনে হয়। সেই নিয়মের বলেই যে প্রথায় বহুতর অনাচার ও অবাঞ্ছনীয় বস্তু ছিল তাহাকেও মনোরম মনে হইবে। ছাড়িয়া আসা গ্রামের পানাপুকুরকেও সুন্দর মনে হয়। কিন্তু পুকুর তো চিরকাল পানাপুকুর ছিল না এক সময়ে যত আগেই

হোক না, ছিল "স্নিগ্ধ অতল দীঘি কালো জল।" অতীতের দিগন্ত হইতে যখন বাতাস বহিবে, তখন মাঝে মাঝে সেই দীঘির তরঙ্গবিলাপ, পদ্মবনের উদাস সুগন্ধ ও তীরভূমির "পল্লবঘন আম্র কাননের", পল্লী জীবনের বিচিত্র লীলা বাঙালীর মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিবে। অতীতকে মনে রাখিলে তবেই ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হয়। এক রঙ্গমঞ্চে যবনিকা পড়িল, যবনিকা উঠিল অন্য রঙ্গমঞ্চে, এবারে সেই দৃশ্যের জন্য প্রস্তুত হইবার সময়। কিন্তু তার আগে একবার শেষ প্রেক্ষণীতে বাঙালীর জীবনের এক করুণ মধুর অধ্যায়ের সূর্যাস্ত দেখিয়া লই, বিদায়গম্ভীর ভাষায় তাহার ভরত-বাক্য উচ্চারণ করিয়া লই।

৭৪

বিদায় ১৯৫৭ সাল!

বহুপ্রতীক্ষিত, বহু আশার, বহু আশঙ্কার ১৯৫৭ সাল শেষ হইতে চলিল। আর আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে বৃদ্ধ চিত্রগুপ্ত তাঁহার বিশ্বব্যাপী দপ্তরখানায় প্রাচীন লেজার-বইয়ের বৎসরের সুখ-দুঃখ অঙ্কিত পাতাখানা উল্টাইয়া ফেলিবেন আর সেই সঙ্গে অনেক লাভক্ষতি, টানাটানির হিসাব ইতিহাসের পর্যায়ে গিয়া পড়িবে—নূতন অঙ্কপাত শুরু হইয়া যাইবে নূতন বৎসরের পৃষ্ঠায়। ১৭৫৭ সাল ও ১৮৫৭ সালের নজিরে অনেকে অনুমান করিয়াছিল ১৯৫৭ সালেও একটা ক্রান্তিকারী ঘটনা ঘটিবে ভারতবর্ষের ইতিহাসে। স্পষ্ট দেখা গেল ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিল না। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি কদাচিৎ ঘটে। ঐতিহাসিকগণই পরস্পরের পুনরাবৃত্তি করিয়া থাকেন। তাছাড়া ভারতবর্ষের ইতিহাসে পুনরাবৃত্তি না ঘটিবার আরও একটি কারণ আছে। বর্তমান যুগের ইতিহাস বিশেষ দেশের ইতিহাস নয়—মানব জাতির ইতিহাস। ১৯৫৭ সালে ভারতবর্ষে প্রলয়ঙ্কর কিছু ঘটিলে তাহার ধাক্কা গিয়া লাগিত সমস্ত পৃথিবীতে। এমন অবস্থায় স্বতন্ত্রভাবে ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষ কিছু ঘটা সম্ভব নয়। অতএব দাঁড়াইল এই যে, যাহা অসম্ভব, তাহা ঘটে নাই।

কিন্তু অন্যত্র এমন কিছু ঘটিয়াছে যাহা প্রায় অসম্ভব। ১৯৫৭ সালে এমন কিছু ঘটিয়াছে সমগ্র মানব জাতির পক্ষে যাহা স্মরণীয়—তাহা ভারতবর্ষে না ঘটিলেও ভারতবর্ষের। আগে বলিয়াছি এযুগে ইতিহাস অবিভাজ্য। ১৯৫৭ সালে মানুষ প্রথম মহাশূন্যে পদক্ষেপ করিয়াছে। পৃথিবী ও তাহার আকর্ষণ সীমার মধ্যেই এতকাল মানুষের অধিকার বিস্তৃত ছিল, এবারে সেই সীমা লঙ্ঘিত হইল, মানুষ এখন মহাশূন্যের অভিযাত্রী। তুলনায় কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার ছেলেখেলা; তুলনায় গ্যালিলিয়ো-র দূরবীক্ষণযোগে জ্যোতিষ্ক দর্শন কেতাবী ব্যাপার; ইহার একমাত্র তুলনা বামনের দ্বিতীয় চরণের দ্বারা মহাশূন্য অধিকার; ঐ পৌরাণিক নজিরটি ছাড়া রাশিয়ার মহাশূন্যে পদক্ষেপ তুলনা রহিত। এই কৃতিত্ব অবশ্যই রাশিয়ার; কিন্তু এই ঘটনা মানব ইতিহাসের; ইহার প্রভাবে মানুষের চিন্তা, চেষ্টা ও ইতিহাস নূতন বেগ ও নূতন দিগ্‌দর্শন লাভ করিবে; মানুষের ইতিহাস নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিবে এবং আশা করিতেছি যে, ভাঙ্গিয়া পড়িবে না। শূন্যে পদক্ষেপের পরিণাম মহাশূন্যে পদক্ষেপের বেলায় না দেখা দিক এই আশা করিব। কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত, এই মহাকৃতিত্বের অধিকারে ১৯৫৭ সাল মানুষের ইতিহাসে চিরকালের জন্য মুদ্রিত হইয়া গেল। এহেন স্মরণীয় বৎসরকে আজ বিদায় দিতে হইতেছে, এ প্রায় একমাত্র আদরের কন্যাকে পতিগৃহে রওনা করিয়া দিবার মতো প্রসন্ন পরিণাম কিন্তু আপাত শোকাবহ ব্যাপার।

কন্যা-বিদায়ের কথায় আর একটি বিদায়ের চিত্র মনে পড়িয়া গেল। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাসে বর্ণিত সেই বাহাদুর বাঙালী যুবকটির কথা, জাহাজঘাটায় রোরুদ্যমানা বর্মী মেয়েটির আঙুলে চুনির আঙ্‌টি লক্ষ্য করিয়া ক্রন্দনের ছলে যে বলিয়াছিল, ওরে রতনমণি, ওটাও খুলে দে নিয়ে যাই বেচ্‌লে না কোন্—ইত্যাদি। ১৯৫৭ সালের আঁচল হইতে, হাতবাক্স হইতে যাহারা যথেষ্ট সংগ্রহ করিয়াছে, তাহাদের ভাবটা, আহা আরো ক'টা দিন থাকলে আরো একটা increment পেতাম রে; ব্যাঙ্কের সুদ আরো কিছু বাড়ত রে; গ্র্যাচুইটির পরিমাণ আর একটু বেশি হ'ত যে; আহা আর একটা দাঁও কষলে মুনাফা কিছু বাড়াতে পারতাম যে,—ইত্যাকার। আমরা জাহাজঘাটের দর্শকের ভিড়, মুখে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া মনে মনে

বাহাদুরি দিতেছি। কিন্তু ঐ যা! এ যে উপমায় গোলমাল ঘটিয়া গেল। এখানে বিদায়ী ১৯৫৭ সাল, মানুষ তো নয়, কাজেই বছরের হাত হইতে কিছু খসাইয়া লইবার প্রসঙ্গ ওঠে না। বরঞ্চ বিদায়ী বছরটাই মানুষের কিছু কিছু খসাইয়া বিদায় লইতেছে। প্রত্যেকের জীবন হইতে একটা বছর খসাইয়াছে, সুগন্ধি কেশ তৈলের কৃপায় মাথার চুল খসাইয়াছে, কংগ্রেসের কিছু মেজরিটি খসাইয়াছে, কত অভিমানিনীর মল খসাইয়াছে, পুরাতন অট্টালিকার চূণ-বালির আস্তর খসাইয়াছে, কত কৃপণের পয়সা খসাইয়াছে, গাছের কত পাতা খসাইয়াছে, কত প্রৌঢ়ের দাঁত খসাইয়াছে, আর সর্বোপরি কমলাকান্তের জীর্ণ আফিঙ-কৌটার ঢাকনাটি খসাইয়াছে! হা রে দুর্বৃত্ত ১৯৫৭ সাল! যাইতেছ যাও, তোমার অনুজটিকে বলিয়া দিও সে যেন আসিয়া শান্তশিষ্ট আচরণ করে, রাজনৈতিক সর্দি অর্থাৎ cold war কিম্বা সর্দিগর্মি অর্থাৎ shooting war-এ আমাদের পীড়িত না করে—আর ১০৮ শ্রীশ্রী কৃষ্ণমাচারিকে একটু শুভবুদ্ধি যেন দেয়—তিনি যেন আমাদের কাছ হইতে "শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা" আদায়ে নিরস্ত থাকেন।

৭৫

ভবঘুরে-ভবঘরে

আজকাল সংবাদপত্র খুলিলেই চোখে পড়ে যে, ভবঘুরের দল ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। একটি দম্পতি জলেস্থলে উভচর এক হংস-যানে চাপিয়া মার্কিণ মুলুক হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া পড়িয়াছে, সময় লাগিয়াছে পাঁচ বছর। তাহারা ফিলিপাইন, জাপান হইয়া প্রশান্ত মহাসাগর পার হইয়া আবার মার্কিনে ফিরিবে, সময় লাগিবে, এক বছর হয়তো বা আরও পাঁচ বছর লাগিবে। আর একটি দম্পতি ৩০ ফুট লম্বা একখানা নৌকায় চাপিয়া পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হইয়াছে, এ পর্যন্ত তাহারা তেত্রিশ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছে। ইহারা সকলে পথে, জলে ও স্থলে যে সব বাধাবিঘ্ন লঙ্ঘন করিয়াছে তাহার তুলনায় রবিনসন্ ক্রুশোর কাল্পনিক এবং মার্কোপোলোর বাস্তব বাধাবিঘ্ন একেবারেই নগণ্য। অবশ্য এ দুটি দম্পতিকে ঘর-ছাড়া বলা

যায় কি না সন্দেহ। শামুক যেমন নিজের ঘরখানি পিঠে বহন করিয়া চলাচল করে, ইহাদেরও দেখিতেছি তেমনি অভ্যাস; ঘর মানেই ঘরণী, সংস্কৃতে গৃহিণীকেই গৃহ বলা হইয়াছে, পুরুষ দুইজনে সস্ত্রীক পথে বাহির হইয়াছে; খুব সম্ভব ইহারা অপর সংস্কৃত শ্লোকটি জানেন না, 'পথি নারী বিবর্জিতা।' কিছুদিন আগে আর একটি দম্পতি মোটর-যানে অষ্ট্রেলিয়া যাইবার পথে ভারতে আসিয়াছিল। গত বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে সাইকেলচারী, মোটরচারী, পদচারী ভবঘুরের সংখ্যা অবিরল হইয়া উঠিয়াছে, হঠাৎ মনে হয় ঘর নাই বলিয়াই ইহারা যেন ভবঘুরে বা ভবঘরে হইয়া পড়িয়াছে। কেহ কেহ বলিবে কথাটা মিথ্যা নয়, যুদ্ধে যে সংখ্যক গৃহ নষ্ট হইয়াছে ভবঘরে না হইয়া আর উপায় কি? প্রত্যেক বিশ্বযুদ্ধের পরেই কি এমন ঘটিয়া থাকে? প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে কি ঘটিয়াছিল এখন মনে পড়িতেছে না, কিন্তু নৈপলিয়নিক যুদ্ধশেষে লর্ড বায়রণ এমনি এক ভবঘুরেপনায় বাহির হইয়াছিলেন যাহার বার্তা চাইল্ড হ্যারল্ড কাব্যে লিখিত আছে।

এখন এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাস্য দুটি, এই ব্যাপক ভবঘুরেপনার কারণ কি, আর ইহার সহিত বিশ্বযুদ্ধের সম্পর্ক আছে কি না! মানুষে পথে যে অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট সহ্য করিতেছে—কেন? হিমালয়ের দুর্গম শৃঙ্গে আরোহণ, বিমানযোগে মেরু অতিক্রম প্রভৃতি প্রথম আবিষ্কার গৌরবে গৌরবান্বিত, তজ্জন্য কষ্ট স্বীকার বোধগম্য, কিন্তু ৩০ ফুট ডিঙি নৌকায় ৩১ ফুট হাঙরের দ্বারা অনুসৃত হইয়া আটলান্টিক অতিক্রম! মনে হয়, যেন মানুষ ঐ রাক্ষুসে হাঙরের চেয়েও ভয়াবহ কোন প্রাণীর কবল হইতে পলায়নের চেষ্টা করিতেছে। কি সেই প্রাণী? মানুষের নিজের স্বরূপ। মানুষ আজ নিজের কাছে হইতে নিজে পলাইবার চেষ্টায় নিযুক্ত। ঐ দুরূহ চেষ্টায় বিমানের গতিকে বাড়াইতে বাড়াইতে শব্দের গতিকে সে লঙ্ঘন করিল; চন্দ্রলোক বা গ্রহান্তর যাত্রার উদ্যোগ প্রায় সমাপ্ত করিয়া আনিল; সমুদ্রের গভীরতর গর্ভের দিকে অবতরণে তাহার উদ্যমের সীমা নাই। মুখে যতটা সে প্রগতি বলুক কার্যতঃ সে পশ্চাদ্‌গতিতে নিযুক্ত, জগৎ জুড়িয়া আজ এক পলায়নী মনোবৃত্তির লীলা। এইতো গেল প্রথম প্রশ্নের উত্তর। দ্বিতীয় প্রশ্ন হইতেছে, বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধটা কি? পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধে মানুষ নিজস্ব ভয়ঙ্কর মূর্তিটা লক্ষ্য করিয়াছে, বিশ্বযুদ্ধের দেয়াল জোড়া প্রকাণ্ড

আরসিতে মানুষ নিজের রাক্ষুসে মূর্তিটা দেখিয়া এমনি বিহ্বল, এমনি আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে যে, এখন বীরত্বের অভিনয় ফেলিয়া উর্ধ্বশ্বাসে পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে, পালাইবার সময় যে কোন যানই মহাযান, যে কোন উপায়ই মহদুপায়, যে কোন পন্থাই শ্রেষ্ঠ পন্থা ; পলায়নপর ব্যক্তি কি ট্রেনের ক্লাসাক্লাস বিচার করে, যে গাড়ীখানা সম্মুখে পায় উঠিয়া পড়ে। মানুষের ইতিহাসে আজ 'ডানকার্ক ইভ্যাকুয়েশনে'র পালা। ছত্রভঙ্গ পরাজিত মানুষ আজ প্রাণভয়ে পলায়নপর, যে কোন যান পায় নাই, সে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছে, অর্থাৎ গত যুদ্ধের পর হইতে আত্মহত্যার সংখ্যাও অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

এইভাবে না দেখিলে এই সব ব্যাপক এডভেঞ্চারের অর্থ আবিষ্কার সম্ভব নহে। এ সব আবিষ্কার-যাত্রা নয়, বাণিজ্যযাত্রা নয়, গবেষণার যাত্রা নয়, তবে এ সব কি? এ সব মানুষের নিজের কাছ হইতে পালাইবার চেষ্টা। যদি এই অসম্ভব কার্যে সাফল্য তাহার না ঘটে তবে একথা নিশ্চয় যে, নিজের বীভৎস মূর্তিতে আতঙ্কিত হইয়া সে প্রাণ হারাইবে।

৭৬

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ

অনেকে বলিতেছেন যে হঠাৎ কমলাকান্তের আসর এমন নীরস হইয়া উঠিল কেন? কমলাকান্তের রসের সাগরে ভাটার টানের কারণ তাঁহারা নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না। কাজেই স্বয়ং কমলাকান্তকে অগ্রসর হইয়া আসিতে হইল। আশা করি, তাহার উত্তরে আসরের নীরসতার প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারা যাইবে, আর খুব সম্ভব তাহার অধিকও কিছু বুঝা যাইবে।

প্রতিনিয়ত নূতন নূতন খবর আসিতেছে। একখানা তেজস্ক্রিয় মেঘ ইংলণ্ডের উপরে দেখা গেল। ওদিকে জাপানে চাউল, মাছ, মায় গোরুর দুধ তেজস্ক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। এদেশও বাদ পড়ে নাই। কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের গবেষকগণের অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারিলাম যে, কাহার

রান্নাঘরের ধোঁয়া তেজস্ক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, কাহার বাগানের টোমাটো তেজস্ক্রিয়ায় গাঢ়তর রক্তাভ হইয়াছে। এখন এমন সর্বাঙ্গীণ তেজস্ক্রিয়া কখনো নিষ্ফল হইবার নয়। মানুষের আচার, ব্যবহার, কথাবার্তা, শিল্প, সাহিত্য সমস্তই তেজস্ক্রিয়ার প্রভাবে তেজ বিকিরণ করিতে সুরু করিয়াছে। এ হেন অবস্থাতে কমলাকান্তের আসরই বা কেন তেজনিষ্ক্রিয় থাকিবে? "নিখিল জগৎ ধরা পড়ে গেল, তুমি আমি কোথা আছি!"

পশ্চিম বঙ্গের বিধানসভার জন দুই সদস্য তেজস্ক্রিয়ার ফলে হঠাৎ কাব্য বিকিরণ করিতে সুরু করিয়াছেন। এ রোগ তাঁহাদের যে ছিল শত্রু-মিত্র কেহই জানিত না। সে কাব্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন তুলিলে বলিব যে, Atomic Poetry ঐ রূপই হয়। ওদিকে খবর দেখিতেছি যে, পাঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি জ্ঞানী গুরুমুখ সিং নিজের নাম ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন। স্বনাম বলিতে গিয়া তিনি মুসাফির সিং বলেন। ইহাও তেজস্ক্রিয়ার প্রভাব, লোকভেদে প্রকাশ ভিন্ন। আবার দেখুন না কেন, পশ্চিম বঙ্গ বিধানসভায় স্বয়ং শ্রীভগবান কি বেকায়দায় পড়িয়াছেন। এক দল বলিতেছেন যে, তিনি যখন সর্বব্যাপী, তখন বিধানসভায় তাঁহার অস্তিত্ব অন্যায় নয়। অপর দল বলিতেছেন যে, হোন না কেন তিনি শ্রীভগবান্, বিধানসভায় তিনি অনধিকার প্রবেশ করিয়াছেন। কমলাকান্ত শেষোক্ত দলকে সমর্থন করে, কেন না শ্রীভগবান্ যখন নির্বাচনে জয়লাভ করেন নাই, তখন বিধানসভায় তাঁহার প্রবেশ অন্যায়। এখন এই বিতর্কের মূলেও আছে তেজস্ক্রিয়া। তেজস্ক্রিয়ার সূক্ষ্ম প্রভাবে মস্তিষ্কের সুপ্ত তত্ত্ববুদ্ধি ঠেল্ মারিয়া উঠিয়া এই বিপাক ঘটাইয়াছে। এমন দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি দেওয়া যায়, পুঁথি বাড়াইয়া লাভ নাই। বলা বাহুল্য সার্বজনীন তেজস্ক্রিয়ার ফলেই কমলাকান্তের wit শুকাইয়া ইট হইয়া উঠিয়াছে, humour নিরন্তর মার্ মার্ রব করিতেছে। আশা করি এবারে ব্যাপারটা স্পষ্ট হইল।

ওদিকে চার্চিল ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, আগামী ৩।৪ বছরের মধ্যে যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু তারপরে কি হয় বলা যায় না। কিন্তু সত্যই যদি যুদ্ধ বাধে, তবে 'তারপর' আর নাই, ওখানেই 'আমার কথাটি ফুরালো, নটে গাছটি মুড়ালো'! একেবারে সমস্ত গল্পের শেষ! এখন চার্চিলের ভবিষ্যদ্বাণীতে যদি কিছু সার থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে, মানব জাতির

পরমায়ু আর বড় জোর ৩।৪ বছর। দশটি প্রমাণ সাইজের বোমাতেই নাকি কার্যোদ্ধার হইবে। (তবে আর ৫।১০ হাজার তৈয়ারি করিবার সার্থকতা কি?)। এ যে উইল করিবার এবং হরিনাম করিবার সময়। অনেকে বলিবেন, ও দুটাও অত্যুক্তি, কেন না কাহার জন্য উইল করিবে, আর ডুবিয়াই যখন গিয়াছি, তখন হরিনাম করিয়াই বা কি ফল? যাই হোক্, উইল বা হরিনাম করিবার সময় হোক বা না হোক, রসিকতা করিবার সময় যে নয় তাহাতো শিশুতেও বোঝে! কমলাকান্তের উক্তি যে অত্যুক্তি নয়, তাহার দুটি প্রমাণ সংবাদপত্রে পাওয়া যাইবে। আসন্ন ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইবার আশায় আচার্য বিনোবা ভাবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে বলিয়াছেন; আর মার্কিণ অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্তা হাইড্রোজেন বোমার আক্রমণ ঘটিলে সকলকে মাটির মধ্যে গর্তের ভিতরে ঢুকিতে পরামর্শ দিয়াছেন। এখন এমন অবস্থায় wit হয়, না রসিকতা হয়, আপনারাই বলুন। আর যদি না রসিকতা করা যায়, তবে কি লোকে হৃদয়হীন পাষণ্ড বলিবে না? দুঃখের চেয়েও ভীষণ যদি কিছু থাকে, তবে তাহা অনিশ্চয়তা। মানুষের ইতিহাসে এমন অনিশ্চয়তার পর্ব আর আগে কখনো আসিয়াছে কি? সার্বজনীন ধ্বংস অদূরে দণ্ডায়মান তাহার সম্মুখে হাসিতে পারে, এমন শক্তি কমলাকান্তের নাই।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা দূরীভূত হইয়াছে; এমন কোন দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তি মনে করেন না, একথা সত্য। কিন্তু আশঙ্কা দূরীভূত না হইলেও যুদ্ধের উপলক্ষ্যের পরিবর্তন ঘটিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। কোরিয়া, মধ্যপ্রাচ্য বা অন্য কোন ভূখণ্ড এখন যুদ্ধের নিমিত্ত হইবে না মনে করা যাইতে পারে। তবে কি সেই নিমিত্ত, যাহা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ ঘটাইবে? কমলাকান্তের ভাষায় বলিব না, ছোট মুখে বড় কথা বলিয়া লোকে হাসিবে। অতএব বড় মুখের বড় কথা উদ্ধার করিয়া দিতেছি। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ-সভার সভাপতি নিশ্চয় একজন বড় লোক। তাঁহার কথাই বলি। নিউইয়র্কের ৯ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভার সভাপতি স্যার লেসলি মনরো বলিয়াছেন, ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের পূর্বে 'মহাশূন্যগামী অস্ত্র নিক্ষেপ' নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিতে হইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, চন্দ্রলোক ও মহাশূন্যের অধিকারের প্রশ্ন ইহার

সঙ্গে জড়িত। তিনি বলিয়াছেন যে, এ দায়িত্ব রাষ্ট্রসঙ্ঘের। রাষ্ট্রসঙ্ঘ ইহার একটা সুব্যবস্থা করিতে পারিবে বলিয়া তিনি আশা রাখেন। আর যদি রাষ্ট্রসঙ্ঘ উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিতে পারে, তবে পৃথিবী মহাসঙ্কটের সম্মুখীন হইবে। ইহাই রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভাপতির বক্তব্য। তৎকথিত মহাসঙ্কট তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ (বা শেষ যুদ্ধ) ছাড়া আর কিছুই নয়।

এখন রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভাপতি দায়িত্বহীন ব্যক্তি নন, কমলাকান্তের মতো আফিঙখোর কলমবাজ নন, তাঁহার কথা লঘুভাবে উড়াইয়া দেওয়া উচিত হইবে না। তাই বলিয়াছিলাম, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা দূর হয় নাই। উপলক্ষ্যে বদল ঘটিয়াছে। সেই উপলক্ষ্য চন্দ্রলোকের অধিকারের সঙ্গে জড়িত। বুঝাইয়া বলি। মনে করুন, 'ক' 'খ' 'গ' তিনটি মহারাষ্ট্র। সকলেই রকেটযোগে চন্দ্রলোকে পৌছিতে চেষ্টা করিতেছে। 'ক' সকলের আগে চন্দ্রলোকে রকেট ফেলিতে সমর্থ হইল। তখন স্বভাবতই 'ক' চন্দ্রলোকের অধিকার দাবী করিল। এ দাবী আজগুবি নয়—ইহার অনুকূলে পার্থিব নজীর আছে। যে রাষ্ট্র প্রথম উত্তর মেরু বা দক্ষিণ মেরুতে পৌছিতে সক্ষম হইয়াছে, সেখানকার অধিকার সে অর্জন করিয়াছে, অপরেও স্বীকার করিয়া লইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া, ফিজি, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতির অধিকারও এই নীতিতে স্বীকৃত হইয়াছে। তবে চন্দ্রলোকের বেলায় তাহা স্বীকৃত না হইবে কেন? কিন্তু 'ক' যদি স্বত্ব-স্বামিত্ব দাবী করে, 'খ' ও 'গ' তাহা সহজে স্বীকার করিয়া লইবে না। সকলেই এখন বুঝিয়াছে যে, মহাশূন্যের অধিকারের উপরে পৃথিবীর অধিকার নির্ভর করিতেছে। 'ক' জানে যে, তাহার সীমান্ত মহাশূন্য, 'খ' ও 'গ' প্রভৃতিও তাহা জানে। সকল রাষ্ট্রের এখন একটিমাত্র সীমান্ত এবং তাহা মহাশূন্য—চন্দ্রলোক তাহার প্রথম ঘাটি। কাজেই কোন রাষ্ট্র চন্দ্রলোকে অপরের স্বামিত্ব সহজে স্বীকার করিয়া লইবে না। তখন কি ঘটিবে? তখন 'ক'-র বিরুদ্ধে 'খ' ও 'গ' মিলিত হইবে এবং তাহাকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিবে। তাহা হইলেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল, আর তাহার পরিণাম তো সুনিশ্চিত। এখন প্রশ্ন, পরিণাম যদি এতই সুনিশ্চিত হয়, তবে লড়াই করিতে যাইবে কেন? উত্তরটা মনস্তত্বঘটিত। "শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃপরম্"। অতএব লড়াই না বাধিবার কারণ নাই। আর একবার লড়াই বাধিলে পৃথিবীর সভ্যতা (!) মায় পৃথিবীর নাশ অবশ্যম্ভাবী। কাজেই

বুঝা যাইতেছে যে পৃথিবীর যুদ্ধ আর পৃথিবীঘটিত কারণে বাধিবে না, বাধিবে চাঁদের জন্যে। ফলে যেখানকার চাঁদ সেখানেই থাকিবে—যেখানকার পৃথিবী সেখানে থাকিবে মহাশূন্যের শূন্যতা। ইহারই নাম অদৃষ্টের পরিহাস, উপগ্রহের জন্য গ্রহের ধ্বংস, 'ফাউ'-এর লোভে আসল খোয়ানো। মানুষ বুদ্ধিমান জীব বটে!

৭৭

ওস্তাদের মার

রাশিয়ার উপগ্রহ উৎক্ষেপের ক্ষোভে মার্কিণ মুল্লুক 'ওভার একটিভ' হইয়া বসিয়াছে। তাহারা নাকি এমন উল্কা নিক্ষেপ করিয়াছে যাহা চন্দ্রলোক তো সামান্য কথা একেবারে সূর্যলোক অতিক্রম করিয়া সৌর-জগতের বহির্ভূত মহাব্যোমে চলিয়া গিয়াছে। নাও এখন ঠেলা সামলাও। যদি এখন তোমাদের দূরবীক্ষণ সেগুলি দেখিতে না পায় তবে বুঝিতে হইবে যে, উল্কা-কণিকাগুলি দূরবীক্ষণের পাল্লা ছাড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে। প্রমাণ করিবার উপায় না থাকায় সিদ্ধান্ত দৃঢ়তর হইবে। মার্কিণ মুল্লুক বলিবে রাশিয়ার উপগ্রহ ধারে কাছে তাই চোখে দেখা যায়, আমাদের উল্কা মহাব্যোমের পথিক, দূরবীণের সাধ্য নেই ধরে। সারা আকাশ খুঁজিয়া না পাইলেই যে মিথ্যা বলিবে সে পথ বন্ধ করিয়া হিসাব করা হইয়াছে। ওস্তাদের মার আর কাহাকে বলে। এই ঘটনার অনুরূপ আর একটি ব্যাপার ঘটিয়াছিল আমাদের গাঁয়ে। ঘুড়ির প্রতিযোগিতা চলিতেছে। আকাশে প্রতিযোগিগণের ঘুড়ি উড়িতেছে। পাড়ার গণশাও ঘুড়ি উড়াইতেছে। সকলে বলিল, আরে গণশা তোর ঘুড়ি কোথায়? গণ্শা বলিল, দাদা আমার ঘুড়ি কি দেখিবার উপায় আছে। কেন? কেন আর কি, চোখের সীমার বাহিরে উঠিয়া গিয়াছে। গণ্শা পুরস্কার পাইয়াছিল কি না মনে নাই, কিন্তু তাহার কথাটা মনে আছে, এখন মার্কিণী উল্কা প্রসঙ্গে মনে পড়িল। সংবাদটি সকলের চোখে পড়ে নাই আশঙ্কা করিয়া এখানে তুলিয়া দিতেছি :—

"বেডফোর্ড, মাসাচুসেটস. ২২শে নবেম্বর—মার্কিণ বিজ্ঞানীরা মহাশূন্যে অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা উৎক্ষেপণ করিয়াছে এবং ঐগুলির মধ্যে কয়েকটি হয়তো এখনও সৌরলোকের মধ্য দিয়া দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

রাশিয়া কর্তৃক প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহটি মহাকাশে নিক্ষিপ্ত হইবার ১২ দিন পর—১৬ই অক্টোবর তারিখের এই উৎক্ষেপণের সংবাদ এখানকার বিমান-বাহিনীর গবেষণা কেন্দ্রে গত রাত্রে ঘোষণা করা হইয়াছে।"

আরও আছে :—

"বিমানবাহিনীর অন্যতম অসামরিক পদার্থবিজ্ঞানী মিঃ জেরোম প্রেসম্যান বলেন, উক্ত টুকরাগুলির মধ্যে কয়েকটি হয়তো ভূপৃষ্ঠ হইতে ২২ কোটি মাইল পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে—অবশ্য যদি ৯ কোটি মাইল দূরবর্তী সূর্য কর্তৃক আকৃষ্ট না হইয়া থাকে।

কিন্তু অন্যান্য বিজ্ঞানীগণ ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁহারা বলেন যে তাঁহাদের হিসাব অনুযায়ী ঘণ্টায় ৩০ হাজার মাইলের প্রারম্ভিক গতি বিশিষ্ট ঐ টুকরাগুলির পক্ষে মাত্র ২ কোটি ৬৬ লক্ষ ৪০ হাজার মাইল দূর পর্যন্ত উৎক্ষিপ্ত হইবার কথা।"

কিন্তু ইহাই সব নয়। উক্ত প্রজেক্টের কর্তা জানাইয়াছেন, যে-রকেট সাহায্যে উল্কা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহার যন্ত্রপাতিগুলি প্যারাশুটের সাহায্যে ভূপৃষ্ঠে ফিরিয়া আসিয়াছে।

সবই হইল কিন্তু চোখে দেখিতে না পাওয়ায় লোকের বিশ্বাস হইল না। ফলে মার্কিণের উল্কা ফাঁকা গুলীর আওয়াজের মতো নিরর্থক হইয়া রহিল।

ইদানীং আবার আকাশে যত্রতত্র রহস্যময় পদার্থ সকল দৃষ্ট হইতেছে, কোনটা গোলাকার, কোনটা তিন কোণা, কোনটা পিরামিড আকৃতি। কেহ কেহ আবার ঐ সব আকাশচারী পদার্থে মানুষও দেখিতে পাইয়াছে (কি আশ্চর্য!) ; ঐগুলির দীপ্তিতে নাকি চোখ অন্ধ হইয়া যায় (তবে কি-ভাবে দেখিল সে প্রশ্ন তুলিব না) ; একজন নৌ-সেনানী বলিয়াছে উক্ত পদার্থ সহসা দিগন্তে মিলাইয়া গেল (কোথায় মিলাইয়া যাওয়া উচিত ছিল) ! এদেশেও নাকি অনেকে আকাশে ইদানীং রহস্যময় যানবাহন দেখিতে পাইতেছে, (বে-আইনি মাদক দ্রব্য সম্বন্ধে আবগারী বিভাগের কর্তব্য-

শিথিলতা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে)! মনে হইতেছে যে, রহস্যময় তুষার-মানব সন্ধানকারিগণ অপাতত রহস্যময় ব্যোমচর যানবাহন সন্ধানে প্রতিভা নিযুক্ত করিয়াছেন। যে কারণেই হোক মানুষ যে ঊর্ধ্বমুখী হইয়াছে ইহাই পরম আনন্দের বিষয়। কিন্তু একটা আশঙ্কাও আছে। মানুষের সেই গ্রীক জ্যোতিষীর দশা না হয়, যে ব্যক্তি গ্রহনক্ষত্রের পর্যবেক্ষণে ঊর্ধ্বমুখী হইয়া চলিতে চলিতে পায়ের কাছের খানায় পড়িয়া মরিয়াছিল। মানুষের সার্থকতা ঊর্ধ্বে নয়, দূরে নয়, আকাশে নয়, মহাব্যোমে নয়, তাহার একেবারে পায়ের কাছে। ঘরের আঙিনায় অত্যন্ত তুচ্ছবেশে দীনভাবে মহৎ সার্থকতা মানুষের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। হায়, কতদিন আর তাহা এমনভাবে উপেক্ষিত হইয়া থাকিবে।

৭৮

'শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর'

"ওয়ারশ, ১০ই সেপ্টেম্বর—বৃটিশ শ্রমিক নেতা শ্রীবিভান অদ্য বলেন, পশ্চিম এশিয়ায় আইসেনহাওয়ার পরিকল্পনা প্রয়োগের ফলে এমন সকল হাঙ্গামা ঘটিবে, যাহা শেষ পর্যন্ত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে পর্যবসিত হইবে।"

শ্রমিক নেতা মিঃ বিভান সব কথার উপরে জোর দিয়া উচ্চারণ করিয়া থাকেন, ওটা তাঁহার স্বভাব, খুব সম্ভব প্রচারধর্মী রাজনীতি কর্মের স্বাভাবিক পরিণাম। কিন্তু তৎসত্বেও তাঁহার বর্তমান বক্তব্যের মধ্যে গুরুতর সত্য আছে। মধ্যপ্রাচ্য সোভিয়েট-মার্কিণ রেষারেষির পাল্লায় এমন অবস্থায় পৌছিয়াছে, যে কোন মুহূর্তে বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়া গেলে কেহ বিস্মিত না হইয়া মনে করিবে যে, সাধনোচিত ফল ফলিল। কিন্তু শুধু মধ্যপ্রাচ্য কেন প্রায় সমস্ত পৃথিবীটাই এইরকম অনিশ্চিত অবস্থায় পৌছিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ বহন করিয়া কোরিয়া, ফরমোজা, দূরপ্রাচ্য, মিশর, হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে কত সঙ্কটই না দেখা দিয়াছে। এ যেন সর্ব অঙ্গে ক্ষত, ঔষধ লাগাইবে কোথায়?

কিন্তু দশবার বিপদ কাটিয়া গিয়াছে বলিয়া যে একাদশবারেও বিপদ কাটিয়া যাইবে, এমন না হইতেও পারে। বস্তুতঃ এমনি করিয়াই বিশ্বযুদ্ধ বাধে। দশবার কাটিয়া যায়, একাদশবারে আগুন জ্বলিয়া ওঠে। হিটলারেরও এই ভুলটি হইয়াছিল। রাইনল্যাণ্ডে প্রবেশ, অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া বেশ একরকম কাটিয়া গেল, পোল্যাণ্ডের বেলায় আর কাটিল না, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়া গেল। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধও এই একই রীতিতে বাধিবে। হাঙ্গারী, মিশর কাটিয়া গেল, সিরিয়ার বেলায় হয়তো কাটিবে না। মিঃ বিভানের কথা এই পর্যন্ত ঠিক। কিন্তু সব দায়িত্ব যে একক মার্কিণের এ কথা স্বীকার করা যায় না। পৃথিবীর প্রধান দুই মুল্লুককে—মার্কিণ ও সোভিয়েট রাজ্যকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্ভাবনার দায়িত্ব বণ্টন করিয়া লইতে হইবে। তবে সে দায়িত্ব সমান-সমান না দশ আনা ছ আনা, সে বিচারের ভার ঐতিহাসিকগণ (তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ অন্তে কেহ যদি থাকেন) লইবেন। আমরা এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, "দ্বৌ অপি অত্র আরণ্যকৌ।"

ইতিহাসের বড় বড় যুদ্ধগুলা একাধারে হিসাব ও হিসাব ভুলের বিরুদ্ধ যোগাযোগের ফলে ঘটিয়া থাকে। সঙ্কটসৃষ্টিকারী ভাবিয়া থাকে যে, দশবার বিপদ যখন কাটিয়া গিয়াছে, একাদশবারেও কাটিবে। কাটে না। ইহাই বে-হিসাবের অংশ। আর হিসাবের অংশ হইতেছে যে, যুদ্ধে নামিবার সময়ে উভয় পক্ষই হিসাব করিয়া দেখে যে, পরিণামে তাহার জয় অনিবার্য। ব্যবসায়ে নামিবার আগে আনাড়ি যেমন খাতায় কলমে লাভের মোটা অঙ্কের মাকাল ফল দেখিয়া উদ্বাহু হইয়া উঠে—তেমনি আর কি।

বর্তমান ক্ষেত্রে হিসাব ভুলের কথা বলিয়াছি। এবারে হিসাবের কথা। 'চরমাস্ত্র' আবিষ্কার করিয়া দুই পক্ষই ভাবিতেছে তাহার জয় অনিবার্য। কিন্তু একথাও সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছে যে, এবারে যুদ্ধান্তে বিজয়ী পরাজিত থাকিবে না, সকলেই ঘায়েল হইবে। এ যেন ঘটোৎকচের কৌরব পক্ষ পাণ্ডব পক্ষ চাপিয়া পতন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, শোচনীয় পরিমাণ সুনিশ্চিত জানা সত্ত্বেও পক্ষগণ নিবৃত্ত হয় না কেন? উত্তর সহজ, সরল এবং অতিশয় পুরাতন রিপুর তাড়না। একপক্ষে লোভ, অন্যপক্ষে বিদ্বেষ তাড়না করিতেছে, সঙ্ঘর্ষ না বাধিয়াই বা কি উপায়? মনের মধ্যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ অনেকদিন বাধিয়া গিয়াছে, এখন বাহিরে আসিবার অপেক্ষা মাত্র।

পাঠক হয়তো বলিবেন, সমস্তই বুঝিলাম, কিন্তু এসব লিখিবার উদ্দেশ্য কি ? প্রথম উদ্দেশ্য হইতেছে যে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিবে না, এই মোহ সাকুল্যে ত্যাগ করিতে হইবে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য যুদ্ধ বাধিলে কোন রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকিতে পারিবে না—ইহা বুঝাইয়া দেওয়া। আর তৃতীয় উদ্দেশ্য হইতেছে যে, যুদ্ধান্তে পৃথিবীর যে কল্পনাতীত ভয়াবহ অবস্থা হইবে, বুঝাইয়া দেওয়া। সমস্ত শুনিয়া পাঠক শুধাইতে পারেন, বুঝিলাম তো সব, এখন করিতে হইবে কি ? করিবার কিছুই নাই, যতদিন যুদ্ধ বাধিয়া না যায়, বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। আর সম্ভব হইলে অশুভস্য কালহরণ নীতি অবলম্বন করিতে হইবে, ভারত সরকার যাহা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু আসল কথা এই যে, অলীক শান্তি সম্বন্ধে মনে কোন মোহ রাখা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

৭৯

দানবের গ্রাস

ইংলণ্ডের ল্যাঙ্কাশায়ার হইতে একটি শোচনীয় সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এক দম্পতি তাহাদের তিনটি অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকন্যাকে নিহত করিয়া নিজেরা আত্মহত্যা করিয়াছে। স্ত্রীলোকটির লিখিত পত্র হইতে জানা যায় যে, আসন্ন আণবিক যুদ্ধের সর্বব্যাপী মৃত্যু-বিভীষিকা হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই মর্মান্তিক উপায়ে সপরিবারে তাহারা সংসার হইতে বিদায় লইয়াছে। আণবিক বিশ্বযুদ্ধ কোন কোন মহলে যে ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছে বর্তমান ঘটনা তাহার একটি শোচনীয় প্রমাণ। কিন্তু উক্ত দম্পতিকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। কিছুকাল হইতে একদল বৈজ্ঞানিক ও রাজনীতিক রসসাহিত্যিকদের কলম কাড়িয়া লইয়া আণবিক বিভীষিকার যে রোমাঞ্চকর বর্ণনা লিখিতে সুরু করিয়াছিলেন তাহাতে মাথা ঠিক রাখা সহজ নয়। আণবিক যুদ্ধ কিরূপ ভয়াবহ হইবে জানি না, কিন্তু তাহার বর্ণনাটাও যে কম ভয়াবহ নয় প্রমাণ হইয়া গেল।

অনেকেই বলিবেন যে, ঐ দম্পতির মাথা খারাপ, নহিলে এমন কাণ্ড

করিয়া বসিত না। কিন্তু বস্তুতঃ ইহাই কি একমাত্র সত্য? উহাদের মাথা খারাপ হইয়াছিল? এমন হওয়া কি একেবারেই অসম্ভব যে, উহারাই সত্যকার প্রকৃতিস্থ—মাথা খারাপ আমাদের যাহারা আণবিক বজ্র সমুদ্যত দেখিয়াও বেশ দিনগত পাপক্ষয় করিয়া জীবন কাটাইতেছি। একটু বিচার করিয়া দেখা যাক।

কেহ হয়তো মনে করিবেন যে, আমি যুদ্ধবাজ জঙ্গীপুরুষ বা যুদ্ধ বাধিলে আমার লাভবান হইবার আশা আছে বা আমি যুদ্ধকে কাম্য মনে করি। আমি মনে করি যে, সমষ্টিগত নির্বুদ্ধিতার নাম যদ্ধ, বিশ্বগত নির্বুদ্ধিতার নাম বিশ্বযুদ্ধ। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বিশ্বাস করি, এ যুগে সব যুদ্ধই গৃহযুদ্ধ, আবার সব যুদ্ধেই বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য, অন্ততঃ নিবার্য মনে করিবার কোন কারণ এ পর্যন্ত পাই নাই। এমন কোন দুঃসাহসিক দেখিলাম না যে, সে মনে করে যুদ্ধ নিবার্য হইয়া উঠিয়াছে, বড় জোর মনে করে যাহা অনিবার্য তাহাকে যতদিন স্থগিত রাখা যায় ততদিনই মঙ্গল, অশুভস্য কালহরণ নীতি আর কি! কিন্তু অশুভস্য কালহরণ সব সময়ে কি ভালো? গায়ে অস্ত্রোপচারের আবশ্যক বুঝিয়াও রুগী আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু করিয়া কালহরণ করে। অবশেষে তাহাকে অস্ত্রোপচার সহিতেই হয়—কিন্তু হয়তো তখন তাহাতে আর উপকার দর্শে না। বিশ্বযুদ্ধের বেলাতেও (ব্যাপারটা বৃহৎ অস্ত্রোপচার ছাড়া আর কিছুই নয়) বিশ্ববাসী ঐ পন্থা গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু ফল কি ফলিতেছে, ভালো না মন্দ। দু'একটা তথ্য দেখা যাক। ১৯৪৪ সালে বিশ্বযুদ্ধ থামিলে হিরোশিমা-নাগাসাকিতে আণবিক বোমা পড়িত না। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত বিশ্বযুদ্ধ চলিলে আর আণবিক বোমা নয় হাইড্রোজেন বোমা পড়িত। আর যদি ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলিত খুব সম্ভব কোবাল্ট (cobalt) বোমা পড়িত। তবেই দেখা যাইতেছে যে, যতই দিন যাইতেছে অস্ত্র তত ভীষণতর হইতেছে। আর দশ বছর পরে বিশ্বযুদ্ধ বাধিলে আরো যে কি মারাত্মক অস্ত্র আবিষ্কৃত হইবে কেহ জানে না, কিন্তু ইহা এক প্রকার সুনিশ্চিত যে, অস্ত্রের ধ্বংসকারিতা অনিবার্যবেগে বাড়িয়া চলিয়াছে। অনেক বৈজ্ঞানিক বলেন যে, এই মুহূর্তে বিশ্বযুদ্ধ বাধিলে মনুষ্যজাতির বারো আনা চোদ্দ আনা লোপ পাইবে, ইতস্ততঃ কোথাও ছোটখাটো সম্প্রদায় হিসাবে মানুষ টিকিয়া থাকিবে। কিন্তু আর দশ বছর পরে বিশ্বযদ্ধ বাধিলে মানুষের সাকুল্য লোপ পাইবার ষোল আনা সম্ভাবনা।

এরকম দুটি ভিন্ন সম্ভাবনার মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয়ঃ? বর্তমান মুহূর্তে না দশ বৎসর পরে বিশ্বযুদ্ধ? অস্ত্রোপচার যদি নিশ্চিত কর্তব্য হয় তবে যত শীঘ্র হইয়া যায় ততই মঙ্গল নয় কি? পৃথিবীর কোন দূরপ্রান্তে স্বল্পসংখ্যক মানুষ যদি টিকিয়া থাকে তাহাদেরই উপরে ভার পড়িবে সভ্যতা বজায় রাখিবার, খুব সম্ভব তাহারা আবার যাযাবর স্তর হইতে বা কৃষি স্তর হইতে যাত্রা সুরু করিবে, যন্ত্রশিল্পের স্তরে আসিয়া পৌঁছিতে দেড় হাজার দুই হাজার বছর লইবে। তাহা ছাড়া তখন স্থানাভাব খাদ্যাভাব না থাকায় জীবনযুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হইবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হইবে।

বহু যুগের সাধনায় ও দুষ্কৃতির চাপে যে-যুদ্ধ মানুষ অনিবার্য করিয়া তুলিয়াছে, দলবদ্ধভাবে শান্তিহুঙ্কার তুলিয়া বা পায়রা উড়াইয়া বা শান্তিসনদে নামসহি যাচিয়া বা সকাল বিকালে ঘণ্টা দুই সুতা কাটিয়া তাহা নিবারণ করা সম্ভব? বিধাতা এমন নির্বোধ নন। ভাবালুতা দিয়া নিষ্ঠুরতার প্রতিকার হয় না। অনিবার্যের জন্য প্রস্তুত হওয়াই এখন একমাত্র কর্তব্য। এইজন্যই উক্ত দম্পতিকে প্রকৃতিস্থ বলিয়াছিলাম। আমরা যখন "চালাকির দ্বারা মহৎ কার্য" (যুদ্ধরোধ) সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছি, তখন ঐ দম্পতি প্রকৃতিস্থের মতো ব্যবহার করিয়াছে। স্বেচ্ছায় মৃত্যুর গ্রাসে পরিণত হইয়া তাহারা আণবিক দানবকে গ্রাসে বঞ্চিত করিয়া গেল। প্রকৃতিস্থতার আর কি লক্ষণ সম্ভব?

৮০

প্রলয়-নাচন

কয়েকদিন আগে একজন মার্কিণ বৈজ্ঞানিক প্রকাশ করিয়াছেন যে, উত্তর মেরুর তুষার রাজ্যে গোটাকতক হাইড্রোজেন বোমা নিক্ষেপ করিলেই অনায়াসে কার্যোদ্ধার হইবে, আর অধিক প্রচেষ্টা করিতে হইবে না। তিনি বলিতেছেন যে, বোমার ঘায়ে উত্তর মেরু গলিয়া সমুদ্রে এমন বন্যা আসিবে যে লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক, প্যারিস প্রভৃতি শহর অতলে তলাইবে। এই প্রলয়

বন্যা কতদূর গড়াইবে, কলিকাতাবাসীর অবস্থা কি হইবে তিনি জানান নাই বটে, তবে অনুমান করা কঠিন নয়। জলের চাপে না মরিলেও বন্যাতাড়িত জনপ্রবাহের চাপে কলিকাতার তথা ভারতের প্রাণ কণ্ঠাগত হইবে। বন্যায় যেটুকু বাকি রাখিবে, বন্যার ডাকিনী যোগিনী অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী সেটুকু শেষ করিবে।

উক্ত বৈজ্ঞানিকের বিবৃতি পড়িয়া বুঝিলাম যে, রামে মারিলেও মারিবে, রাবণে মারিলেও মারিবে। অর্থাৎ আণবিক যুদ্ধের অনিবার্য পরিণাম প্রলয়, এবং তাহা হয় মহাপ্লাবনে আসিবে, নয় মহাদাহনে আসিবে। এখন আমাদের স্থির করিতে হইবে, ডুবিয়া মরা ভালো, কি পুড়িয়া মরা ভালো। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত রুচিভেদ দেখা দেওয়া অসম্ভব নয়, কাজেই ওটা 'ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ' বলিয়া ছাড়িয়া দিলাম।

আমাদের পুরাণেও প্রলয়ের দ্বিবিধ রূপই চিত্রিত আছে। প্রলয়কালে দ্বাদশ সূর্য উদিত হইয়া চরাচর দগ্ধ করিবে, আবার মহাপ্লাবনে চরাচর নিমজ্জিত হইবে, কেবল নারায়ণ বটপত্ররূপ Life-belt অবলম্বন করিয়া ভাসিয়া রহিবেন। বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত হাইড্রোজেন বোমার মধ্যে দুটি সম্ভাবনাই বিদ্যমান, এখন জনগণের যেরূপ ইচ্ছা ও অভিরুচি।

কলির চাণক্য রাজাজি অতিশয় মারাত্মক ব্যক্তি দেখিতেছি। তিনি এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, আণবিক বোমাগুলা লইয়া গিয়া দক্ষিণ মেরুতে নিক্ষেপ করো। এখন বুঝিতে পারিতেছি, তিনি কেন ঐরূপ বলিয়াছিলেন, তিনি আমাদের ডুবাইয়া মারিতে চান, কারণ খুব সম্ভব তাঁহার বিশ্বাস পুড়াইয়া মারার চেয়ে তাহা অধিকতর মনুষ্যোচিত। এ ছাড়া আর কোন নিগূঢ় অভিপ্রায় যদি তাঁহার মনে থাকেও তবে তাহা জানা যাইবে না, কারণ বর্তমানে রাজাজি B. C. G. টীকার বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

ধন্য হাইড্রোজেন বোমা! সংসারে তুমি অসাধ্য সাধন করিলে। শুনিতে পাই 'টাঘ' নামক অতি ভয়ঙ্কর এক শ্বাপদের ভয়ে বাঘ কম্পিত হয়, তিমিঙ্গিলের নাম শুনিলে অতল জলে বাস করিয়াও তিমির মুখ শুকাইয়া যায়। কিন্তু 'র‍্যাশানাল জীব' মানুষ এ দুয়ের চেয়েও ভয়ঙ্কর। আর সেই তাহারা আজ তোমার ভয়ে জেনিভায় সমবেত। মার্কিণ ও সোভিয়েট পরস্পর জ্ঞান বিনিময় করিতে উদ্যত; চীন হাতের তাস মার্কিণ বন্দী ছাড়িয়া দিতেছে; বুলগানিন

ইংলণ্ড ভ্রমণে যাইবেন; আবার একটু ইঙ্গিত পাইলে মার্কিণে যাইতেও তাঁহার আপত্তি নাই। ওদিকে তোমার শনিদৃষ্টির ভয়েই নেহরু সোভিয়েটে স্বাগত, বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভ তাঁহার পিছু পিছু ছুটিতেছেন। এ সব দৃশ্য দেখিয়া আমাদের দেশের লাল শালুরা আপাততঃ নির্বীর্য ও নীরব, 'হেমন্তের ভেক যথা জড়ত্বের কূপে'। হে হাইড্রোজেন বোমা তুমিই ধন্য। তুমি বামনাবতারের মতো অভ্যুদিত হইয়া তৃতীয় চরণ ভারে বলীর গর্ব দমিত করিয়াছ। আবার প্রয়োজন হইলে তুমিই বর্তমান সভ্যতার প্রস্তর-স্তম্ভ বিদীর্ণ করিয়া নৃসিংহ-মূর্তিতে হিরণ্যকশিপুর প্রাণনাশ করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। তোমার প্রথম সম্ভাবনায় তোমাকে দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে তুমি 'ধূমকেতুমিব কিমপি-করালম্'—আর এখন যুযুধানগণের তুষ্ণীম্ভাব দেখিয়া বুঝিতেছি যে, তুমি অকল্যাণের ছদ্মবেশে মূর্তিমান্ কল্যাণ। তোমার নিরপেক্ষ প্রভাবই তোমার শ্রেষ্ঠ বিভূতি, তোমার কাছে পক্ষাপক্ষ নাই, পড়িবার সময় ঘটোৎকচের মতো কুরুকুল পাণ্ডবকুল দুই-ই চাপিয়া প'ড়িবে। আর এমন স্পষ্ট সঙ্কেত সত্ত্বেও বীর-পুরুষগণের যথার্থ চৈতন্য যদি উদিত না হইয়া থাকে, তবে মানুষের সম্মুখে দুইটি প্রলয়পন্থার ইঙ্গিত লইয়া তুমি উপস্থিত হইবে, মহাপ্লাবন, না মহাদাহন! রাজাজি মহাপ্লাবন বাছিয়া লইয়াছেন, কিন্তু মহাদাহন বাছিলেই উচিত হইত, কারণ তাঁহার মতো বিদগ্ধ ব্যক্তি আজ পৃথিবীতে বিরল। যাক্ এ বিষয়ে সকলে একমত হইবেন, এমন আশা করা যায় না। তবে কমলাকান্ত ব্যক্তিগতভাবে এক সঙ্গে দুই-ই চায়, প্লাবন ও দাহন, কারণ সিদ্ধপুরুষ হইবার এমন সুযোগ আর আসিবে মনে হয় না।

৮১
ইতিহাসের কাঁটা

কয়েকদিন আগে রাষ্ট্রসঙ্ঘের পক্ষ হইতে একজন প্রতিনিধি কমলাকান্তের সঙ্গে 'ইণ্টারভিউ' বা সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছেন। তিনি আণবিক বোমা, নিরস্ত্রীকরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে কমলাকান্তকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। এখানে তাঁহার প্রশ্ন ও কমলাকান্তের উত্তর প্রদত্ত হইল। বলা বাহুল্য প্রশ্নোত্তরের সাকুল্য

প্রকাশ করিতে গেলে আস্ত একখানা মহাভারত লিখিতে হয়। তাহা ছাড়া প্রশ্নোত্তরের অনেকটা অংশ নিরাপত্তা সমস্যার সঙ্গে জড়িত—সে সব অংশ প্রকাশ সম্ভব হইল না।

প্রশ্ন—'Clean' আণবিকা আবিষ্কৃত হইলে অবস্থার উন্নতি হইবে কি?

উত্তর—'Clean' বা নির্বিষ অর্থাৎ তেজস্ক্রিয় ভস্মহীন আণবিক বোমা আবিষ্কৃত হইলে অবস্থার আরও অবনতি হইবে। এখনকার বোমায় তেজস্ক্রিয় ভস্মপাত হয় বলিয়া অন্যান্য দেশের অধিবাসিগণ আপত্তি করে। কিন্তু 'নির্বিষ' বোমা আবিষ্কৃত হইলে এরূপ আপত্তির কারণ না থাকায় অবাধে বোমার পরীক্ষা ও বৃহত্তর বোমার আবিষ্কার হইতে থাকিবে। তখন অবশ্য তেজস্ক্রিয় ভস্মপাতের আশঙ্কা থাকিবে না সত্য, কিন্তু চরম সর্বনাশের ভয়াবহতা আরও বাড়িয়া যাইবে না কি?

প্রশ্ন—আণবিক বোমার পরীক্ষা স্থগিত রাখা সম্বন্ধে আপনার মত কি?

উত্তর—ফাঁসির হুকুম স্থগিত থাকিলেই যে আসামী বেকসুর খালাস পাইল এমন মনে করিবার কারণ নাই।

প্রশ্ন—আংশিক নিরস্ত্রীকরণের উপকারিতা আপনি স্বীকার করেন কি না?

উত্তর—অবশ্যই স্বীকার করি। কম খরচে মানুষ মারাই উহার উদ্দেশ্য। কাজেই অর্থনীতির বিচারে উহা সর্বতোভাবে সমর্থনযোগ্য। মানুষ মারাও হইল আবার খরচও কমিল এরূপ এক ঢিলে দুই পাখী মারার নীতি প্রত্যেক রাষ্ট্রনায়ক স্বীকার করিতে বাধ্য।

প্রশ্ন—সাকুল্য নিরস্ত্রীকরণ ও স্থায়ী শান্তি কি সম্ভব?

উত্তর—আদৌ সম্ভব নয়। ইউরোপীয় ইতিহাসের আড়াই হাজার বছর লিখিত আকারে আছে। এই সময়ের মধ্যে ছোটয় বড়য় ৯০২টি যুদ্ধ এবং ১৬১৫টির অধিক বিদ্রোহ বিপ্লব অশান্তি ঘটিয়াছে। সোজা কথা এই যে, মানুষ যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু শেখে নাই, আর কিছু জানে না। মানুষের উন্নতি মানে যুদ্ধবিদ্যার উন্নতি। ট্রয়ের যুদ্ধকালে মানুষ যা খাইত, পরিত, যে গৃহে বাস করিত এখন তাহার কতটুকু উন্নতি হইয়াছে? অথচ ট্রয় যুদ্ধের তীর-ধনুক অসিভল্ল প্রভৃতি আজ আণবিক বোমায় পৌছিয়া গিয়াছে। বিজ্ঞান Biggun তৈয়ারি করিতেছে। এমন অবস্থায় আজ স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে মানুষে অত্যন্ত বেকার ও অসহায়বোধ করিবে।

প্রশ্ন—'বেকার ও অসহায়বোধ করিবে' কথাটা আর একটু বুঝাইয়া বলুন।

উত্তর—প্রত্যেক রাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক লোক সামরিক উৎপাদনে নিযুক্ত। এখন স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহারা বেকার হইবে। এই সমস্যার পূর্ণরূপ ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? একটা হিসাব ধরুন। একজন সৈন্যের পিছনে অন্ততঃ দশজন সামরিক বস্তু উৎপাদনকারী শ্রমিক। এক লক্ষ সৈন্য থাকিলে দশ লক্ষ সামরিক বস্তু উৎপাদনকারী শ্রমিক। এখন হিসাব করুন প্রত্যেক দেশে কত সৈন্য? শুনিতে পাই সোভিয়েট রাশিয়ায় প্রথম সারির সৈন্যসংখ্যা ১৭৫ ডিভিশন। এক ডিভিশনে অনধিক ২০ হাজার। এইরূপ কম বেশি প্রত্যেক রাষ্ট্রে। এখন পৃথিবীর সাকুল্য সৈন্যসংখ্যাকে দশ দিয়া গুণ করুন, সামরিক ব্যাপারে প্রত্যক্ষে পরোক্ষে কত লোক নিযুক্ত পাইবেন। দেখিতে পাইবেন যে প্রত্যেক দেশের শিল্প ব্যবস্থা ও অর্থনীতির ভিত্তি হইতেছে সামরিক ব্যাপার। ক্রমে ক্রমে এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ সেই ভিত্তিটাকে যদি বাতিল করিয়া দেন তবে পৃথিবীতে এমন অশান্তি, বেকারী ও রক্তপাত দেখা দিবে, যাহার তুলনায় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছেলেখেলা। অতএব মানুষের সম্মুখে লক্ষ্য—হয় বিশ্বযুদ্ধ নয় স্থায়ী শান্তিজনিত পৃথিবীময় অশান্তি ও বেকার দশা। কোন্‌টা বাছিয়া লইবেন? মানুষ এতকাল যেমন সাধনা করিয়াছে তেমনি সিদ্ধি আসন্ন। মানুষের ইতিহাস অনিবার্য বেগে অপরিহার্য পরিণামের মুখে ধাবমান। ইতিহাসের কাঁটা পিছু হটিবে না।

৮২

ততঃ কিম্‌

মনুষ্য জাতির পক্ষে বড় শুভদিন সমুপস্থিত। এতদিনের আকাঙ্ক্ষা সফল হইয়াছে। সোভিয়েট মুল্লুক, মার্কিন মুল্লুক, বৃটিশ রাজ্য ও অন্যান্য সমস্ত রাষ্ট্রের মধ্যে গলাগলি ভাব, হরিহরাত্মা প্রেম। হঠাৎ-ওঠা শান্তির ঝড়ে পৃথিবীময় যে-সব সামরিক চুক্তির দীপ জ্বলিয়াছিল সে-সব নির্বাপিত। মনুষ্য

জাতি স্বস্তিতে 'আঃ' শব্দ করিতেছে, বলিতেছে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের হাত হইতে বাঁচিয়া গেলাম। অনেকে রাষ্ট্র-সংঘকে নিষ্প্রয়োজনবোধে ভাঙিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, আবার এই অনর্থক খরচ কেন!

রাষ্ট্র-সঙ্ঘের অধিবেশন হইয়া গেল। আলোচনা সূচীতে একটি মাত্র বিষয়—যে সব আণবিক বোমা তৈয়ারি হইয়াছে সেগুলি লইয়া কি করা যায়? বিভিন্ন রাষ্ট্র তৈয়ারি বোমার হিসাব দাখিল করিয়াছে। মার্কিণ ১৫ হাজার, রুশ ১০ হাজার, বৃটেন ৫ হাজার, ভারত ১টি মাত্র (তাহাও সম্পূর্ণ হয় নাই, বোমার খোলটি মাত্র তৈরি করিবার পরে টাকা ফুরাইয়া যাওয়ায় অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে)।

রাষ্ট্র-সঙ্ঘের সভাপতি জিজ্ঞাসিলেন, এখন এগুলি লইয়া কি করা যায়?

শ্রীকৃষ্ণ মেনন বলিলেন, যেমন আছে তেমনি থাক, ব্যবহার না করিলেই হইল।

আপত্তি উঠিল তাহা হয় না, সরকারের শান্তিনীতির বদল হইলে কিম্বা সরকারের বদল হইলে তখন যে ব্যবহৃত হইবে না তাহার স্থিরতা কি? দুষ্টু ছেলের হাতের কাছে অস্ত্র রাখা কিছু নয়। বিশেষ আমন্ত্রণে আগত চক্রবর্তী শ্রীরাজগোপালাচারি বলিলেন, আমার পূর্ব প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা হোক। বোমাগুলি উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে লইয়া গিয়া ফাটানো হোক, পৃথিবী নিরাপদ হইবে।

তখন বিশেষজ্ঞগণ উঠিয়া বলিলেন, তাহাতে বরফ গলিয়া সমুদ্রের জল এত বাড়িবে যে, সমস্ত দেশ অতলে তলাইয়া যাইবে, কোনরূপ জীবচিহ্ন আর থাকিবে না।

তখন অপর একজন প্রস্তাব করিলেন যে, বোমাগুলি হিমালয়, আল্পস্, এণ্ডিস প্রভৃতি পর্বতমালার অনধ্যুষিত স্থানে লইয়া গিয়া ফাটানো হোক।

এবারে বিশেষজ্ঞগণ উঠিয়া বলিলেন তাহাতে এত বরফ গলিবে যে ভারতবর্ষ, মধ্য এশিয়া, ইউরোপ ও সংশ্লিষ্ট দেশসমূহ চিরবন্যায় ডুবিয়া যাইবে।

সকলে হায়, হায় করিয়া উঠিল। তখন বৃটিশ পক্ষ হইতে প্রস্তাব করা হইল যে, বোমাগুলি আস্ত অবস্থায় সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হোক।

বিশেষজ্ঞগণ পুনরায় বলিলেন, ৩০ হাজার অর্ধমগ্ন আণবিক বোমা ৩০

হাজার আণবিক সাব-মেরিণে পরিণত হইলে বাণিজ্য পথ রুদ্ধ হইয়া মহাদুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করিবে।

তবে এখন কি করা যায়—সকলে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

তখন অপর এক সভ্য প্রস্তাব করিলেন যে, ক্ষেপণাস্ত্রযোগে বোমাগুলি গ্রহান্তরে প্রেরণ করা কি সম্ভব নয়?

বিশেষজ্ঞগণ বলিলেন, অবশ্যই সম্ভব কিন্তু তাহাতে বোমা ফাটিবার যথেষ্ট আশঙ্কা। এখন ৩০ হাজার বোমা মহাশূন্যে ফাটিলে কেবল পৃথিবী নয়, সৌরজগৎটা নষ্ট হইবার আশঙ্কা।

বিশেষজ্ঞগণের কথা শুনিয়া রাষ্ট্র-সঙ্ঘ পুনরায় মাথায় হাত দিয়া বসিলেন।

একজন বলিলেন, তবে যেমন আছে তেমনি থাক্।

কে একজন বলিয়া উঠিল—'সসর্পে চ গৃহেবাসো, মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ।' সকলে তাকাইয়া দেখিল বক্তা চক্রবর্তী শ্রীরাজাগোপালাচারি।

তখন বিশেষজ্ঞগণের একজন বলিলেন, বোমাগুলি এমনিতে নিরীহ, উহাদের সহিত আণবিক অংশ যোগ করিলে তবেই মারাত্মক হইয়া ওঠে, যেমন নিরীহ মনুষ্য দেহটার সহিত মারাত্মক মস্তকটা যুক্ত হইলে তবেই সে দুর্জন হইয়া ওঠে। দুটা অংশ আলাদা করিয়া রাখা হোক।

কেহ কেহ বলিল যে, দুটা অংশ আলাদা করিয়া রাখিলেই যে আলাদা থাকিবে তাহার স্থিরতা কি? কোন দুর্জন দুটা সংযুক্ত করিয়া যে বিধ্বংসী কাণ্ড ঘটাইবে না তাহা কেহ বলিতে পারে না।

তখন সমস্ত রাষ্ট্র-সঙ্ঘ নানা ভাষায় একযোগে যাহা বলিয়া উঠিল তাহার অর্থ "ততঃ কিম্।"

তখন সহসা শূন্যে দৈববাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিল, সকলে হতবাক্ হইয়া শুনিতে লাগিল। দৈববাণী বলিতেছে—"তোমরা খাল কাটিয়া কুমীর আনিয়াছিলে, ভাবিয়াছিলে তোমার পোষা কুমীর তোমার শত্রুকে খাইবে আর তোমাকে খাতির করিবে। এখন প্রয়োজন ফুরাইয়াছে, ভাবিতেছ কুমীর ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু কুমীর তো রাজনীতিজ্ঞ নয়, সে মনুষ্যদেহ-রসিক, কাজেই ক্ষুধিত কুমীর ক্ষুন্নিবৃত্তি না করিয়া ফিরিবে না। এবারে যদি প্রাণে বাঁচিয়া যাও, তবে এই শিক্ষা লাভ করো যে, মানুষ মারিবার উদ্দেশ্যে কুমীর পুষিও না, মনে রাখিও তুমিও মানুষ। কুমীরের কাছে সকল

মানুষের মাংসই সমান হজ্ম।" প্রথম বিস্ময় কাটিলে সকলে শুধাইল, কে বলিল? কিম্বা দৈববাণী কি সত্যই সম্ভব?

চক্রবর্তী শ্রীরাজগোপালাচারির সূক্ষ্ম দৃষ্টি, তিনি এদিক ওদিক ঘুরিয়া আবিষ্কার করিলেন যে, দৈববাণী নয়, কেহ অলক্ষ্যে থাকিয়া মাইক্রোফোনে কথা বলিতেছে। আর একটু পরেই আবিষ্কার করিলেন বক্তা আর কেহ নয়, রাষ্ট্র-সঙ্ঘ অট্টালিকার দারোয়ান।

তিনি শুধাইলেন, বৎস তুমি এ-সব জ্ঞানগর্ভ কথা কেমন করিয়া পাইলে?

সে বলিল, চাকুরি যাইবার আশঙ্কা দেখা দিলে সরস্বতী হাঁটিয়া আসিয়া মাথায় ভর করেন।

কিন্তু চাকুরি যাইবে কেন?

যাইবে না কেন? স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে এই অট্টালিকায় যে ঘুঘুর বাসা হইবে। চাকুরি থাকিবে কেন?

তাও বটে।

কিন্তু সে আশঙ্কা নাই। ঐ শুনুন শব্দ।

রাজাজি বলিলেন, তাইতো! কি ব্যাপার? তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ স্থরু হইয়া গিয়াছে। বাধাইল কাহারা?

স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে আমার মতো যাহাদের চাকুরি যাইবে সেই সৈন্যসামন্ত, সেনাপতি, ব্যবসায়ী ও রাজকর্মচারিগণ।

কিন্তু ইহার পরিণামে যে সকলে প্রাণে মরিবে।

তখন সেই অশিক্ষিত দারোয়ান যাহা বলিল তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার মতো। সে বলিল, "বেকার অবস্থায় বাঁচিয়া থাকার চেয়ে চাকুরির সঙ্গে সহমরণে যাওয়া কি বাঞ্ছনীয় নয়?"—

তাহার প্রজ্ঞায় বিস্মিত হইয়া চক্রবর্তী শ্রীরাজাগোপালাচারি বলিলেন, বৎস তোমার স্থান এ-জড়বাদের দেশে নয়, চলো তুমি আমার সঙ্গে ভারতবর্ষে।

৮৩

হাসির কথা

এ যুগটা হাসির অনুকূল নয় অনেকে মনে করেন। এ যুগে সভা ডাকিয়া হাসির আয়োজন করিতে হয়; বিলাতী বিখ্যাত হাস্যরসের পত্রিকা পাঞ্চের সম্পাদক লিখিয়াছেন যে হাস্যরস ক্রমেই দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে; প্রাণখোলা হাসির শব্দ আর বড় শুনিতে পাওয়া যায় না প্রভৃতি লক্ষণে হাস্যরসের অভাব সূচিত হয় বলিয়া অনেকে মনে করেন। তাঁহারা বলেন এ যুগ ব্যস্ততার যুগ, ব্যবসা-বাণিজ্যের যুগ, আণবিক বোমা ও ধর্মঘটের যুগ—এ সময়ে হাসির সুযোগ কোথায়? অবসরে আনন্দ, আনন্দে হাসি। প্রবাহিত নদীতেই ফেনা দেখা দেয়—হাসি যে জীবনস্রোতের ফেনা। আজ জীবনস্রোত শুষ্কপ্রায়—হাসি কেমন করিয়া সম্ভব।

এ সব যুক্তি একেবারে অগ্রাহ্য করিবার মতো নয়, কিন্তু আবার সর্বাংশেও সত্য নয়। কারণ হাসি না থাকিলে মানবসমাজও থাকিবে না; মানব যখন আছে, অবশ্য হাসিও আছে। তবে যে চোখে পড়ে না তার কারণ খুব সম্ভব চোখের দোষ, কিম্বা অভ্যাসের দোষ। হাসির নানা জাত, যে-জাতের হাসি প্রত্যাশা করিতেছি হয়তো সে-জাতের হাসি নাই, কিন্তু অন্য জাতের থাকিতে বাধা কি! হিমালয়ের চূড়ায় জল নাই, কিন্তু বরফ আছে। অবস্থাগতিকে জল বরফত্ব পায়, হাসিতেও তেমন রূপান্তর আছে। আসল কথা এই যে, বর্তমান যুগে হাসি জমিয়া শ্লেষ হইয়া গিয়াছে, বর্তমান যুগ Humour-এর যুগ নয়—এ যুগটা Wit-এর অনুকূল। আমরা যদি এ যুগে Humour-এর সন্ধান করি নিরাশ হইব, যদি Wit-এর সন্ধান করি প্রচুর পাইব। যে যুগের যে নৈবেদ্য।

যদি কেহ শুধান যে Humour-ই বা কি, আর Wit-ই বা কি তবেই মুস্কিল। দুই-ই হাসি, তবে ভিন্ন উপাদানে গঠিত। Humour-এর মূলে করুণা, Wit-এর মূলে বুদ্ধি; একটির আবেদন পাঠকের হৃদয়ে, অপরটির

আবেদন পাঠকের মস্তিষ্কে, একটি হাসিতে হাসিতে কাঁদায়, অপরটি হাসিতে হাসিতে ভাবায় : একটি পুরাতন জগৎকে ভালবাসে, অপরটি নূতন জগৎ সৃষ্টি করিতে চায় ; একজন বশিষ্ঠ, অপরজন বিশ্বামিত্র ; একজন প্রেমিক, অপরজন সংস্কারক। যুগের দাবীতে কখনো Humour দেখা দেয়—কখনো বা Wit! মুকুন্দরামের কাব্যে যে Humour পাই—আর ভারতচন্দ্রের কাব্যে যে Wit পাই—তার কারণ দু'জনের যুগের দাবী ভিন্ন ছিল। ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্য পলাশীর যুদ্ধের কয়েক বছর মাত্র আগে লিখিয়াছেন, সেই আসন্ন পরিবর্তনের যুগে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গই হাস্যরসের স্বাভাবিক বাহন। বর্তমান যুগ পৃথিবীব্যাপী "পলাশীর যুদ্ধে"র যুগ—এ যুগেও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গই স্বাভাবিক। যে-যুগ সুস্থ, অভাব ও তাড়না যাহার প্রধান লক্ষণ নয়, সে যুগে Humour সম্ভব হইয়া থাকে। বর্তমান যুগলক্ষণাক্রান্ত সাহিত্যিক আমাদের দেশে—পরশুরাম। ঐ পরশুরামের ভাষাতেই বলিতে ইচ্ছা হয়– হাসি এখনও আছে তবে সব সময়ে "Zান্তি" পারা যায় না, কারণ Humour অট্টহাস্যে আপনাকে বিস্ফোরিত করে, আর Wit-এর গতি নিঃশব্দ, তাই বলিয়া তাহার সার্থকতা কম নয়।

তবে এ কথা স্বীকার করিতেই হয় যে, প্রাণখোলা হাসি ক্রমেই দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে। ও বস্তুর প্রকৃত স্থান ছিল গাঁয়ের বারোয়ারিতলা ও নদীর ঘাটে, চণ্ডীমণ্ডপে ও বৈঠকখানায়। সে-সব বস্তুর সঙ্গে হাসিও যাইতে বসিয়াছে। এখন ট্রামে বাসে, পথেঘাটে, ডেলি-প্যাসেঞ্জারের যাতায়াতে হাসির যে রূপটা প্রত্যক্ষ তাহাই শ্লেষ বা Wit নামে পরিচিত—তাহার মূল প্রেরণা সমালোচনা। দেশলাই কাঠির মাথাটুকু যেমন দপ্ করিয়া জলিয়া ওঠে, ঐ শ্রেণীর হাসিতেও তেমনি শ্রোতার বুদ্ধিটুকু মুহূর্তের জন্য উদ্দীপ্ত হইয়া ওঠে। বাস্। এ যুগে প্রাণখোলা হাসি নাই বলিয়া যদি মন উজ্জ্বল করা হাসিকেও প্রত্যাখ্যান করি তবে নির্বুদ্ধিতার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে।

এ যুগে হাসি যে দুর্লভ তাহার আর একটি প্রমাণ কমলাকান্তের বর্তমান প্রবন্ধ—হাসির প্রসঙ্গে গাম্ভীর্যের অবতারণা।

৮৪

গোপাল ভাঁড় উৎসব

জনৈক পত্রলেখক সম্প্রতি কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত "গোপাল ভাঁড় দিবসে"র সার্থকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য এই যে গোপাল ভাঁড় এমন কি একটা লোক ছিল যে, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আজ তুইশত বৎসর পরে উৎসব করিতে হইবে। তিনি বলিতে চান যে, নদীয়াবাসী যদি নদীয়ার সুসন্তানদের গৌরব করিতে চান, স্মৃতি উৎসব করিতে চান. তবে নদীয়ায় মহাপুরুষের অভাব নাই। তাঁহাদের ছাড়িয়া একটা "দরবারী ভাঁড়"কে লইয়া এমন আদিখ্যেতা কেন? এমন প্রশ্ন আজকার দিনে মনে জাগা মোটেই অস্বাভাবিক নয়, কেন না, নানা কারণে আমরা অতিমাত্রায় গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছি, হাস্যরস আমাদের কাছে 'ছ্যাবলামি' মাত্র।

কোন কোন পণ্ডিত আবার গোড়া ঘেঁষিয়া কোপ মারিয়া গোপাল ভাঁড়ের অস্তিত্বই অস্বীকার করিয়া বসিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, গোপাল ভাঁড় বলিয়া কেহ ছিল না। ইহার সরল উত্তর এই যে, সত্যই না থাকিলে থাকা উচিত ছিল। কিন্তু আরও উত্তর আছে। গোপাল ভাঁড় সম্বন্ধে প্রবল জনশ্রুতি, গোপাল ভাঁড়ের ভিটা ও উক্তি এ সমস্ত উড়াইয়া দিবার মতো নয়। কিছুকাল আগে কোন ব্যক্তি গোপাল ভাঁড়ের উত্তর পুরুষ বলিয়া পরিচয় দিয়া কমলাকান্তকে চিঠি লিখিয়াছিলেন। কাজেই গোপালের অস্তিত্ব কলমের ঘায়ে নস্যাৎ হইবার মতো নয়। কাজেই গোপাল ভাঁড় অবশ্যই ছিল, কিন্তু সমস্যা হইতেছে যে থাকিলই বা, কিন্তু তাঁহাকে লইয়া এমন বাড়াবাড়ি কেন?

পত্রলেখকের উক্তি তাঁহার ভাষাতেই শোনা যাক। তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন—"গোপাল ভাঁড় কোন্ শ্রেণীর মনীষী? সংস্কৃতি ও সাহিত্যে কি তার অবদান, কি তার মহান ভাবাদর্শ যার দ্বারা আজ তুই শতাধিক বৎসর পরেও জাতি অনুপ্রাণিত হ'তে পারে? আসল ইতিহাসটা কি? গোপাল

ভাঁড় ছিলেন একজন দরবারী ভাঁড়। ভাঁড়ামিই ছিল তাঁর পেশা। 'গোপাল ভাঁড় উৎসবের' অত্যুৎসাহী উদ্যোক্তারা কি সেই ভাঁড়ামি রূপ মহান সাহিত্য ও সংস্কৃতির পুনঃপ্রবর্তনের প্রয়াস পেয়েছেন ?"

গোপাল ভাঁড়ের অনিবার্য অনুপস্থিতির দরুণ উত্তর কমলাকান্তকে দিতে হইতেছে, গোপাল উপস্থিত থাকিলে তাঁহার জবাব নিশ্চয় আরও সরস হইত। প্রথম উত্তর এই যে গোপাল ভাঁড় একজন প্রকৃত সাম্যবাদী বা "মার্ক্সিষ্ট" ছিলেন। তিনি যে-ভাবে হাসির অনুশাসনে কৃষ্ণ-নগরাধিপতি কৃষ্ণ-চন্দ্রকে সংযত ও শাসিত রাখিতেন দেশে প্রকৃত সাম্যবাদ না থাকিলে তাহা মোটেই সম্ভব নয়। যদিচ তখন খোদ মার্ক্সের জন্মই হয় নাই, তবু "রবি উদয়ের আগে শুক্রগ্রহের মতো" গোপাল ভাঁড় সাম্যবাদের স্নিগ্ধ আলোকে বঙ্গের আকাশ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিলেন। গুণগ্রাহী কৃষ্ণচন্দ্রও সাম্যবাদী ছিলেন, নতুবা তিনি বিদূষকের অনুশাসন নিশ্চয় সহ্য করিতেন না। আজ যখন মার্ক্সবাদের জয়জয়কার—তখন এমনটি কি সম্ভব? যতদূর জানি রাশিয়ায় "State clown" বলিয়া কোন পদ নাই। এমন কি সেদেশে প্রাণ খুলিয়া হাসাও বোধ করি নিরাপদ নয়। সেদেশের কথা থাক। বাংলা দেশের কথাই বলি। আজকার কোন মন্ত্রী, উপমন্ত্রীও কি গোপাল ভাঁড়ের অনুশাসন সহ্য করিবেন? মনের সে উদারতা, সহনশীলতা আজ অতিশয় বিরল, তাই ভাঁড়ামি রাজসভার কাছে ঘেঁষিতে না পারিয়া সংবাদপত্রের আনাচে-কানাচে ঘুরিয়া বেড়ায়। হাসিতে উচ্চনীচ ভেদ ঘুচিয়া যায়—এই অতিশয় গুরুতর শিক্ষাদান করিয়াছেন বলিয়া গোপাল ভাঁড় অবশ্য স্মরণীয়, তিনি হাসির যুগাবতার ও হাসির সাম্যবাদী।

পত্রলেখক সংস্কৃতির প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন। সংস্কৃতি অবশ্যই উত্তম, কিন্তু জীবন আরও উত্তম। হাসির লবণের দ্বারা সুরক্ষিত না হইলে জীবন যে পচিয়া উঠিত, তখন সংস্কৃতি থাকিত কোথায়? হাসির শুভ্র সৈন্ধব লবণ যথোচিত পরিমাণে না পড়িলে জীবন লাবণ্যহীন হইয়া উঠিবে। কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে জীবনের যে পাক চড়িয়াছিল তাহাতে এক এক মনীষী এক এক রূপ মশলা ও উপাদান দিয়াছেন, ভারতচন্দ্র দিয়াছেন শর্করা ও অম্ল, রামপ্রসাদ দিয়াছেন বৈরাগ্যের সুষনি শাক, গরম মশলা দিবার লোকের নিশ্চয় অভাব ছিল না, সেই বিচিত্র ব্যঞ্জনে গোপালের "অবদান" হাসির শুভ্র সৈন্ধব লবণ।

ঐটুকু না পড়িলে সমস্ত সত্বেও সমস্ত বিস্বাদ হইয়া যাইত। এই কৃতিত্ব কি স্মরণযোগ্য নয়?

আসল কথা, হাসির যথার্থ মূল্য দিতে আমরা জানি না। মানুষের ইতিহাস মানুষের হাসি, অশ্রু ও রক্তের ইতিহাস—হাসির কৃতিত্ব এক-তৃতীয়াংশ। এরিষ্টফেনিস তাঁহার হাসির দ্বারা এথেন্সের যুদ্ধবাজদের ধিকৃত করিয়াছেন। Rabelais তাঁহার হাসির দ্বারা সংরক্ষণশীল, নূতন জ্ঞানবিজ্ঞানে বিমুখ পাদ্রী ও ধনীদের শাসিত করিয়াছেন, Cerventes তাঁহার হাসির দ্বারা অবাস্তব কল্পনাবিলাসীদের লজ্জিত করিয়াছেন, শেক্সপীয়র ফলষ্টাফের হাসির দ্বারা টিউডর ইংলণ্ডের নৃশংস সমাজকে আমোদিত করিয়াছেন, ভল্টেয়ার তাঁহার হাসির দ্বারা পুরাতন জীবনতন্ত্রকে অধঃপাতিত করিয়াছেন, মোলিয়ের তাঁহার হাসির দ্বারা মনুষ্যত্ববিরোধীদের চকিত করিয়াছেন—আর শ' তাঁহার হাসির দ্বারা বর্তমান জগৎকে আত্মদোষ সন্ধানে নিযুক্ত করিয়াছেন। গোপাল ভাঁড় নিশ্চয় ইহাদের সমকক্ষ নয়—তবু সে এই ঝাড়েরই বাঁশ।

গোপাল ভাঁড় আজ একটি ব্যক্তির চেয়ে অধিক, সে একটি symbol বা প্রতীক, একটি বিশেষ মনোভাবের প্রতিনিধি। এবং সেইভাবেই আজ তাহার মূল্য—বাঙালীসমাজ যদি সেই মূল্যের প্রতি সচেতন হয়, তবে তাহাতে বাঙালীর উপকার হইবারই সম্ভাবনা। গোপাল ভাঁড় দিবসের উদ্যোক্তাগণ এই উপলক্ষ্যটিকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন বলিয়া সকলের ধন্যবাদের পাত্র।

৮৫

হাস্য রস ও হাতের জোর

কি লিখিব ভাবিতেছি এমন সময়ে রবিবারের হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকায় বন্ধুবর 'হোমা'র প্রবন্ধটি চোখে পড়িল। হোমা হাস্যরসের গুণপনা ব্যাখ্যা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রাজনীতিকগণের যথেষ্ট হাস্যরসবোধ থাকিলে বিধান-সভার আলোচনা এমন নীরস হইত না। কথাটা একশ বার সত্য।

কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের বিধান-সভায় হাস্যরসবোধ না থাকিলেও অন্য রসের অভাব নাই। রস তো আর একটিমাত্র নয়। সাধারণতঃ বীররসের বাহুল্যই কিছু বেশি। তারপরে রৌদ্ররস। আনুষঙ্গিকভাবে কখনো কখনো বীভৎস রসের অবতারণাও হইয়া থাকে। হাস্যরস একেবারে অনুপস্থিত বলি না, মাঝে মাঝে পাদপূরণে চ বৈ তু হি-র মতো দেখা দিয়া থাকে। আর শান্তরসটা স্পীকার মহাশয়ের একচেটিয়া। তিনি শান্ত সমাহিত গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকেন। বোধ করি বিধান-সভা কক্ষের মূলতুবি হাসিটা বাড়ীতে গিয়া নিভৃতে হাসিয়া লন।

একবার বিধান-সভার কোন মাননীয় সদস্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হাঁ মহাশয় বীররসের এমন অযথা অপব্যয় করেন কেন? আর এত লম্বা লম্বা স্পীচ ঝাড়েন—এসব কি শ্বাস-প্রশ্বাসের বাজে খরচ নয়। মাননীয় মহাশয় একটি সিগারেট ধরাইয়া বলিলেন—আপনি কিছু বোঝেন না। ঐ সব স্পীচ কি সভার সদস্যগণকে লক্ষ্য করিয়া ঝাড়িয়া থাকি?

তবে?

তবে আর কি! আমার নির্ব্বাচন কেন্দ্রের ভোটারগণের উদ্দেশে ঐসব নিক্ষিপ্ত।

কেন?

কেন কি? আগামীবারে ভোটের সময়ে আমার বক্তৃতার রিপোর্টের দৈর্ঘ্য মাপিয়া তবে তো আমাকে পুনরায় ভোট দিবে, বুঝিলেন?

আমার মুখের ভাব দেখিয়া বলিলেন, কিছুই বোঝেন নাই। কংগ্রেসীরা নির্বাচনে হারে কেন? সংখ্যায় অনেক, বক্তৃতা দিবার সুযোগ পায় কম। রিপোর্টের দৈর্ঘ্যে আমার সঙ্গে পারিবে কেন? গত পাঁচ বছরে আমি যে-সব বক্তৃতা দিয়াছিলাম তাহার রিপোর্টের দৈর্ঘ্য বাইশ হাজার গজ। আমি ভোট না পাইব কেন? এবারেও 'পিতা' 'পিতা' বলিয়া ভোট দিয়া নির্বাচিত করিয়া আমাকে পাঠাইয়াছে। একজন ভোটার রসিকতা করিয়া বলিয়াছিল লম্বায় যে হনুমানের লেজের মতো। আমি বলিলাম, ভোট পাইলে, হনুমান হইতে এমন কি আপত্তি! এবারে বুঝিলেন?

শুধাইলাম, আর বীররসের বাহুল্যের কারণটা কি?

ওটাই সবচেয়ে প্রিয়। যাত্রার আসরে ভীমসেন আসিয়া উপস্থিত হইলে নিদ্রিত অর্ধনিদ্রিত সবাই কি সজাগ হইয়া উঠিয়া বসে না?

আমি বলিলাম, তবে সবই লোক দেখানো ব্যাপার? দেশের উপকার সাধন কি আপনাদের উদ্দেশ্য নয়?

তিনি আমার কথা শুনিয়া নিতান্ত হতাশ ও বিরক্ত হইয়া বলিলেন—নিন, এখন মশ্ করা রাখুন! বীররস গেল, লম্বা স্পীচ গেল, এখন তুললেন দেশের উপকার সাধন! দিন একটা সিগারেট দিন!

তারপরে ধীরে সুস্থে সিগারেটটি ধরাইয়া বলিলেন, আরে মশাই দেশের উপকার সাধন করিতে কি কেহ ওখানে যায়? তার অনেক উপায় বাইরে আছে।

মাননীয় সদস্যের বাক্য শুনিয়া আমার তত্ত্বনেত্র প্রস্ফুটিত হইল, আর বুঝিলাম সদস্যটির আর কোন গুণ না থাকুক প্রচুর হাস্যরসবোধ আছে—যদিচ তাহা দেশের দিকে প্রবাহিত না হইয়া নিজের দিকেই প্রবাহিত হইতেছে। উপকারও ঘটিয়াছে, ঘাড়ে গর্দানে, মেদে মাংসে, বিস্তার বহরে, ওজস্বিতায়, ওজনে একই সঙ্গে অনুকরণের অতীত! সত্যই হাস্যরসের তুলনা হয় না।

হাস্যরসবোধ থাকিলে সংসারের পথ অনেক সুগম হইত, কেবল রাজনীতির পথ নয়, সমস্ত পথ। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হইবার সম্ভাবনা। অনেক কাল আগেকার কথা। ত্রিশ বছরের কম হইবে না। বর্ধমান রেল ষ্টেশনে পরবর্তী গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেছি। এমন সময়ে একদল যাত্রী প্লাটফর্ম হইতে বাহির হইতেছে। হঠাৎ দেখিলাম একজন যাত্রীকে লইয়া বড় টানাটানি পড়িয়া গিয়াছে। ব্যাপার কি? লোকটা বিনা টিকিটের যাত্রী। ভিড়ের সুযোগে বাহির হইয়া গিয়াছিল, ধরা পড়ায় টিকিট চেকার তাহার হাত ধরিয়া প্লাটফর্মের ভিতরে টানিয়া আনিতে চেষ্টা করে। বেগতিক দেখিয়া লোকটা ডানহাত দিয়া লোহার গেটের একটা শিক ধরিয়া ফেলিয়াছে—অপর হাত ধরিয়া ৪।৫ জন চেকার তাহাকে ভিতরে আনিবার প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু পারিবে কেন? লোকটা জানে যে একবার ভিতরে নীত হইলে জন্মের মতো শিক্ষা পাইয়া যাইবে। তাই সে প্রাণপণ করিয়া শিক আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে, তাহার দেহের বারো আনা বাহিরে, চার আনা ভিতরে। এ হেন বিচিত্র দ্বন্দ্ব দেখিতে একটি ভিড়ও জমিয়া গিয়াছে। চেকারগণ যখন প্রায় হতাশ হইয়া পড়িয়াছে এমন সময়ে একজন বৃদ্ধ চেকার

(সরকারী চাকুরের বয়স সহজে পঞ্চাশ অতিক্রম করে না) আসিয়া উপস্থিত। কি ব্যাপার? আরে এইভাবে কি কাহাকেও ভিতরে আনা যায়? কাতুকুতু দাও, কাতুকুতু দাও, দেখিবে কেমন হাসিতে হাসিতে স্বেচ্ছায় ভিতরে আসে।

যেমন উপদেশ তেমনি কার্য। মুহূর্তে কোথায় গেল লোকটির মরণপণ দৃঢ়তা, সে হাত ছাড়িয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে ঢলিয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে আনীত হইল। বলা বাহুল্য তাহার কাছে কেহ মাশুল চাহিল না। কে চাহিবে? চেকারগণ হাসিতেছে, আসামী হাসিতেছে, জনতা হাসিতেছে। হাসির এমন মৌশুমী বর্ষণে টাকা আদায়ের মতো অবান্তর কথা কাহারো কি মনে পড়ে! ট্রাজেডির সূচনা প্রহসনে সমাপ্ত হইল। ইহার মূলে হাস্যরসবোধ। যথাপরিমাণে হাস্যরসবোধ থাকিলে জীবনটা স্বচ্ছন্দতর হইত, কমলাকান্তের আসরেরও এমন শস্যকাটা ক্ষেতের মতো লক্ষ্মীছাড়ার অবস্থা হইত না। শুভ্র হাসি জীবনভোজে শুভ্র সৈন্ধব লবণ, অভাবে সমস্ত কেমন লাবণ্যহীন মনে হইতে থাকে।

৮৬

চালভাজা ও বিরহ

অবশেষে বহুপ্রতীক্ষিত, বহু হিসাব মাঠে-মারা, ভবিষ্যভাষণ ওলটপালটকারী, আবহ বিভাগের মূর্তিমান সমস্যারূপী বর্ষার মেঘ সত্যসত্যই আসিয়া পড়িয়াছে। আকাশে 'তিল ঠাঁই আর নাহি রে।' 'পালে বাঘ পড়িল' রব এতবার উঠিয়াছে যে, এবারে আর কেহ প্রস্তুত ছিল না, হঠাৎ বর্ষণ নামিয়া শুষ্ক ঘুঁটে ও শুষ্কপ্রায় কাপড়চোপড় ভিজাইয়া দিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে আকাশ মেঘে বিদ্যুতে গর্জনে ও বর্ষণের চতুরঙ্গরূপে পূর্ণ হইয়া গেল। এই মুহূর্তে কে বলিবে যে, একদিন আগেও কলিকাতা সহর ব্লটিং পেপারের মতো রসহীন ছিল। মোটের উপরে দেখা গেল যে, বর্ষা ও লোক্যাল ট্রেন সমশ্রেণীর বস্তু, যথাসময়ে কদাচিৎ আসে। আদৌ আসে,

ইহাই বিস্ময়ের। এখন কবিরা কলম, রোগীরা পেনিসিলিন ও ভোগীরা ঋতুযোগ্য খাদ্যের সন্ধান করুন। কমলাকান্ত সকলের হইয়া বর্ষার জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিতেছে।

এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন তুলিতে চাই। যে বর্ষাগমে চাতক, ডাহুক, ময়ূর, দর্দুর ও কবিগণ এমন উল্লসিত হইয়া উঠে, কত শত কাব্য লিখিত হয়, সেই দিব্য ঋতুতে মুড়ি, চালভাজা, পাঁপড়ভাজা, ফুলুরি প্রভৃতি তৃতীয় শ্রেণীর খাদ্যের কথা ভোগীর মনে কেন দেখা দেয়! এ সমস্যার সমাধান কে করিবে? বর্ষায় বিরহ ও বাত প্রবল হইয়া ওঠে, এখন ঐসব খাদ্যের সঙ্গে বিরহ ও বাতের কি বিশেষ সম্বন্ধ আছে? আচ্ছা, ব্যাপারটা আরো একটু পরিষ্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করি। কালিদাস মেঘদূত কাব্যে অলকানিবাসিনী বিরহিণী যক্ষপত্নীর দুঃখের চিত্র আঁকিয়াছেন। তিনি নাকি কান্ত-বিচ্ছেদে শুক্লা তৃতীয়ার চন্দ্রকলার মতো ক্ষীণতনু হইয়া পড়িয়াছিলেন, পূজাপুষ্পে দিন গণনা করিতেন ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তিনি কি খাইতেন, উল্লেখ করেন নাই। বিরহ যতই সত্য হোক, ক্ষুধাও কম সত্য নয়। আর রসনার তাড়নাতে না হোক বৎসরান্তে পতি-সন্দর্শনের আশাতেই নিশ্চয় তাঁহাকে কিছু খাইতে হইত। এখন প্রশ্ন এই কি খাইতেন? কালিদাসের নীরবতা সত্ত্বেও আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, তিনি চালভাজা ও ছোলাভাজা তেল, লঙ্কা, লবণ সহযোগে যথারীতি মাখিয়া লইয়া বিরহখিন্ন অঙ্গুলিচয়যোগে বিরহসন্তপ্ত বদনে তুলিয়া দিতেন—সেই সঙ্গে হয়তো দু'চার টুকরা কচি শশা ও কাঁঠালের বীচি-পোড়া থাকিত। কেন? এইজন্য যে, এই খাদ্য একাধারে বর্ষার ও বিরহের যোগ্য। রাজভোগ্য আহার করিলে পাড়াপড়শীরা নিশ্চয় কানা-কানি করিত। কিন্তু সামান্য মুড়ি চালভাজায় আপত্তি করিবে, এমন ভর্তৃখাদিকা কে আছে?

আবার আমাদের শ্রীমতী রাধার কথা ভাবিয়া দেখুন। কৃষ্ণ-বিরহে সে কি খাইত? রাধা মেয়েটি যে বোকা ছিল, এমন মনে করিবার হেতু নাই। কেন? তবে একটা গল্প শুনুন। রাধা প্রতি রাত্রে নানাবিধ গন্ধ পুষ্পে গৃহ সাজাইয়া কৃষ্ণের জন্য অপেক্ষা করে, কৃষ্ণ আসে না। প্রতিদিন প্রাতে ফুলগুলি ফেলিয়া দিতে হয়। আবার প্রতি সন্ধ্যায় নূতন ফুল সংগ্রহের উদ্যম। অবশেষে বিরক্ত হইয়া রাধা সজ্‌নে ফুল দিয়া ঘর সাজাইল।

যথারীতি কৃষ্ণ আসিলেন না। তখন সে ভোরবেলা ফুলগুলি ফেলিয়া না দিয়া শর্ষে-বাঁটা দিয়া ভাজিয়া দুপুরবেলা আহার করিল। বিরহকে স্বকৌশলে চচ্চড়িতে পরিণত করা যদি বুদ্ধির পরিচয় না হয়, তবে বুদ্ধি আর কাহাকে বলে জানি না। এ হেন রাধিকা বিরহের বর্ষায় কি খাইত? নিশ্চয় চাল-ভাজা মুড়ি। অথচ এই অতিশয় জরুরী সংবাদটা কালিদাস ও বৈষ্ণবগণ বেমালুম চাপিয়া গিয়াছেন। হায়! কবিগণ বড়ই একদেশদর্শী।

প্রশ্নটার একটা উত্তর পাইলাম না। বর্ষার সঙ্গে বিরহের সঙ্গে চালভাজা মুড়ির কথা মনে পড়িয়া যায় কেন, দগ্ধ উদরটা মনে পড়িয়া যায় কেন? সংবাদপত্রে নিত্য নিয়ত ছবি দেখি বড় বড় রাজনৈতিক সম্মেলন, সম্মুখে খানাপিনার। ইহাতে কি প্রমাণ করে যে, ছায়ার মত উদরটা মানুষের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী? হোক বিরহ, হোক সম্মেলন, হোক শান্তি, হোক সংগ্রাম, খাদ্য ছাড়া এক পা চলিবার উপায় নাই। এমন কি সুকঠোর তপস্যার সময়েও উমাকে গাছের পাতা ভক্ষণ করিতে হইত, কথাটা কালিদাস লুকাইতে পারেন নাই। কেবল বিরহিণী যক্ষের বেলায় সত্য গোপন করিয়াছেন। মেঘদূতে এক-আধটা শ্লোকে তণ্ডুলের উল্লেখ থাকিলে রস কি আরো জমিয়া উঠিত না?

হে পাঠকগণ, আর সৌভাগ্যবশতঃ যদি পাঠিকা থাকে, তবে হে পাঠিকাগণ, আজ নব-মেঘোদয়ে কমলাকান্তের মনে যখন মুড়ি, চালভাজা, বেগুনি প্রভৃতি নিতান্ত লৌকিক বস্তুর উদয় হইতেছে, তখন আপনারা মেঘদূত, বৈষ্ণব-পদাবলী ও রবীন্দ্র-কাব্য পাঠ করিতেছেন, সামান্য উদরটার কথা ভুলিয়াই গিয়াছেন মনে করিয়া উদ্দেশে শত শত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। জানি, কাব্য খুব সরস; কিন্তু নব-মেঘোদয়ে চালভাজা প্রভৃতি আরো সরস এবং মেঘগর্জন মধুর, কিন্তু মধুরতর মুড়ি চালভাজাওয়ালার হাঁক—ঐ যে পথের মোড়ে শোনা যাইতেছে, অতএব আজকার মতো আসর ছাড়িয়া উঠিতে হইল, মাপ করিবেন।

৮৭

দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি কমলাকান্ত

হে দেবরাজ ইন্দ্র, এবারে দেখিতেছি যে, আবহবিভাগের জ্ঞানের সহিত তোমার মর্জির বেশ একটা রেষারেষি চলিতেছে। আবহবিভাগ লিখিল ১২ ঘন্টার মধ্যে মৌসুমী বৃষ্টি নামিবে, তোমার মেঘগুলি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ভাসিয়া গেল। আবহবিভাগ লিখিল সন্ধ্যায় ঝড় উঠিবে, সন্ধ্যায় গাছের পাতাটি নড়িল না। এবারে এমন করিতেছ কেন? বলি ব্যাপারটা কি? তুমিও কি শেষে বামপন্থী হইয়া পড়িলে নাকি? অবশ্য তেমন হইলে বিস্মিত হইব না, কেন না, সকলেই সহজ পথের যাত্রী হইতে চায়। তুমিই বা না চাহিবে কেন? দেবতা মনুষ্যের ছায়া বই তো নয়।

কিন্তু একবার পৃথিবীর চেহারাটা চাহিয়া দেখিয়াছ কি? বৃষ্টির অভাবে জলাশয়ে জল নাই, ফলে স্বাদ নাই, ফুলে গন্ধ নাই। এহেন অবস্থার জন্য দায়ী কে? অবশ্য তুমিই। প্রমাণ চাও? প্রমাণ আমার মন। আমার মন বলিতেছে যাবতীয় দুষ্কর্মের বোঝা অপরের ঘাড়ে চাপানোই মানুষের ধর্ম। তবে? আরো প্রমাণ চাও? বেশ দিতেছি। সুবর্ষণের কৃতিত্ব যদি তোমার হয় তবে বর্ষণাভাবের দায়িত্ব তোমার নয় কেন? অতএব হে দেবরাজ, তোমাকে লিখিত নোটিশ দিয়া জানাইতেছি যে, এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পরে ১২ ঘন্টার মধ্যে যদি যথোচিত বর্ষণ না নামে তবে তোমার একদিন কি কমলাকান্তের একদিন। কি করিব? তোমার অফিসের দ্বাররোধ করিয়া অবস্থান ধর্মঘট করিব (ব্যাপারটা আগাগোড়া নিষ্ক্রিয়, নিরুপদ্রব ও অহিংস), প্রয়োপবেশন করিব, উপবেশন করিব ও তোমার যাতায়াতের পথে শয়ন করিব। তখন ঠ্যালাটি বুঝিতে পারিবে। বুঝিবে যে সেকালে যে-সব দৈত্যদানব তোমার রাজ্যে উপদ্রব করিত—"এ সব দৈত্য নহে তেমন।" আমরা সরকারের মতিগতি পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে অহরহ যে-সব "সত্যাগ্রহ" করিয়া থাকি তাহার বিবরণ নিশ্চয় তোমার

অজ্ঞাত নয়, কাজেই ভালোয় ভালোয় পিতার সুপুত্রের মতো তোমার মেঘচমূকে অবিলম্বে স্বকার্যসাধনে আদেশ দান করো।

যদি নির্দিষ্ট সময় মধ্যে বৃষ্টি না নামে তবে তোমার ও সেই সঙ্গে সমস্ত দেবতার সমূহ বিপদ। কেন খুলিয়া বলি। এ যুগে অনেকেই দেবতার অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করিতে সুরু করিয়াছে, তাহারা বলিতেছে যে, দেবতা বলিয়া কিছু নাই, ও একটি সুনিপুণ ধাপ্পামাত্র। এ হেন অবস্থায় তোমাদের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্যই সময়মতো ঋতুর আবর্তন আবশ্যক। নতুবা অবিশ্বাসীগণের পক্ষ আরো ভারী হইবে। তার উপরে আবার দেখো বারংবার আণবিক বিস্ফোরণের ফলে আমরা সকলেই দেহে মনে তেজস্ক্রিয় হইয়া বসিয়া আছি, সত্যমিথ্যা, শুভাশুভ প্রভৃতি সূক্ষ্ম ভেদ আর চোখে পড়ে না। যদি এখন সুবর্ষণ হয় তবে তোমার পক্ষ হইয়া কিছু ওকালতী করিতে পারিব, হয়তো আরো কিছুকাল মানুষের বিশ্বাস অধিকার করিয়া টিকিয়া থাকিতে পারিবে। দেবতারা মানুষের মতোই; পরার্থ না বুঝিলেও স্বার্থ বুঝিতে কখনো ভুল করে না। তাই আশা করিতেছি বৃষ্টি নামানোই যে তোমার পক্ষে মঙ্গলের ইহা নিশ্চয় এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছ।

তুমি হয়তো একটা জবর হিসাব দাখিল করিয়া বলিবে যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ বৃষ্টি দান আমার কর্তব্য, সে বৃষ্টি কোথায় পড়িল না পড়িল আমার দ্রষ্টব্য নয়। হায় দেবরাজ, এই কি তোমার মতো কথা হইল? বৃষ্টির পরিমাণ লইয়া আমার শিরঃপীড়া নয়, আসামে বৃষ্টি নামিল তো আমার কি আগমন করিল গমন করিল, আমার শাকের ক্ষেত্রে যে জলাভাব! আর আমার শাকের ক্ষেত্রটিই যে আমার জগৎ! ঐ শাকের ক্ষেত শুকাইল তো জগৎ শুকাইল। বর্তমান প্রসঙ্গে শাকের ক্ষেত মানে কলিকাতা সহর। দেখিলে তো আমি নিতান্ত স্বার্থপর নহি, সমস্ত কলিকাতা সহরের জন্য চিন্তা করিয়া থাকি। তাই সনির্বন্ধ অনুরোধ অবিলম্বে নবধারাপাতে কলিকাতা সহরের কণ্ঠাগত প্রাণ রক্ষা করো। কলিকাতা সহরের কি এমন গুরুত্ব? কলিকাতা সহরটাই যে জগতের কেন্দ্র, কলিকাতা আজ যাহা চিন্তা করে জগৎ কাল তাহা চিন্তা করিবে। এখন এই সহরের মাথা ঠাণ্ডা থাকিলে জগৎ ঠাণ্ডা, আখেরে তুমিও ঠাণ্ডা থাকিতে পারিবে। দেখো সমস্তই বুঝাইয়া বলিলাম, অতএব এখন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুপ্রচুর ধারা বর্ষণ করিয়া

কমলাকান্ত ও তাহার শাকের ক্ষেতটি বাঁচাইয়া দাও। নতুবা "নিরুপদ্রব অহিংস পন্থা" অবলম্বনে তোমার হৃদয়ের পরিবর্তন সাধনে লাগিয়া যাইব। সে ব্যাপারটা বড় সহজ হইবে না।

৮৮

কমলাকান্তের প্রতি ইন্দ্র

বন্ধু কমলাকান্ত, তোমার নোটিশ পাইয়া স্বর্গধামে একটি ছোট-খাটো ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। দেবগণ বলিতেছে যে-কমলাকান্ত লেখনী ধারণ করিলে স্বর্গ মর্ত্য রসাতল মায় টেবিল চেয়ার তক্তপোশ কম্পিত হয় তাহাকে চটানো কেন, ইহা রীতিমতো অবিবেচনার কাজ হইয়াছে। বলা বাহুল্য তোমার নোটিশখানা গোপন করিয়াছিলাম কিন্তু বিরোধী পক্ষ তাহা হাত করিয়া স্বর্গের বিধান-সভায় সরকারপক্ষকে বিষম বিব্রত করিয়াছে। তাহারা যদি যুক্তি দেখাইত ও তথ্য উদ্ধার করিয়া সমালোচনা করিত সহজে যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে পারিতাম। কিন্তু তাহারা সে পথ না ধরিয়া ব্যাপক দুর্নীতি ও অনাচারের অভিযোগ তুলিয়াছে। এখন সংসারে দুর্নীতি ও দুশ্চরিত্রতার অভিযোগ যত সহজে কাটে এমন আর কিছু নয়, শুনিবামাত্র লোক বিজ্ঞের মতো ঘাড় নাড়িয়া বলে আমরাও সন্দেহ করিয়াছিলাম। বন্ধু হে, বিরোধী পক্ষ তোমার প্রদত্ত নোটিশখানা দেখাইয়া অভিযোগ করিয়াছে যে, নিশ্চয় মেঘ চুরি হইতেছে নতুবা কলিকাতা সহরে বৃষ্টির অভাব কেন? শুনিয়াছি তোমাদের ওখানে হাসপাতালে দুধ ও ঔষধ চুরি হইয়া থাকে, কিন্তু একদিন যে স্বর্গেও মেঘ চুরির অভিযোগ উঠিবে কে জানিত? তার উপরে আবার পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ! বিরোধী পক্ষ বলিতেছে যে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি স্বর্গের এরূপ বিমাতার মতো আচরণ কেন? দিল্লী পশ্চিমবঙ্গের অর্থ দিতে নারাজ আর স্বর্গ নারাজ বৃষ্টি দিতে—ইহার কি কারণ? আরো কথা উঠিয়াছে যে কেরলে দেববিদ্বেষী কম্যুনিষ্ট রাজত্ব স্থাপিত হইয়াছে অথচ সেখানে বৃষ্টির অভাব হইতেছে না, অভাব হইতেছে পশ্চিমবঙ্গে! দিল্লী ও

দেবরাজ দুই-ই দেখিতেছি শক্তের ভক্ত নরমের যম। বলো এখন এ সব অস্পষ্ট অভিযোগের কি উত্তরদান সম্ভব? কাজেই আমি নোটিশ চাহিয়াছি, আশা করিতেছি দুই দিন বাদে সব কথা ভুলিয়া যাইবে, ইতিমধ্যে অমৃতের রেশন বাড়াইয়া দিয়াছি আর আশ্বাস দিয়াছি, আর যে-বস্তুর উপরেই ট্যাক্স বসুক না কেন অমৃত করমুক্ত থাকিবে এবং তাহা চিরকাল মুক্তকরে বিতরিত হইবে। স্বর্গের বিরোধী পক্ষের মস্ত গুণ এই যে, তাহারা অমৃতের মর্যাদা রক্ষা করিতে জানে।

প্রিয় কমলাকান্ত, এখন বিধান-সভায় ঝোঁকের মাথায় যাহাই বলি না কেন তোমার কাছে তো সত্য গোপন করা চলিবে না। তুমি স্বর্গের মিত্র। সেকালে পুরুরবা ও দুষ্মন্ত প্রভৃতি নৃপতিরা যেমন দেবকুলের পক্ষে অস্ত্র ধারণ করিত, তুমি একালে তেমনি আমাদের পক্ষে প্রয়োজনকালে লেখনী ধারণ করিয়া থাকো, তোমার কাছে গোপন করিব কেন? এ বছরে বৃষ্টির টানাটানির নানা কারণ। আগে মানুষে যাগ-যজ্ঞে ঘৃত আহুতি দিত সেই ধূম মেঘসঞ্চারে সাহায্য করিত। এখন সে প্রথা লুপ্তপ্রায়। যদি বা কেহ যজ্ঞে আহুতি দেয়—তাহা উদ্ভিজ্জ ঘৃত, গন্ধে দম বন্ধ হইবার মতো হয়। মেঘই বা কিরূপে সৃষ্টি হয়, বৃষ্টিই বা কিরূপে হয়! আগেকার দিনে অরণ্যগুলি গোবৎসের মতো মেঘস্তন আকর্ষণ করিয়া বৃষ্টি নামাইত। বৃষ্টি নামিবে কিরূপে? তোমরা পৃথিবী অনরণ্য করিয়াছ যদিচ পৃথিবী নিঃশ্বাপদ হয় নাই। আবার দেখো মার্কিনী ও বৃটিশ আণবিক বোমগুলিও বৃষ্টির অন্তরায় যদিচ সোভিয়েট আণবিক বোমা পৃথিবীকে সুজলা সুফলা মলয়জ-শীতলা ও বিতর্কবহুলা করিতেছে। এই সব কারণেই এবারে বৃষ্টির কথঞ্চিৎ অভাব। কি উপায়ে সেই অভাব পূরণ করা যায় ভাবিতেছিলাম এমন সময়ে কৃষ্ণমাচারির নূতন করস্থাপন নীতি জানিতে পারিয়া আশ্বস্ত হইলাম ও দিগ্‌দর্শন পাইলাম। কর সংগ্রাহক মার্তণ্ডকে বলিয়া দিয়াছি যে, কেবল সমুদ্রের উপরে কর বসাইয়া ক্ষান্ত হইলে চলিবে না, হ্রদ নদী খাল বিল ডোবা নালা নর্দমা চৌবাচ্চা গাছের ডাব মায় টালার ট্যাঙ্ক যেখানে এক বিন্দু জল আছে, সর্বত্র ট্যাক্স বসাইতে হইবে, কেন না কমলাকান্তের শাকের ক্ষেত শুকাইয়া মরিবার উপক্রম হইয়াছে। আর মার্তণ্ড যে উদ্যোগী হইয়াছে, তাহার প্রমাণ তে নিত্য পাইতেছ। অতএব শীঘ্রই বৃষ্টি নামিবে।

কিন্তু ভায়া ইতিমধ্যে একটু ধৈর্যধারণ করো, আলোড়ন ও বিপ্লব আরম্ভ করিয়া দিয়ো না, তোমাদের ঐ "নিরুপদ্রব, শান্তিপূর্ণ, অহিংস সত্যাগ্রহ" ব্যাপারটাকে আমার বড় ভয়। বৃষ্টি নামিল বলিয়া—অতএব মা ভৈঃ।

৮৯

নবধারাপাত

ভারতের সর্বত্র অগ্নিকাণ্ড, ধূ ধূ আগুন জ্বলিতেছে, নানা স্থান হইতে মৃত্যুসংবাদ আসিতেছে, জলাশয় শুষ্ক, শস্য নষ্ট, জনপদ বিপর্যস্ত। এ কি দুঃসময়। না ভয় পাইবেন না, রাজনৈতিক বা আধিদৈবিক অগ্নিকাণ্ডের কথা বলিতেছি না, নিতান্তই আধিভৌতিক সূর্যতাপের কথা বলিতেছি। তাপ মাত্র ১১৭°।১১৮° পর্যন্ত উঠিয়াছে, সর্দিগর্মিতে লোক মরিতেছে। বৃষ্টি যেটুকু হইতেছে, তাহা 'তাতল সৈকতে বারি বিন্দু!' কেবল মনে করাইয়া দেয় যে, আরও জল চাই। 'বিজুলি শুধু ক্ষণিক আভা হানে, নিবিড়তর তিমির চোখে আনে।' 'এসো এসো তৃষ্ণার জল' যে গাহিব সে শক্তিও নাই, কণ্ঠ শুষ্ক। হায় এ সময়ে কোথায় সেইসব ইচ্ছাবৃষ্টি বৈজ্ঞানিকের দল, যাঁহারা 'ভরা বাদর মাহ ভাদরে' হাঁটুজলকে গলাজলে পরিণত করেন, তেলা মাথায় তেল ঢালেন। আশা করিতেছি, তাঁহারা দার্জিলিঙের শৈল শৃঙ্গে সুস্থ শরীরে ও বহাল তবিয়তে বর্ষাকালের অপেক্ষায় দিন যাপন করিতেছেন। কিন্তু এদিকে যে আমাদের প্রাণ যায়। ওদিকে ঝড়বৃষ্টির গোপন সংবাদ যাঁহারা রাখেন, তাঁহারা অদূর ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই মৌসুমী বর্ষণ নামিবে, 'বর্ষা এলাইবে তার মেঘময় বেণী।' তবে এই হাইড্রোজেন বোমা ও ভেজাল তেলের যুগে বেণী কিরূপ ঘন হইবে, তাহা এক সংশয় বটে!

অনন্যোপায় জনগণ কমলাকান্তকে ধরিয়াছে বৃষ্টি নামাও। তাহারা লিখিয়াছে কমলাকান্ত ঠাকুর তুমি সব পারো, কিছু না লিখিবার থাকিলেও পুরা আড়াই কলম ঠাসিয়া বোঝাই করিতে পারো, দেবরাজ হইতে ধেবরজী পর্যন্ত সবাই তোমার হাতধরা তোমার অসাধ্য কি—অতএব তুমি শীঘ্র বৃষ্টি

নামাইবার ব্যবস্থা করো, আমাদের যে প্রাণ যায়। সত্যই কমলাকান্তের কিছুই অসাধ্য নয়। সে যখন লেখনী ধারণ করে, তখন টেবিলখানি হইতে সসাগরা ধরণী কম্পিত হয়, দেবরাজ ইন্দ্রের কিরীট শীর্ষ কাঁপিয়া ওঠে, অতএব সে না পারিবে কেন? মা ভৈঃ খরতাপদগ্ধ জনগণ মা ভৈঃ। এই রচনা প্রকাশিত হইবার পরেই বর্ষণ আরম্ভ হইবে (কিছু আগেও হইতে পারে, অন্তর্যামী দেবরাজ জানিয়াছেন যে, কমলাকান্ত লেখনী ধারণ করিয়াছে)। এখন তোমরা ঘরের চালে নূতন খড় দাও, ভাঙা ছাদ মেরামত করো, আর যাহাদের সঙ্গতি আছে, নূতন বর্ষাতি কিনিয়া ফেলো—কোন সঙ্গতিই নাই যাহাদের তাহাদের ভাবনাও নাই, তাহারা বিশুদ্ধ তান লয় রাগে গান আরম্ভ করিয়া দাও 'আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে।'. হোক না জ্যৈষ্ঠ মাস, পঞ্জিকা মিলাইয়া গান করিতে গেলে আর গান গাওয়া চলে না!

এদিকে কলিকাতার পানীয় জল লবণাক্ত হইয়া প্রমাণ করিয়া দিতেছে যে, আমরা সমুদ্রের কাছেই থাকি। সেই সমুদ্রের অশ্রুঘন নিশ্বাসই বৃষ্টির কারণ অথচ সমুদ্রের প্রতিবেশী হওয়া সত্ত্বেও এমন জলাভাব কেন? সমুদ্রও কি তবে মানবধর্মের অতীত নয়? মানবধর্ম প্রতিবেশীর প্রতি কৃপাদৃষ্টির কৃপণতা। কলিদাস জানিতেন যে, 'ধূম-জ্যোতিঃ সলিল-মরুতাং সন্নিপাতঃ ক মেঘঃ'—তবু তাহার প্রশস্তি গাহিয়া তাহাকে বাগে আনিয়া তাহাকে দিয়া ডাক-হরকরার কাজটি করাইয়া লইয়াছিলেন। তবে কমলাকান্তই বা পারিবে না কেন? সেও তো যে ডালে বসে, সেই ডালখানা কাটে, তাছাড়া দুজনের নামে আদ্যাক্ষরেও মিল আছে আর স্বয়ং দেবরাজ তো তাহার মাসতুতো ভাই। অতএব জনগণ তোমরা আশ্বস্ত হও বৃষ্টি নামিল বলিয়া!

হে মেঘ, তুমি অচিরে অজস্র ধারাপাতে ধরাধামে অবতীর্ণ হও। তোমার অবিরাম ঝরঝর শব্দে মনে হইবে, (রবীন্দ্রনাথ হইলে মনে হইত 'পাতায় পাতায় টুপুর টুপুর নুপুর মধুর বাজে') শত শত জাতির ভবিষ্যৎ সমস্বরে কড়াকিয়া পাঠ করিতেছে, আর মাঝে মাঝে তোমার গর্জনকে সদ্যোনিদ্রোত্থিত গুরু মহাশয়ের (তিনি বোধ করি জাতির অতীত) গুরুগর্জন বলিয়া মনে হইবে—সমস্ত সংসারটাকেই একটি সুবৃহৎ পাঠশালা বলিয়া ভ্রম হইতে থাকিবে। আর পল্বল পুকুর জলাশয়ে যখন ভেকের হল-হলা উঠিবে মনে হইবে বিরাট শোভাযাত্রায় 'আমাদের দাবী মানতে হবে' ধ্বনি উঠিতেছে।

আর এই বিচিত্র সঙ্গীতের মাঝে মাঝে 'মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকি'—কিনা সরকারী প্রেসনোট বলিতে থাকিবে অত উতলা হইও না, শীঘ্রই বেতন বৃদ্ধির কথা চিন্তা করিব। আর তাহা শুনিবামাত্র 'ময়ূর নাচত মাতিয়া' —যত হাফ ও কোয়ার্টার নেতার দল বুঝিবে ইহাই মোকা, এবারে একটা ধর্মঘট বাধাইয়া দিতে হইবে। ইতিমধ্যে দমকা বাতাসে ও প্রচণ্ড বৃষ্টিতে গরীব মাষ্টারের 'ফাটি যাওতো ছাতিয়া।' বুকের ছাতি ফাটিলেও দুদিন বকলমে চলে—কিন্তু বর্ষার দিনে জীর্ণ ছাতি ফাটিয়া গেলে একেবারেই অচল —ইস্কুল পর্য্যন্ত পৌছিতে পারিলে তবে তো জাতিগঠন কার্য সম্পন্ন করিবার আশা। ওদিকে 'কান্ত-পাহুন'—অর্থাৎ কিনা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এখনো দূরবর্তী, কিন্তু 'ভূখ দারুণ, কাজেই 'বিদ্যাপতি কহে (নামটি এখানে সার্থক) কৈসে গোঙায়বি বেতন বিনা (প্রায় বিনা) দিন রাতিয়া।' পাঠক, বর্ষা-সঙ্গীতের এমন সমাজচেতন ব্যাখ্যার পরে বৃষ্টি না নামিয়া পারে না। আর নিতান্তই যদি না নামে, তবে আপাততঃ এই ব্যাখ্যাতেই তোমাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। বৃষ্টির অভাব কি ব্যাখ্যায় দূর হইবে না ?

৯০

পাগলের পরিসংখ্যান

কমলাকান্তের একটি সৌভাগ্য এই যে, পাঠকগণের নিকট হইতে বিচিত্র-রসের পত্র সে পাইয়া থাকে। তাহাদের অধিকাংশই কমলাকান্তের যোগ্য। অবশ্য এমন কিছু কিছু পত্র আসে যাহা মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী বা শ্রীভগবানের কাছে পাঠাইলেই উচিত হইত। কয়েক দিন আগে 'কেন এমন হয়' ১৪১ পৃঃ নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাহার উত্তরে অনেকগুলি পত্র পাইয়াছিলাম, অনেক গুরুতর সমস্যাও সমাধানের ইঙ্গিত ছিল সে-সব পত্রে। কিন্তু তাহার কোনটাই কমলাকান্তের সাধ্যায়ত্ত নয়। সম্প্রতি একখানি পত্র পাইয়াছি যাহার বিশেষ উল্লেখ আবশ্যক।

পত্রদাতা জানাইতেছেন কলিকাতার কোন 'বাসরুটে'র বাসে গন্তব্যস্থল

লিখিত ছিল 'উন্মাদ আশ্রম'—অর্থাৎ নিকটে যে উন্মাদ আশ্রমটি আছে বাস ততদূর যাইবে—অর্থ এ নয় যে যাত্রিগণ উন্মাদ আশ্রমে যাইবেন। বিষয়টা খুব সরল। কিন্তু যে-কারণেই হোক একদল লোক 'উন্মাদ আশ্রম' বোর্ড দেখিয়া ক্ষেপিয়া যান—আর অবশেষে বাসের বোর্ড বদলিয়া গন্তব্যস্থলের অন্য নামে উল্লেখ করিতে হইয়াছে। পত্রলেখক আপত্তিকারিগণকে বেরসিক বলিয়াছেন, খুব অল্পেই ছাড়িয়া দিয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে স্মরণ করাইয়া দিতে পারিতেন যে প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি পাগলামির ইঙ্গিতে কখনো ক্ষেপিয়া ওঠে না। যাই হোক বাসের বোর্ড বদলাইলেই যদি পাড়ার লোক খুশি হন তবে বুঝিতে হইবে তাঁহাদের দাবী তেমন উগ্র নয়। কিন্তু তবু আর একটা মৌলিক প্রশ্ন থাকিয়া যায়।

বিশেষ করিয়া তুই দশটা প্রতিষ্ঠানকে 'উন্মাদ আশ্রম' পাগলাগারদ বা মানসিক চিকিৎসালয় বলিলেও বস্তুতঃ সংসারে উন্মাদের সংখ্যা স্বল্প নয়। যাবতীয় উন্মাদকে 'উন্মাদ আশ্রমে' রাখিতে হইলে তাবদ্ দেশটাকে প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া দিতে হয়। আর সে কাজটি করিতে গেলে ঐ এক খাতেই রাজ্যের সমস্ত বাজেট নিঃশেষ হইবার আশঙ্কা। তাই মানুষে এক নূতন ও কম খরচের পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে। বনের মধ্যে কোন কোন স্থানকে 'Game Sanctuary'রূপে ঘোষণা করিয়া সেখানে যেমন বন্য জীবজন্তুগুলির ঘুরিয়া বেড়াইবার সুযোগ করিয়া দেওয়া হয়, তেমনি সংসারে অসংখ্য উন্মাদের অবাধে ঘুরিয়া বেড়াইবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। ভাই সব, সত্য কথা বলিতে কি আমরা সবাই উন্মাদ।

তবে যে এক দল অপর দলকে উন্মাদ বলে, তার কারণ উন্মাদ সমাজেও শ্রেণীভেদ আছে। সংক্ষেপে তাহার স্বরূপ বর্ণনা করিব।

উন্মাদ সমাজ প্রধানতঃ তুইভাগে বিভক্ত (১) বদ্ধ উন্মাদ, (২) মুক্ত উন্মাদ। বদ্ধ উন্মাদের সংখ্যা অল্প, তাই তাহাদিগকে সংখ্যাগুরু মুক্ত উন্মাদের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য প্রতিষ্ঠান বিশেষে ভরিয়া রাখিয়া সযত্নে রক্ষা করা হয়। কাজেই বোঝা যাইতেছে যে, সংখ্যাগুরু মুক্ত উন্মাদগণ মারাত্মক জীব। মুক্ত উন্মাদের তাৎপর্য এই যে, ইহারা কোন স্থানে বদ্ধ নহেন বলিয়া সর্বত্র স্বাভাবিকভাবে ঘুরিয়া বেড়ান। মুক্ত উন্মাদের মধ্যে আবার অনেক শ্রেণী, যথা (ক) শেয়ানা-পাগল, ইহারা সময় বিশেষে পাগলামি অবলম্বন করেন,

অন্য সময়ে বেশ স্বাভাবিক। (খ) পাগড়ী-পাগল, ইহারা অতি সাধারণ লোক হইলেও সমাজে, রাষ্ট্রে, সাহিত্যে সর্বত্র অসাধারণত্ব লাভের জন্য সর্বদা ব্যস্ত। (গ) রসক্ষেপা, ইহারা শিল্প, ললিতকলা, নৃত্য, প্রেম প্রভৃতি কোমল বস্তুগুলির জন্য লালায়িত। (ঘ) মাথা খারাপ—সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে ইহারাই সবচেয়ে নিরীহ, নিজ মনে একা একা নিরর্থক বিড়বিড় করা ছাড়া আর কোন লক্ষণ ইহাদের দেখা যায় না। ইহারা নিরীহ কাহারো ক্ষতি করেন না। ইহা ছাড়া নাম-পাগল, কড়ি-পাগল, মাথাগোল প্রভৃতি বহুতর শ্রেণী আছে, বস্তুতঃ যত মানুষ তত শ্রেণী।

এখন এই উন্মাদ সংসারে মুষ্টিমেয় লোক সত্যই প্রকৃতিস্থ। উন্মাদের চাপে ও অত্যাচারে তাঁহারা শেষ পর্যন্ত সংসার ত্যাগ করিতে বাধ্য হন, সংসারত্যাগী বনগামী মহাপুরুষগণ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এখন যেখানে সকলেই পাগল, সেখানে একখানা বাসের বোর্ডে উন্মাদ আশ্রম লিখিত থাকিলে চটিবার কি কারণ বুঝিতে পারি না। তবে, হাঁ, শ্রেণীভেদ স্মরণ করিলে রাগ হইতে পারে বই কি ! মুক্ত উন্মাদগণকে বদ্ধ উন্মাদের আশ্রমে লইয়া যাইবার ইঙ্গিত সত্যই অসহনীয়।

একটা সুসংবাদ পাওয়া গিয়াছে, পৃথিবীতে পাগলের সংখ্যা বাড়িতেছে। অন্যান্য বিষয়ের মতো এ বিষয়েও মার্কিণ মুলুকের জয়। সেখানে প্রতি দুইশ জনের মধ্যে একজন পাগল। তারপরেই ফরাসী দেশ, সেখানে পাগলের সংখ্যা প্রতি তিনশ জনে একজন। মিশরে প্রতি হাজারে একজন পাগল। অন্যান্য দেশের হিসাব অপ্রকাশ। বাংলাদেশের হিসাব প্রকাশ হয় নাই, ভালোই হইয়াছে। সে হিসাব প্রকাশ হইলে কি সংখ্যা দাঁড়াইত জানি না, তবে খুব সম্ভব আমরা একে অন্যকে সন্দেহ করিতে সুরু করিতাম।

পাগলের আদম-সুমারীর হিসাব দেখিয়া একটা গল্প মনে পড়িল। এক রাজার রাজধানীতে বিদেশী এক এঞ্জিনিয়ার আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা তাহাকে একটি পাগলাগারদ তৈয়ারী করিয়া দিতে অনুরোধ করিল। এঞ্জিনিয়ার বলিল যে, সে হাসপাতাল, বিদ্যালয়, পুস্তকাগার প্রভৃতি গড়িয়া হাত পাকাইয়াছে, এখন পাগলাগারদ অনায়াসে গড়িতে পারিবে, কিন্তু তার আগে জানা দরকার গারদটি কত বড় হইবে। রাজা বলিল যে, একটা

সহরে পাগলের সংখ্যা আর কত হইবে? এঞ্জিনিয়ার যেন একটু ঘুরিয়া অনুমান করিয়া লয় আর সেই অনুপাতে উন্মাদাগারটি গড়িয়া দেয়। কিছুকাল পরে এঞ্জিনিয়ার রাজাকে বলিল, গারদ গড়া হইয়াছে। রাজা শুধাইল যে কোথায়? এঞ্জিনিয়ার রাজাকে সঙ্গে করিয়া গারদ দেখাইতে চলিল। রাজা দেখিল যে সমস্ত সহরটি প্রাচীর দিয়া ঘেরা। রাজা শুধাইল, এ কি ব্যাপার? এঞ্জিনিয়ার বলিল, এর চেয়ে ছোট গারদে কুলাইবে না, কারণ সহরের তামাম লোক পাগল। 'আমিও কি পাগল?' এঞ্জিনিয়ার বলিল, 'কাজেই, কারণ পাগলের রাজা কখনো প্রকৃতিস্থ হইতে পারে না।' অতঃপর এঞ্জিনিয়ার কি ভাবে বিদায় পাইয়াছিল জানি না, তবে সে সহরে যে তাহার স্থান হয় নাই, তাহা নিশ্চিত।

এখন এই গল্পটি বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, বাংলাদেশে পাগলের সংখ্যা গণনায় প্রবৃত্ত না হইয়া ভালোই হইয়াছে; হইলে যে সংখ্যা প্রকাশ পাইত, তাহার সঙ্গে সমগ্র জনসংখ্যার বেশি প্রভেদ থাকিত মনে হয় না।

এখন যদি কেহ শুধায় যে পাগলের সংখ্যা বৃদ্ধিকে কেন সুসংবাদ বলিলাম, তাহার সরল উত্তর এই যে, একমাত্র এই পথেই পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যার সমাধান সম্ভব। পাগলের কোন সমস্যা নাই, একমাত্র পাগলামি ছাড়া। সে সমস্যাও আবার প্রকৃতিস্থের কাছে। প্রকৃতিস্থ না থাকিলে সেই শেষ সমস্যাটিও নাই। কাজেই যত শীঘ্র প্রকৃতিস্থের সংখ্যা লোপ পায় পৃথিবীর ততই মঙ্গল। এখন পাগলের সংখ্যার প্রাচুর্যে—কেহ সংশয় প্রকাশ করিলে স্মরণ করাইয়া দিব যে, পাগল দুই শ্রেণীর, বদ্ধ পাগল ও মুক্ত পাগল। বদ্ধ পাগলকেই লোকে পাগল বলিয়া জানে, আর শিকলে বা গারদে বদ্ধ করিয়া রাখে। কিন্তু মুক্ত পাগলকে বোঝা সহজ নয়, আর সংখ্যায় তাহারাই বেশি। তাহারা প্রকৃতিস্থের মতো অফিস-আদালত, হাট-বাজার করে, পড়ে এবং পড়ায়, লেখে এবং লেখায়, আর বিকালবেলায় অন্যান্য পাগলকে সমবেত করিয়া জ্বালাময়ী বক্তৃতা করিয়া আনন্দ দান করে। সকালবেলায় যাহারা লেকে ও ময়দানে হাওয়া খায়, দুপুরে তাহারাই লালদীঘি অঞ্চলে বিশ্রাম করে, সন্ধ্যায় তাহারাই পাড়ায় পাড়ায় 'সংস্কৃতি' করিয়া বেড়ায়। বছরের মধ্যে দুইবার একদল মুক্ত পাগল কলিকাতার একটি বিখ্যাত ভবনে সমবেত

হয়, যাহার অবস্থান হাইকোর্ট ও ইডেন গার্ডেনের মধ্যস্থলে। তাহারা নাকি পাগলের প্রতিনিধি।

মুক্ত পাগলের মধ্যে আবার অসংখ্য উপশ্রেণী, বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ি গোছের। তাহাদের একে অন্যকে স্বীকার করিতে চায় না। বই পাগল, সংস্কৃতি পাগল, ভোট পাগল, দিল্লী পাগল, লাল পাগল, পীত পাগল এমন কত নাম করিব।

বদ্ধ পাগলেরা নিরীহ কিন্তু মাইনরিটি, আর মুক্ত পাগলেরা মৎলববাজ কিন্তু মেজরিটি। নিতান্ত সংখ্যার জোরেই তাহারা নিজেদের প্রকৃতিস্থ বলিয়া চালাইতেছে এবং এইভাবে একপ্রকার 'সাম্রাজ্যবাদ' নিরীহ মাইনরিটির ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছে। এই অবিচারের প্রতিকার কোথায়? ইউ-এন, নাটো, সাটো সমস্তই মুক্ত পাগলের অধিকারে। এক আশা ছিল কমিনফর্মের উপরে তাহাও বুঝি ভাঙ্গিয়া যায়। কোথায় প্রতিকার? প্রতিকার অবশ্যই চাই, নহিলে জগৎ সমস্যার সমাধান যে হয় না। এখন বদ্ধ-পাগলেরা যদি একজোট হয়, তবেই উপায় হইতে পারে। অতএব জগৎ সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে—"Lunatics of the World, Unite!"

৯১

তিন মণ বরফ

সেদিন জীবনে একটি অপূর্ব অভিজ্ঞতা ঘটিয়া গিয়াছে, এমনি অপূর্ব যে শুনিলে বিশ্বাস করা কঠিন, দেখিয়াও আমার বিশ্বাস হইতেছে না। তুফান এক্সপ্রেসে দিল্লী যাইব, গাড়ীর কাছে গিয়া হঠাৎ নজরে পড়িল একখানি প্রথম শ্রেণীর কামরার গায়ে তিনজন বিখ্যাত বাঙালী লেখকের নামের রিজার্ভ টিকিট আঁটা। তিনজন না বলিয়া আড়াই জন বলিলেই যথার্থ হয় কারণ একজন বিখ্যাত নয়, বিখ্যাত লোকের সঙ্গে ওঠা বসা করে এইমাত্র, বড়জোর কুখ্যাত বলা যায়, কিংবা তাহাকে হাফ খ্যাত বলিলেই ঠিক হয়। মনে মনে ভাবিলাম হায় শেষে দেশের কি হইল, এখন বাঙালী লেখক কিনা, প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে দিল্লী যায়। তখনি মনের মধ্য হইতে ছোট্ট মানুষটি বলিয়া

উঠিল—ভালো করিয়া খোঁজ নাও, দেখিবে সে নিজের পয়সায় যাইতেছে না। কিন্তু তখনি আবার মন বলিল, কিন্তু তাহাদের এমন কি গুরুত্ব যে অপরে রাহাখরচ দিতে যাইবে। এইভাবে আশা-আশঙ্কায় যখন দোল খাইতেছি তখন দেখিলাম যে, ঠেলা গাড়ীতে করিয়া ice container ও তিন মণ বরফ আসিয়া উপস্থিত হইল। দারুণ রৌদ্রে কামরার আবহাওয়া ও প্রাসঙ্গিক মস্তক ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য এই ব্যবস্থা। আর কোন প্রথম শ্রেণীর বরফের প্রয়োজন হয় নাই, বুঝিলাম লেখকদের মূল্যবান মাথা ঠাণ্ডা রাখা একটি জাতীয় কর্তব্য! খুব সম্ভব যাহারা রাহাখরচ দিয়াছে তাহারাই বরফের ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছে। গাড়ী ছাড়িয়া দিল—তিন মণ তুষারস্তূপ লইয়া তিনজন প্রসিদ্ধ বাঙালী লেখক কামরার মধ্যে কি ভাবে দ্বিপ্রহর যাপন করিতেছেন জানিবার আগ্রহ হইলেও জানিবার উপায় ছিল না, কারণ আমি তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। তবে নিদারুণ গরমে সিদ্ধ হইতে হইতে প্রার্থনা করিলাম তাঁহাদের মাথা ঠাণ্ডা থাকুক, কারণ লেখকের মাথা জাতীয় সম্পত্তি, Safe Deposit Vault-এ রাখিবার যোগ্য বস্তু।

কিন্তু পরদিন প্রাতে কাণপুর ষ্টেশনে জাগিয়া দেখি, এ কি! ঠেলা গাড়ীতে আবার তিন মণ বরফ! সকালবেলাতেই বরফ। কিন্তু বিস্ময়ের বর্ণমালায় এ সব কেবল 'কর' 'খল' তাহা কি জানিতাম। তারপর প্রত্যেকটি বড় ষ্টেশনে তিন মণ করিয়া বরফ সাহিত্যিকগণের কামরায় প্রবেশ করিতে লাগিল। ভাবিলাম, এ কি ব্যবস্থার ভুল না ভুলের ব্যবস্থা। লেখকদের মাথা নিঃসন্দেহ, অপূর্ব বস্তু, কিন্তু তাই বলিয়া কি সত্যই এত বরফের প্রয়োজন হয়। অবশেষে আর কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া আগ্রা ষ্টেশনে গিয়া কামরার মধ্যে উঁকি মারিলাম। কি দেখিলাম! দেখিলাম একটি বরফের তাজমহল কামরার ছাদ স্পর্শ করিয়াছে, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ও উচ্চতায় original তাজমহলের সমান না হইলেও নিতান্ত কম নয়। আর লেখক তিনজন? সঙ্কীর্ণ-স্থান কামরার মধ্যে কোন রকমে আত্ম-গোপন করিয়া তাঁহারা কাশিতেছেন, হাঁচিতেছেন, ভাঙা গলায় বিলাপ করিতেছেন, 'টেলিগ্রামের গোলমালেই এমন অব্যবস্থা হয়েছে'—আর প্রত্যেকেরই 'কপোলতলে শুভ্র সুকোমল এক বিন্দু নয়নের জল'—বিশুদ্ধ সর্দিতে। আমাকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন, "আরো কিছু বরফ পাঠাতে পারেন?'

দিল্লীতে নামিয়া পরের দিন শুনিলাম যে, সহরে বরফ সস্তা হইয়া গিয়াছে—সেই কামরার গলিত-অবশেষ বরফে সহরের বরফের দর নামিয়া গিয়াছে, কেবল কামরার তাপমান নামাইয়া তাহারা ক্ষান্ত হয় নাই। লেখক তিন-জনের মাথা আশাতীত ঠাণ্ডা হইয়াছে, তাঁহারা অনেকদিন কিছু লেখেন নাই।

৯২

ভূতের ফরমুলা

"ক্যাম্ব্রিজ, ১৭ই জুলাই—ভূত, প্রেত ও অপদেবতাগণের সাম্প্রতিক আচরণ পরীক্ষা করিয়া দেখার নিমিত্ত একটি বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে।

বিভিন্ন দেশে যে সকল রহস্যজনক ভৌতিক কাহিনী প্রচলিত রহিয়াছে, সেগুলির সত্যতা নির্ধারণকল্পে সেগুলি বিশেষভাবে তালিকাভুক্ত করা হইতেছে।

গত এক সপ্তাহ যাবৎ ইউরোপ ও আমেরিকার ২৯ জন অধ্যাপক ভূত, প্রেত ও অপদেবতার কাহিনী লইয়া আলোচনা করিয়াছেন।

আপাতদৃষ্ট কোন কারণ ছাড়া যে সকল ব্যাপার ঘটে, সে সম্পর্কে উন্নত ধরণের পর্যালোচনার জন্য একটি আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রস্তাব তাঁহারা অনুমোদন করিয়াছেন।

এ সম্মেলনে দেনমার্ক, ফ্রান্স, জার্মাণী, হাইটি, ইতালী, হল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইজারল্যাণ্ড, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।"

বৈজ্ঞানিকগণ ভূত প্রেতের আলোচনায় নামিয়াছেন, কিন্তু ভূত প্রেত শব্দ উচ্চারণ করিতে নারাজ, ঐ অর্থে তাঁহারা "আপাতদৃষ্ট কোন কারণ" শব্দগুলি ব্যবহার করিয়াছেন এমনই তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা। ভাবে বোধ হইতেছে, তাঁহারা মাছ ধরিবেন অথচ জলস্পর্শ করিবেন না; তেমন মাছ তো এক উদ্রুক্ষু মাছ ছাড়া দেখি না। যাই হোক, এখন বৈজ্ঞানিকগণ ভূতের

'ফরমূলা' বা equation আবিষ্কার করিতে পারিলে অভূতপূর্ব এক কীর্তি স্থাপন করিবেন। ভূত পরীক্ষা শেষ হইয়া গেলে আশা করিতেছি, ভগবানের পালা আসিবে। ভগবান ফরমুলারূপে বা যন্ত্রযোগে আপনাকে সপ্রমাণ না করা পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

কমলাকান্তকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় ভূত আছে কি না, সে বলিবে আছে এবং নাই, দুই-ই। যদি আবার জিজ্ঞাসা করা যায় সে কেমন, তবে বলিবে দিনের বেলায় জনসমক্ষে ভূত নাই, আর রাতের বেলায় নির্জন ও অন্ধকার স্থানে আছে। কেহ যদি পাল্টা জবাব দেয় সেটা তো ভূত নয়, ভূতের ভয়। তাহার উত্তর এই যে, ঐ ভয়টাই ভূতের অস্তিত্বের প্রমাণ, অন্য প্রমাণ নাই, যদিচ বৈজ্ঞানিকগণ তাহারই সন্ধানে নিযুক্ত। মানুষের কাছাকাছি ভৌতিক সত্তা আসিয়া উপস্থিত হইলে ভীতিবোধের medium-এ মানুষ তাহা জানিতে পারে। অবশ্য উহাই যে একমাত্র উপায় বা medium তাহা নয়, কখনো কখনো ভৌতিক সত্তা অন্য উপায়ে, যেমন আকার গ্রহণ বা বাক্য-কথনের দ্বারাও নিজেকে বিজ্ঞাপিত করে। কিন্তু উহা খুব বিরল। তবে পরলোক অর্থাৎ মৃত্যুর পরবর্তী জগৎ সম্বন্ধে কোন সাধারণ নিয়ম বিবৃত করা সম্ভব নয়, কারণ মানুষ এত কম জানে, আর সে জগৎ এত বিরাট ও জটিল।

ভূত নাই অর্থাৎ মানুষ মরিলেই সব ফুরাইল এরূপ ধারণা অতি নিকৃষ্ট একটি কুসংস্কার। মানুষ আছে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে, পুলিশ আছে, Security Act আছে, Slave Camp আছে, বিশ্বযুদ্ধ অবসানের আশা আছে, সবই আছে, কেবল ভূত নাই এমন কথা যাহারা বলে তাহারা জানে না কি বলিতেছে। তবে অবশ্য একথাও স্বীকার্য যে, ভূত সম্বন্ধে লৌকিক অনেক ধারণাই অজ্ঞতাপ্রসূত। তার উপরে আবার বিভিন্ন ধর্ম নানারূপ জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। যেমন হিন্দুরা বিশ্বাস করে মানুষ মরিলে তাহার পারলৌকিক সত্তা কিছুকাল অন্য জগতে বাস করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করে— অর্থাৎ সেখানেই ভূতত্বের অবসান। খৃষ্টানগণ বিশ্বাস করে, মানুষ মরিলে শেষ-বিচারের দিন অবধি তাহাকে ভূতরূপে থাকিতে হইবে—অর্থাৎ হিন্দু ভূতের চেয়ে খৃষ্টান ভূতের longevity অনেক বেশি। হিন্দুদের আর একটি বিশ্বাসের কথা বলি। হিন্দুদের বিশ্বাস যে, গয়ায় পিণ্ডদান করিলে ভৌতিক

দেহ ছাড়িয়া ভৌতিক সত্তা আরও উর্ধ্বলোকে চলিয়া যায়; তখন আর সে পথে ঘাটে ভূতলীলা করিয়া মানুষকে ভয় দেখাইতে বা ভর্জিত মৎস্যখণ্ড প্রার্থনা করিতে পারে না। উত্তম। এক সময়ে যখন রেলপথ হয় নাই তখন গয়ায় পিণ্ডদান সহজ ছিল না, তখন অনেক ভূত পিণ্ডাভাবে ওয়েটিং রুমে থাকিত এবং সমাজে উপদ্রব করিত। কিন্তু রেলপথ হওয়ায় নিয়মিত পিণ্ড-দান সহজ হইয়াছে, ভূত সরাসরি উদ্ধার হইয়া যাইতেছে। সেকালে ভূত বেশি ছিল, একালে অনেক কম, এ সত্য সকলেই স্বীকার করিবেন; তাহার মূলে রেলপথ ও গয়ায় পিণ্ডদানের সুগমতা। এসব অবশ্য কূটতর্ক, সত্য নয়, তাই বলিয়া মূল কথাটা উড়াইয়া দেওয়া চলে না—ভূত বা ভৌতিক সত্তা অবশ্যই আছে, বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ না করিতে পারিলে ভূত অপ্রমাণ হইবে না। প্রমাণ হইবে যে, বৈজ্ঞানিকদের বুদ্ধি ও যন্ত্রপাতি এখনো যথেষ্ট উন্নত হয় নাই।

৯৩

অতি পুরাতন সত্য

বৃটিশ সোসাইটি অব মেডিকেল হিপ্‌নটিষ্ট-এর সভাপতি একটি পুরাতন সত্যকে পুনরায় আবিষ্কার করিয়া সগর্বে ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি জানাইতেছেন যে, নর-নারীর মধ্যে যে-সম্পর্ককে লোকে প্রেম নামে জানে তাহা আদৌ সেরূপ কিছু নয়—তাহা সরাসরি একটি সম্মোহনী শক্তিমাত্র। তিনি বলিতেছেন যে, রঙ্গমঞ্চে এই শক্তির ক্রিয়া অনেকে দেখিয়া থাকিবেন। কোন যুবক একটি সম্মার্জনীকে সাগ্রহে আলিঙ্গন করিয়া নৃত্য করিতেছে, সম্মোহনী শক্তির ক্রিয়ায় তাহার বিশ্বাস উহা সম্মার্জনী নয়—তাহার প্রেয়সী। সভাপতি মহাশয় আরো জানাইতেছেন যে, পূর্বরাগের অবস্থায় হতভাগ্য যুবক যখন প্রেয়সীকে অপ্সরী বলিয়া মনে করে, তখন অপরে জানে যে, মেয়েটি অপ্সরী বা কিন্নরী নয়, নিতান্তই সাধারণ মেয়ে, খুব সম্ভব অপদার্থ একটা মেয়ে। কিন্তু হইলে কি হয়, সম্মোহনী বিদ্যার প্রভাব এমনি যে, যুবকের

মোহভঙ্গ হয় না। একেবারে হয় না তাহা নয়, হয় বিবাহের পরে—তখন বিবাহ বিচ্ছেদ ছাড়া নিষ্ক্রমণের আর সব দ্বার বন্ধ। তাঁহার মতে পূর্বরাগজাত বিবাহ প্রথা যেখানে ব্যাপক সেখানে বিবাহ বিচ্ছেদ তত অধিক। তাঁহার মতে চিত্রতারকাগণের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের আধিক্যের কারণ ইহাই।

সর্বসাধারণের অভিজ্ঞতাকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে পরিণত করা নিঃসন্দেহ কৃতিত্ব, কাজেই উক্ত সমিতির সভাপতি যদি কৃতিত্ব ভোগ করিতে চান করুন। কিন্তু কমলাকান্ত জানে (এবং সকলেই ক্রমে ঠেকিয়া জানিতে পারে) যে, প্রেম নামে স্বতন্ত্র কোন ভাব নাই, উহা মারণ উচাটন স্তম্ভন প্রভৃতির ন্যায় একটি শক্তি। তবে যে প্রেমের এমন খ্যাতি প্রতিপত্তি তাহার মূলে পৃথিবীর যাবতীয় কবি ও শিল্পীর হস্তক্ষেপ। এইসব অপদার্থের দল (এই জন্যই প্লেটো ইহাদের তাঁহার কল্পিত রাজ্যে ঢুকিতে দেন নাই) হাতে কোন কাজ না থাকায় তিলকে তাল ও থেঁদিকে তিলোত্তমায় পরিণত করে। কালিদাসের কথাই ধরুন। তাঁহার এত সাধের উর্বশী একটি বাউণ্ডুলে মেয়ে (সঙ্কোচবশতঃ যথার্থ অভিধাটি চাপিয়া গেলাম)। মালবিকা অশ্রুজলের aqua mixture পান করাইয়া তবে অগ্নিমিত্রকে হাত করিয়াছিল। আর অগ্নিমিত্রই বা কেমন মোহগ্রস্ত পুরুষ! তাহার পিতা ও পুত্র যখন লড়াই করিয়া মরিতেছে তখন সে উপবনে বসিয়া অন্য রাণীদের ফাঁকি দিয়া 'প্রেম' করিতেছে মালবিকার সহিত। তারপরে শকুন্তলা! দুষ্মন্তের উপরে সম্মোহনী ক্রিয়ার সার্থক প্রয়োগ করিতে সে কি এতটুকু ত্রুটি করিয়াছিল। কোথায় মালিনী নদী, বনজ্যোৎস্নার কুঞ্জ, প্রিয়ম্বদা অনসূয়ার চাতুরী! কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফাঁকি টিকিল না, ধরা পড়িতেই হইল। সম্মোহনী বিদ্যার গণ্ডী ছাড়িয়া যেই শকুন্তলা রাজসভায় উপস্থিত হইল—ব্যস, এক মুহূর্তে ধরা পড়িয়া গেল। আবার শুধু কাব্যেই বা কেন! ডাঃ জনসনের মতো একটা বুদ্ধিমান লোকের কাণ্ডটা দেখুন। একটা বুড়ীকে বিবাহ করিয়া অপ্সরী মনে করিয়া জীবন কাটাইয়া দিলেন! সত্য কথা বলিতে কি পাঠক, (পাঠিকাগণ দয়া করিয়া এই প্রবন্ধটি পড়িবেন না) প্রেম অতি ভয়ঙ্কর মোহ—ইহার প্রভাবে সম্মার্জনীকে অপ্সরী, মানবীকে দেবী, অকিঞ্চনের কন্যাকে লক্ষপতির কন্যা বলিয়া ভ্রম হয়।

কিন্তু হায়, কেহ যে কমলাকান্তের সতর্কবাণী শুনিবে এমন মনে হয় না। ভর্তৃহরির মতো যাঁহারা ঠেকিয়া শিখিয়াছেন তাঁহাদের কথাই বা কয়জনে শুনিয়াছে! প্রত্যেক পুরুষ মনে করে অপরের ভাগ্যে সম্মার্জনী জুটিলেও তাহার ভাগ্যে অপ্সরী নাচিতেছে। "শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি" আর কি! সকলেই জানে প্রেম দিল্লীর লাড্ডু, মাকাল ফল ও পয়োমুখ বিষকুম্ভ—কিন্তু জানিয়া শুনিয়াও সকলে ছুটিয়া যায় দীপশিখামুগ্ধ পতঙ্গের মতো। ঠেকাইবার চেষ্টা বৃথা! কিন্তু আমি ভাবিতেছি যে, এত প্রতিকূলতা, বিধিনিষেধ সত্ত্বেও যাঁহারা পুরুষের উপরে এ হেন দুর্জয় প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের শক্তি কি প্রবল। প্রভাব কি প্রচণ্ড! ধন্য সম্মোহনী শক্তি। এই শক্তির ক্রিয়ায় পুরুষে নাকি ভেড়া বনিয়া যায়। বোধ করি উপমাটা মিথ্যা নয়। নতুবা কেন পুরুষে গড্ডলিকার ন্যায় বাধা নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া একই মোহ-গর্তে নিপতিত হইবে।......কিন্তু......কিন্তু, যখন সম্মোহনী শক্তির প্রভাব হ্রাস পায়, বিবাহান্তে যখন পুরুষ আবিষ্কার করে তাহার প্রেয়সী অপ্সরী নয়, সার্ধ তিন মণ ওজন বিশিষ্টা মেদ মাংস ঈর্ষা বিদ্বেষ ও ব্যাধি পিণ্ড, আর তাহার পিতা ধনাঢ্য নয় ঋণাঢ্য! তখন? তখন পুরুষের পক্ষে একমাত্র সান্ত্বনা গীতা, বৈরাগ্য শতক, কমলাকান্তের আসর ও নির্বাচনে পদপ্রার্থীরূপে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ। ধন্য সম্মোহনী, "তেরি মায়া সুখ পাওয়ে ঔর হাসি।"